অভিসন্দর্ভের শিরোনাম

মুক্তিযুদ্ধে সাতক্ষীরা

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে এম ফিল ডিগ্রির জন্য উপস্থাপিত অভিসন্দর্ভ

গবেষক
শুভাশীষ মজুমদার
ইতিহাস বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
রেজি: ১৭১
শিক্ষাবর্ষ: ২০১০-২০১১

তত্ত্বাবধায়ক
প্রফেসর ড. মেসবাহ কামাল
ইতিহাস বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

ইতিহাস বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
জানুয়ারী ২০১৭

Dhaka University Institutional Repository

মুক্তিযুদ্ধে সাতক্ষীরা

ঘোষণাপত্র

আমি নিম্নস্বাক্ষরকারী এই মর্মে ঘোষণা করছি যে, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে এম ফিল ডিগ্রীর জন্য উপস্থাপিত "মুক্তিযুদ্ধে সাতক্ষীরা" শীর্ষক অভিসন্দর্ভটি আমার নিজস্ব, একক ও মৌলিক গবেষণাকর্ম। আমি এ অভিসন্দর্ভটি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ব্যতীত অন্য কোথাও এম ফিল বা অন্য কোন ডিগ্রী লাভের জন্য অথবা কোন সুবিধা প্রাপ্তির উদ্দেশ্যে উপস্থাপন করিনি এবং আমার জানামতে, ইতোপূর্বে কোথাও এ শিরোনামে কোন অভিসন্দর্ভ রচিত হয়নি।

শুভাশীষ মজুমদার
এম ফিল গবেষক
রেজি নং-১৭১/২০১০-১১
ইতিহাস বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
ও
প্রভাষক, ইতিহাস বিভাগ
যশোর সরকারি মহিলা কলেজ,
যশোর।

Dhaka University Institutional Repository

প্রত্যয়নপত্র

এই মর্মে প্রত্যয়ন করা যাচ্ছে যে, শুভাশীষ মজুমদার কর্তৃক উপস্থাপিত "মুক্তিযুদ্ধে সাতক্ষীরা" শীর্ষক এম ফিল অভিসন্দর্ভটি আমার প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে ও নির্দেশনায় প্রস্তুত করা হয়েছে। এটি গবেষকের একক গবেষণা কর্ম। আমার জানা মতে এই অভিসন্দর্ভ বা এর কোন অংশ গবেষক অন্য কোন প্রতিষ্ঠানে বা বিশ্ববিদ্যালয়ে কোন ডিগ্রির জন্য উপস্থাপন করেনি। অভিসন্দর্ভটি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে এম ফিল ডিগ্রির জন্য দাখিল করার অনুমতি প্রদান করছি এবং পরবর্তী প্রয়োজনীয় ব্যবস্থাদি গ্রহণ করার জন্য কর্তৃপক্ষের প্রতি সুপারিশ করছি।

প্রফেসর ড. মেসবাহ কামাল
ইতিহাস বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা-১০০০
ও
গবেষণা তত্ত্বাবধায়ক

Dhaka University Institutional Repository

Dhaka University Institutional Repository

সূচিপত্র

বিষয়			পৃষ্ঠা নম্বর
কৃতজ্ঞতা স্বীকার			**২**
সার সংক্ষেপ			**৩**
ভূমিকা	**ঃ**		**৪**
প্রথম অধ্যায়	**ঃ**	মুক্তিযুদ্ধের ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপটে সাতক্ষীরা জেলা	৫-১৮
দ্বিতীয় অধ্যায়	**ঃ**	প্রাথমিক প্রস্তুতি ও প্রতিরোধ	১৯-৩৯
তৃতীয় অধ্যায়	**ঃ**	সশস্ত্র মুক্তিযুদ্ধ (১) তালা উপজেলা (২) কলারোয়া উপজেলা (৩) আশাশুনি উপজেলা (৪) দেবহাটা উপজেলা (৫) কালীগঞ্জ উপজেলা (৬) সাতক্ষীরা সদর (৭) শ্যামনগর উপজেলা ।	৪০-১১১
চতুর্থ অধ্যায়	**ঃ**	গণহত্যা এবং বিজয়	১১২-১২৭
পঞ্চম অধ্যায়	**ঃ**	উপসংহার ।	১২৮-১৩১
গ্রন্থতালিকা			১৩২-১৩৮
পরিশিষ্ট		পরিশিষ্ট- ১. শহীদ মুক্তিযোদ্ধাদের নামের তালিকা পরিশিষ্ট- ২. রাজাকারের নামের তালিকা	১৩৯-১৪৭

Dhaka University Institutional Repository

কৃতজ্ঞতা স্বীকার

যার নির্দেশনা ও সহযোগিতায় এই গবেষণা কর্মটি সুষ্ঠভাবে সম্পন্ন করা সম্ভব হয়েছে, তিনি আমার পরম শ্রদ্ধেয় শিক্ষক ও তত্ত্বাবধায়ক, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাস বিভাগের অধ্যাপক ড. মেসবাহ কামাল। তিনি আমার গবেষণা কর্মের পান্ডুলিপি কয়েকবার পড়ে প্রয়োজনীয় সংশোধন এবং পরিমার্জনে আমাকে সাহায্য করেছেন। মূল্যবান পরামর্শ দিয়ে আমার অস্পষ্ট ধারণাকে স্পষ্ট ও পরিষ্কার করেছেন। তাঁর প্রতি আমি চিরকৃতজ্ঞ।

ইতিহাস বিভাগের শ্রদ্ধেয় সকল শিক্ষককে আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি। বিশেষ ভাবে কৃতজ্ঞতা জানাতে চাই প্রফেসর ড. মুনতাসীন উদ্দীন খান মামুন, প্রফেসর ড. রাণা রাজ্জাক, ড. আমজাদ হোসেন, ড. ঈশানী চক্রবর্তী, ড. আবু মো: দেলোয়ার হোসেন, প্রমুখ শিক্ষক বৃন্দকে যারা আমাকে বিভিন্ন সময়ে সহযোগিতা ও সুপরামর্শ প্রদান করেছেন।

কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি আমার পরম শ্রদ্ধেয় শিক্ষক প্রফেসর নমিতা রানী দাস, প্রফেসর ড. মো. সেলিম, প্রফেসর ড. শামসুন্নাহার এঁর প্রতি। বিশেষভাবে কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি শিক্ষা মন্ত্রণালয় এবং মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তরকে যারা আমার এই গবেষণা কর্ম সম্পাদনের অনুমতি প্রদান করেছেন।

আমি আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানাতে চাই আমার কর্ম স্থল যশোর সরকারি মহিলা কলেজের সকল সহকর্মীর প্রতি যারা আমাকে গবেষণা সম্পাদনে সহযোগিতা করেছেন।

বিশেষভাবে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছি যারা মূল্যবান সময় ব্যয় করে আমাকে সাক্ষাৎকার প্রদান করেছেন। এঁদের মধ্যে অন্যতম হলেন দেবীরঞ্জন মন্ডল, গাজী আবুল হোসেন, সুভাষ চন্দ্র সরকার, মোশাররফ হোসেন মশু, কল্যাণ মন্ডল, চিত্তরঞ্জন বিশ্বাস, মো: আব্দুস সোবহান, মো: গোলাম মোস্তফা, এন্তাজ আলী, মো: আব্দুল হান্নান ও আবু বক্কর সিদ্দীক যাঁদের সকলেই ছিলেন একাত্তরের বীর মুক্তিযোদ্ধা।

এছাড়া যে সকল প্রত্যক্ষদর্শী সাক্ষাৎকার প্রদান করেছেন তাঁদের প্রতিও বিশেষ কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি।

আমার গবেষণা কাজের তথ্য উপাত্ত সংগ্রহ করার জন্য বাংলাদেশের বিভিন্ন গ্রন্থাগার ব্যবহার করেছি। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় লাইব্রেরি, বাংলাদেশ কেন্দ্রীয় লাইব্রেরি, এশিয়াটিক সোসাইটি গ্রন্থাগার, বাংলা একাডেমী লাইব্রেরি, জাতীয় সংসদ লাইব্রেরি, জাতীয় শিক্ষা ব্যবস্থাপনা একাডেমী লাইব্রেরি, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় লাইব্রেরি, আই.বি.এস লাইব্রেরি, যশোর জেলা কেন্দ্রীয় লাইব্রেরি, সাতক্ষীরা জেলা কেন্দ্রীয় লাইব্রেরি, রিসার্চ এন্ড ডেভলপমেন্ট কালেকটিভ (RDC) লাইব্রেরি, যশোর সরকারি মহিলা কলেজ লাইব্রেরি প্রভৃতি গ্রন্থাগার সমূহের সকল কর্মকর্তা ও কর্মচারিদের প্রতি কৃতজ্ঞতা রইল। জাতীয় আরকাইভস কর্তৃপক্ষকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাচ্ছি, তাঁরা আমাকে সাহায্য করেছেন।

কৃতজ্ঞতা পোষণ করছি আমার মা, বাবা, ভাই-বোনদের প্রতি।

আমার শ্রদ্ধেয় কাকু অধ্যাপক ভগবান মজুমদারের প্রতি আমি বিশেষভাবে কৃতজ্ঞ।

আমি আন্তরিক কৃতজ্ঞতা ও ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছি আমার জীবন সঙ্গী ডা: বিউটি রানী বিশ্বাসকে যার সার্বক্ষণিক সহযোগিতার মাধ্যমে আমি গবেষণা কর্মটি সু-সম্পন্ন করতে পেরেছি।

সর্বপরি, আমার এই এম ফিল গবেষণা কর্ম সম্পাদনে নানা পর্যায়ে সংশ্লিষ্ট সকলের প্রতি আন্তরিক কৃতজ্ঞতা ও ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছি।

ঢাকা — শুভাশীষ মজুমদার

জানুয়ারী ২০১৭

Dhaka University Institutional Repository

সার সংক্ষেপ

শিরোনামঃ মুক্তিযুদ্ধে সাতক্ষীরা

গবেষক ঃ শুভাশীষ মজুমদার

শিক্ষাবর্ষ ঃ ২০১০-২০১১

রেজিঃ নং- ১৭১

বিভাগঃ ইতিহাস

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

এম.ফিল অভিসন্দর্ভ

গবেষণা অভিসন্দর্ভটি ৫টি অধ্যায়ে বিন্যস্ত ।

প্রথম অধ্যায়ঃ মুক্তিযুদ্ধের ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপটে সাতক্ষীরা জেলা শীর্ষক প্রথম অধ্যায়ে মুক্তিযুদ্ধের প্রেক্ষাপট আলোচনা করা হয়েছে। এতে দীর্ঘকার ধরে বাঙালির অধিকার আদায়ের সংগ্রামের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস আলোচনা করে ব্রিটিশ এবং পাকিস্তানী ঔপনিবেশিক শাষন শোষণের বিরুদ্ধে সাতক্ষীরার মানুষের ভূমিকার আলোচনা করা হয়েছে। ১৯৭১ সালের মুক্তিযুদ্ধে এ অঞ্চলের মানুষের ঝাঁপিয়ে পড়া ঐতিহাসিক চেতনারই ফল। এই অধ্যায়ে প্রাচীন ও মধ্যযুগ, স্বদেশী আন্দোলন, খেলাফত ও অসহযোগ আন্দোলনে সাতক্ষীরার নেতৃবৃন্দের ভূমিকা উল্লেখিত হয়েছে। ১৯৭১ সালের অসহযোগ আন্দোলনের পূর্ব পর্যন্ত এ অধ্যায়ের আওতাভূক্ত ।

দ্বিতীয় অধ্যায়ঃ প্রাথমিক প্রস্তুতি ও প্রতিরোধ আলোচিত হয়েছে। ১৯৭১ সালের ৭ মার্চ বঙ্গবন্ধুর ঐতিহাসিক ভাষণের পর থেকে স্বাধীনতার ঘোষণা, সাতক্ষীরায় প্রত্যন্ত অঞ্চলে স্বাধীন বাংলা ছাত্র সংগ্রাম পরিষদ গঠন, মুজিব বাহিনী, বামপন্থী রাজনীতিবিদ এবং বুদ্ধিজীবীগণ মুক্তিযুদ্ধের জন্য যে ভূমিকা রেখেছেন তা আলোচিত হয়েছে। ২৬ মার্চ স্বাধীনতার ঘোষণা হলে পাকিস্তানী দখলদার বাহিনীকে প্রতিরোধ করত সাতক্ষীরায় সংঘটিত ঘটনাবলী এ অংশে আলোচনা করা হয়েছে।

তৃতীয় অধ্যায়ঃ সশস্ত্র মুক্তিযুদ্ধ । এ অধ্যায়ে সাতক্ষীরা জেলায় সংঘটিত সশস্ত্র ঘটনারাজি সবিস্তার আলোচনা করা হয়েছে। প্রাথমিক প্রতিরোধে ব্যর্থ হয়ে সাতক্ষীরার জনসাধারণ দীর্ঘস্থায়ী যুদ্ধ মোকাবেলার জন্য ভারত সরকারের সহযোগিতায় অস্ত্র প্রশিক্ষণ নিয়ে ফিরে আসে এবং সশস্ত্র যুদ্ধে যোগ দেন। টাউন শ্রীপুরের যুদ্ধ, মাগুরার যুদ্ধ, বারাত যুদ্ধ, বেলে ডাঙ্গার যুদ্ধ, কাক ডাঙ্গার যুদ্ধ অন্যতম। ৭ ডিসেম্বর সাতক্ষীরা শত্রুমুক্ত হয়। ১৬ ডিসেম্বর ঢাকায় পাকিস্তানী সেনারা আত্মসমর্পণ করলে সাতক্ষীরা থেকে পাকিস্তানী বাহিনী হটে যায় এবং খুলনায় গিয়ে অবস্থান নেয়। ১৭ ডিসেম্বর তারা খুলনায় আত্মসমর্পন করে।

Dhaka University Institutional Repository

চতুর্থ অধ্যায়ঃ আলোচিত হয়েছে গণহত্যা এবং বিজয় প্রসঙ্গ। ৯ মাসের মুক্তিযুদ্ধ চলাকালে পাকিস্তানী হানাদার বাহিনী সর্বত্র নির্মম গণহত্যা এবং নির্যাতন, লুটপট ও অগ্নিসংযোগ করে। হরিণগর বাজারের গণহত্যা, ঝাউডাঙ্গার গণহত্যা, কাকশিয়ালী ব্রিজের গণহত্যা, পাটকেল ঘাটার গণহত্যা, মাগুরার গণহত্যা, ইছামতি নদীর গণহত্যা, সাতক্ষীরা টাউন হাইস্কুল মাঠের গণহত্যা সমূহ এ অধ্যায়ে বর্ণিত হয়েছে।

পঞ্চম অধ্যায়ঃ উপসংহার। এই অধ্যায়ে পূর্ববর্তী অধ্যায়ের তথ্য-উপাত্ত ও বিশ্লেষণের সূত্রধরে সিদ্ধান্ত সূচক আলোচনা উপস্থাপিত হয়েছে।

Dhaka University Institutional Repository

ভূমিকা

জাতির গৌরবময় ইতিহাস, জনগনের মধ্যে দেশপ্রেম জাগ্রত করে। স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠার ইতিহাস আমাদের শ্রেষ্ঠ অর্জন। আন্দোলন সংগ্রামের দীর্ঘ পথ অতিক্রমের পর ১৯৭১ সালের ২৬ মার্চ স্বাধীনতা ঘোষণা করলেন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান। স্বাধীনতা ঘোষণার পর পাকিস্তানী দখলদার বাহিনী ও তাদের এ দেশীয় দোসরদের বিরুদ্ধে দীর্ঘ নয় মাস যুদ্ধ করতে হয়। যুদ্ধে শুধুমাত্র বাঙালিরাই অংশগ্রহণ করেনি বরং সমতল ও পাহাড়ের আদিবাসী এবং ভারতীয় মিত্র বাহিনীর সদস্যগণও জীবন দিয়েছে। ব্রিটিশ এবং পাকিস্তানী শোষণের বিরুদ্ধে সংগ্রামের ধারাবাহিকতার শেষ পর্যায়ে এ দেশের সর্বস্তরের মানুষ স্বাধীনতা ও মুক্তি যুদ্ধের জন্য জীবন বাজি রাখে। জন সাধারনের সর্বাত্বক অংশগ্রহনের জন্য এই যুদ্ধকে জনযুদ্ধও বলা হয়। ১৯৭১ সালের মুক্তিযুদ্ধে আওয়ামী লীগের নেতৃত্বে যোগ দিয়েছিল অনেকগুলো বাম ধারার রাজনৈতিক দল, যুদ্ধে অংশগ্রহণ করে সকল পেশা ও সম্প্রদায়ের নারী পুরুষ। বাংলাদেশের সকল জনপদে এবং প্রত্যন্ত অঞ্চলে মুক্তিযুদ্ধ সংঘটিত হয়েছে। যুদ্ধে পাকিস্তানী হানাদার বাহিনী বাংলার সকল অঞ্চলে গণহত্যা চালায় এবং নারী নির্যাতন করে, বিতাড়িত হয় সংখ্যালঘুসহ সকল সম্প্রদায়ের মানুষ।

বাংলাদেশের দক্ষিণাঞ্চলের সুন্দরবন সংলগ্ন জেলা সাতক্ষীরাও ব্রিটিশ ও পাকিস্তানী শোষণের বিরুদ্ধে সংঘটিত আন্দোলনে অবদান রাখে। সাতক্ষীরা একটি নদী বহুল এবং ভারত সংলগ্ন জেলা। গোপালগঞ্জ, পিরোজপুর, ভোলা, পটুয়াখালী, বাগেরহাট, যশোরের কেশবপুর ও মনিরামপুর এবং খুলনা অঞ্চলের মানুষ সাতক্ষীরার প্রত্যন্ত অঞ্চলের নদীপথ দিয়ে ভারতে পাড়ি দেয়ার সময় পথমধ্যে পাকিস্তানী হানাদার বাহিনী এবং রাজাকার বাহিনীর হাতে গণহত্যার শিকার হয়। পাটকেল ঘাটার গণহত্যা, সাতক্ষীরা টাউন হাইস্কুলের গণহত্যা, ঝাউগাছার গণহত্যা, কাকশিয়ালী ব্রিজের গণহত্যা, খলিষ খালীর গণহত্যা কেবল সাতক্ষীরার নয় বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাসের গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা।

সামগ্রিকভাবে মুক্তিযুদ্ধ ভিত্তিক অসংখ্য বই রচিত হয়েছে এবং অনেক গবেষণাও হয়েছে। কিন্তু "মুক্তিযুদ্ধে সাতক্ষীরা" এই শিরোনামে কোন গবেষণাকর্ম সম্পাদিত হয়নি। যুদ্ধকালীন সাতক্ষীরায় সংঘটিত ঘটনা সমূহের অনেক অজানা তথ্য অনুদঘাটিত রয়ে গেছে, যার কিছু কিছু ইতোমধ্যে বিস্মৃতির অন্তরালে হারাবার উপক্রম হয়েছে। তাছাড়া গবেষণা না হওয়ায় অনেক বিষয়ের বিকৃতিও ঘটেছে।

আঞ্চলিক ইতিহাসের সমন্বয়ে রচিত হয় জাতীয় ইতিহাস তাই মুক্তিযুদ্ধের জাতীয় ইতিহাস রচনার প্রয়োজন মুক্তিযুদ্ধের আঞ্চলিক ইতিহাস রচনা করা প্রয়োজন। এই গবেষণা কর্ম সম্পাদনের পেছনে সেই প্রনোদনা কাজ করেছে। "মুক্তিযুদ্ধে সাতক্ষীরা" শীর্ষক গবেষণা কর্মে ঐতিহাসিক পদ্ধতি অনুসরণ করা হয়েছে যার অংশ হিসাবে দালিলিক তথ্যাদি ব্যবহারের চেষ্টা করা হয়েছে। দালিলিক তথ্যের সীমাবদ্ধতার জন্য অনেক প্রতিবন্ধকতার সম্মুখীন হতে হয়েছে। সে জন্য স্মৃতিচারণকে প্রাথমিক উৎস হিসেবে এই গবেষণায় গ্রহণ করা হয়েছে। এ ক্ষেত্রে ১২০ জন্য মুক্তিযোদ্ধা, ৮০ জন প্রত্যক্ষদর্শী, ২০ জন শহীদ পরিবারের সদস্যদের সাক্ষাৎকার ভিডিও ধারণ করেছি। "মুক্তিযুদ্ধে সাতক্ষীরা" শীর্ষক গবেষণা কর্মটি মুক্তিযুদ্ধ কালীন সাতক্ষীরায় অনেক প্রশ্নের সমাধান দিবে এবং তা মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাসকে সমৃদ্ধ করবে।

Dhaka University Institutional Repository

প্রথম অধ্যায়

মুক্তিযুদ্ধের ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপটে সাতক্ষীরা জেলা

ভূমিকাঃ

১৯৭১ সালের ২৬ মার্চ জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের বাংলাদেশের স্বাধীনতা ঘোষণার মধ্য দিয়ে শুরু হয় রক্তক্ষয়ী মুক্তিযুদ্ধ এবং ১৬ ডিসেম্বর ১৯৭১ পাকিস্তানী সেনা বাহিনীর আত্মসমর্পনের মধ্য দিয়ে মুক্তিযুদ্ধের অবসান ঘটে এবং প্রতিষ্ঠিত হয় স্বাধীন বাংলাদেশ । প্রায় নয় মাসের এ সশস্ত্র মুক্তিযুদ্ধ কোন আকস্মিক ঘটনা ছিল না বা কোন বৈপ্লবিক আন্দোলনের পরিণতিও নয় বরং তা ছিল পাকিস্তানী ঔপনিবেশিক শাসনের বিরুদ্ধে জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের চূড়ান্ত পরিণতি । ১৯৪৭ সাল থেকে ১৯৭১ পর্যন্ত ২৪ বছরের পাকিস্তানী ঔপনিবেশিক শাসন শোষনের বিরুদ্ধে এ আন্দোলনের মূলে নিহিত ছিল বাঙালির স্বাধীকার চেতনা । এ চেতনাই বাঙালির অন্যতম প্রধান বৈশিষ্ট্য । আদিকাল থেকেই বাঙালি জনগোষ্ঠী এ চেতনা ধারণ করে আসছে এবং এর মাধ্যমে পরবর্তীকালের বহু বৈদেশিক আক্রমণ ও পরাধীনতার মাঝেও বাঙালির এ স্বতন্ত্র রূপ বজায় রয়েছে । বাঙালির স্বাধীকারের এ স্পৃহা বরাবরই রাজনীতি কেন্দ্রীক ছিল বলে ইতিহাসে প্রমাণ মেলে । ১৭৫৭ সালের পলাশী যুদ্ধে হারানো স্বাধীনতা ১৭৬৫ সালের বক্সরের যুদ্ধ, ১৮৫৭ সালের মহাবিদ্রোহ, ১৯০৫ সালের বঙ্গভঙ্গ বিরোধী আন্দোলন ১৯৫২ সালের ভাষা আন্দোলন এ সবের বহিঃপ্রকাশ । কারণ সুযোগ পেলেই তারা রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে রাজনৈতিক ক্ষমতা কেড়ে নিতে সচেষ্ট হয়েছে ।

১৯৭১ সালের ২৬ মার্চ জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের বাংলাদেশের স্বাধীনতা ঘোষণার মধ্য দিয়ে শুরু হয় রক্তক্ষয়ী মুক্তিযুদ্ধ এবং ১৬ ডিসেম্বর ১৯৭১ পাকিস্তানী সেনা বাহিনীর আত্মসমর্পনের মধ্য দিয়ে মুক্তিযুদ্ধের অবসান ঘটে এবং প্রতিষ্ঠিত হয় স্বাধীন বাংলাদেশ। প্রায় নয় মাসের এ সশস্ত্র মুক্তিযুদ্ধ কোন আকস্মিক ঘটনা ছিল না বা কোন বৈপ্লবিক আন্দোলনের পরিণতিও নয় বরং তা ছিল পাকিস্তানী ঔপনিবেশিক শাসনের বিরুদ্ধে জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের চূড়ান্ত পরিণতি। ১৯৪৭ সাল থেকে ১৯৭১ পর্যন্ত ২৪ বছরের পাকিস্তানী ঔপনিবেশিক শাসন শোষনের বিরুদ্ধে এ আন্দোলনের মূলে নিহিত ছিল বাঙালির স্বাধীকার চেতনা। এ চেতনাই বাঙালির অন্যতম প্রধান বৈশিষ্ট্য। আদিকাল থেকেই বাঙালি জনগোষ্ঠী এ চেতনা ধারণ করে আসছে এবং এর মাধ্যমে পরবর্তীকালের বহু বৈদেশিক আক্রমণ ও পরাধীনতার মাঝেও বাঙালির এ স্বতন্ত্র রূপ বজায় রয়েছে। ১৭৫৭ সালের পলাশী যুদ্ধে হারানো স্বাধীনতা, ১৭৬৫ সালের বক্সারের যুদ্ধ, ১৮৫৭ সালের মহাবিদ্রোহ, ১৯০৫ সালের বঙ্গভঙ্গ বিরোধী আন্দোলন, ১৯৫২ সালের ভাষা আন্দোলন এসবের বহিঃপ্রকাশ।

Dhaka University Institutional Repository

ইতিহাসের নানা সন্ধিক্ষণে বাঙালি জাতি রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে রাজনৈতিক ক্ষমতা কেড়ে নিতে সচেষ্ট হয়েছে।

সাতক্ষীরা-যশোর অঞ্চলের রাজা প্রতাপাদিত্য মোগল বাহিনীর বিরুদ্ধে স্বাধীনতার জন্য যুদ্ধ করেন। তাঁর পুত্র উদয়াদিত্য বীরত্বের সাথে যুদ্ধ করে নিহত হন।[১] একথা অনস্বীকার্য যে, বাঙালি জনগোষ্ঠী দীর্ঘদিন ধরে ঔপনিবেশিক শাসনাধীন ছিল এবং এ সময়ে বিদ্রোহের পাশাপাশি বিশ্বাসঘাতকতামূলক তৎপরতা তাদের মধ্যে বিদ্যমান ছিল। তবে এ তৎপরতা কেবলমাত্র বাঙালিদের মধ্যে নয়, বিশ্বের অন্যান্য উপনিবেশের মানুষের মধ্যেও ছিল এবং তা যেমন কোন জাতির সামগ্রিক চিত্র নয়, তেমনি বাঙালির ক্ষেত্রেও নয়। স্বাধীনতা স্পৃহাই বাঙালির প্রধান চিত্র। বাঙালিরা সুযোগ পেলেই স্বাধীনতা অর্জনের জন্য বিদ্রোহ করেছে, অস্ত্র হাতে তুলে নিয়েছে, আঘাত করেছে, রক্ত দিয়েছে। বাঙালির সুদীর্ঘ ইতিহাস পর্যালোচনা করে জিয়াউদ্দিন বারানী বাঙালিকে বিদ্রোহের জাতি হিসেবে আখ্যায়িত করেছেন। ১৯৭১ সালে খুলনার একটি মহকুমা সাতক্ষীরায় সংঘটিত স্বাধীনতা আন্দোলন ও মুক্তিযুদ্ধ এ চেতনারই বিহঃপ্রকাশ। মুক্তিযুদ্ধে সাতক্ষীরার মানুষের ভূমিকা যেমন গর্বের তেমনি যে গণহত্যা ও নির্যাতন হয়েছে তার বিবরণ হৃদয়গ্রাহী। তাই সুদীর্ঘকালের ইতিহাসের আলোকে সাতক্ষীরার মুক্তিযুদ্ধকে বিশ্লেষণ করা প্রয়োজন।

প্রাচীন এবং মধ্যযুগ

বাঙালির আদি রাষ্ট্র 'বঙ্গ' প্রাচীনকাল থেকেই শৌর্যে বীর্যে খ্যাত ছিল।[২] উত্তর ভারতীয়রা অতিসহজে আর্যদের কাছে হার মানলেও বাঙালিরা তাদের প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করতে সক্ষম হয়। পাল আমলে খুলনা যশোর এলাকায় অনেক রাজার অস্তিত্ব পাওয়া যায়। যেমন সাতক্ষীরা জেলার কলারোয়া (বর্তমানে উপজেলা) এলাকার মানিঘরে 'তিয়র রাজা' প্রভৃতি।[৩] পাল শাসনামলে এ সকল রাষ্ট্রের উত্থান রাজার বিরুদ্ধে স্থানীয় মানুষের সফল বিদ্রোহের কথাই প্রমান করে। ১১৯৬ সালে লক্ষণ সেনের বিরুদ্ধে ডোম্মন পাল সুন্দরবন অঞ্চলে বিদ্রোহ করে একটি স্বাধীন রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করেন।[৪]

যশোর রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা রাজা প্রতাপাদিত্যের পিতা বিক্রমাদিত্য মোগল সম্রাটের নিকট থেকে এই অঞ্চলের শাসন ক্ষমতা লাভ করেন।[৫] বীরপুত্র সিংহাসন লাভের পর ইছামতি, যমুনার সঙ্গম স্থান গড় মুকুন্দপুর থেকে রাজধানী অনেকখানি সরিয়ে অতিধূমধামের সাথে রাজধানী নির্মাণ করেন। পরবর্তীতে ঐ রাজধানী

---

[১] সতীশ চন্দ্র মিত্র, ***যশোর-খুলনার ইতিহাস,***দে'জ পাবলিকেশন্স, কলিকাতা, ১৯৯৩, পৃষ্ঠা ঃ ৩০ ।

[২] রাখাল দাস বন্দ্যোপাধ্যায়, ***বাঙ্গালার ইতিহাস, ১ম খন্ড***, দে'জ পাবলিকেশন, কলিকাতা, ১৩২১, পৃষ্ঠা ঃ ২৩। আরও দেখবেন, নীহার রঞ্জন রায়, ***বাঙালীর ইতিহাস, আদি পর্ব,*** দে'জ পাবলিকেশন, কলিকাতা, ১৯৯৩, পৃষ্ঠা ঃ ১১০।

[৩] মোল্লা আমীর হোসেন, ***মুক্তিযুদ্ধে খুলনা***, সুবর্ন পাবলিকেশন্স, ঢাকা, ২০০৯, পৃষ্ঠা ঃ ৪০।

[৪] ঐ।

[৫] মোঃ আবুল হোসেন, ***সাতক্ষীরা জেলার ইতিহাস***, কাকলি পাবলিকেশন্স, খুলনা, ২০১১, পৃষ্ঠা ঃ ৫৫।

Dhaka University Institutional Repository

সংলগ্ন স্থানটির নাম হয় ধূমঘাট।[৬] যা বর্তমান সাতক্ষীরার ঈশ্বরীপুর। মধ্যযুগে রাজা প্রতাপাদিত্য ও তাঁর পুত্র উদয়াদিত্য মোগল বিরোধী সশস্ত্র সংগ্রাম এবং দীর্ঘদিন এতদাঞ্চলের স্বাধীনতা অক্ষুন্ন রাখার ইতিহাস এ অঞ্চলের শৌর্য বীর্যের পরিচয় বহন করে। [৭]

সাতক্ষীরা কলকাতা শহরের নিকটবর্তী হওয়ায় কলকাতা কেন্দ্রিক ব্রিটিশ বিরোধী আন্দোলনে এ অঞ্চলের মানুষ অনবদ্য ভূমিকা রাখে। কংগ্রেস নেতা সৈয়দ জালাল উদ্দীন হাশেমী স্বীয় মেধাবলে এদেশের নিপীড়িত লাঞ্ছিত হিন্দু মুসলিম জনগণকে একত্রিত করে ব্রিটিশ বিরোধী আন্দোলনের গতি সঞ্চার করেন। বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভার স্পীকার (১৯৪০-৪৬) যিনি বাঘের আক্রমনে একটি পা হারিয়ে ছিলেন।[৮] তাঁর একটি জনপ্রিয় ব্রিটিশ বিরোধী বক্তব্য ছিল, "এক পা দিয়েছে বাঘের মুখে আর এক পা দিব ইংরেজদের মুখে"।[৯] সৈয়দ জালাল উদ্দীন হাশেমী অসহযোগ আন্দোলন, লবণ আইন অমান্য আন্দোলন সহ ব্রিটিশ বিরোধী আন্দোলনে নেতৃত্ব দান করে কারাবরণ করেন।

স্বদেশী আন্দোলন

স্বদেশী শিল্প প্রসারের ক্ষেত্রে বিজ্ঞানী স্যার প্রফুল্ল চন্দ্র রায় প্রতিষ্ঠিত বেঙ্গল কেমিক্যাল ইন্ডাষ্ট্রিজ এর ভূমিকা গুরুত্বপূর্ণ।[১০] কলকাতার কলেজ স্ট্রীটে কমলালয় এবং কাত্যায়নী স্টোর্স- নামে দুটি বড় বিপনী প্রতিষ্ঠিত হয় স্বদেশী যুগে। কমলালয়ের প্রতিষ্ঠাতা হলেন সুরেন্দ্র নাথ চক্রবর্তী ইসলামকাঠী, তালা, সাতক্ষীরা।[১১] কাত্যায়নী স্টোর্স এর প্রতিষ্ঠাতা জমিদার যতীন্দ্রনাথ রায় চৌধুরী, নকিপুর শ্যামনগর সাতক্ষীরা।[১২]

সেই যুগে যশোর স্টীম নেভিগেশন কোম্পানী 'শক্তি', যশোরেশ্বরী ও দূর্গা নামে তিনটি স্টীমার ভৈরব, চিত্রা ও নবগঙ্গা নদীপথে চালু করে।[১৩] কোম্পানীটি বিলেতি বড় স্টীমার সংস্থা জ.ঝ.ঘ কোম্পানীর প্রবল প্রতিযোগিতার সম্মুখীন হয়ে শেষ পর্যন্ত অচল হয়ে যায়। সমসাময়িক কালে তালার ধানদিয়া গ্রামের ফণিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের পরিচালনায় আর একটি স্বদেশী স্টীমার কোম্পানী প্রতিষ্ঠিত হয়। দীর্ঘদিন

[৬] ঐ, পৃষ্ঠা ঃ ৫৬।
[৭] ঐ, পৃষ্ঠা ঃ ৫৭।
[৮] ঐ, পৃষ্ঠা ঃ ২৩০।
[৯] ঐ, পৃষ্ঠা ঃ ২২৯।
[১০] শ্রী সুকুমার মিত্র, ***ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামে যশোর ও খুলনা,*** দে'জ পাবলিকেশন্স, কলিকতা, ১৯৮৯, পৃষ্ঠা ঃ ৮ ।
[১১] মোঃ আবুল হোসেন, প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা ঃ ৫৬ ।
[১২] ঐ, পৃষ্ঠা ঃ ৯৮ ।
[১৩] ঐ ।

Dhaka University Institutional Repository

'কপোতাক্ষ' ও 'ফরচুন' নামে দুটি ছোট স্টীমার যশোরের ঝিকরগাছা থেকে পাটকেলঘাটা, তালা হয়ে খুলনার কপিলমুনি পর্যন্ত চলাচল করত ।[১৪]

খেলাফত, অসহযোগ ও আইন অমান্য আন্দোলন

১৯২০ সালের ৪ সেপ্টেম্বর কলকাতায় কংগ্রেসের এক সভায় কংগ্রেস আনুষ্ঠানিক ভাবে গান্ধীজির অসহযোগ নীতি অনুমোদন করে এবং শুরু হয় সারাদেশে অসহযোগ ও খেলাফত আন্দোলন ।[১৫] বাংলা থেকে খেলাফত আন্দোলনে অংশগ্রহণকারীদের মধ্যে খুলনা থেকে আহমদ আলী অন্যতম ।[১৬] এছাড়া মওলানা মোয়েজউদ্দীন হামিদী (পাঁচনল, কলারোয়া) খান বাহাদুর মোবারেক আলী (নলতা কালীগঞ্জ) খান সাহেব 'কাজী রেজওয়ান উল্লাহ (তেঁতুলিয়া তালা), সৈয়দ জালাল উদ্দীন হাশেমী (তেঁতুলিয়া তালা), আব্দুল আজিজ (আলিপুর, সাতক্ষীরা), মওলানা আহম্মদ আলী (বুলারাটি, সাতক্ষীরা সদর), মওলানা বজলুর রহমান (দূর্গাপুর, আশাশুনি) সহ অনেকেই খেলাফত আন্দোলনের সাথে জড়িত ছিলেন ।[১৭]

অসহযোগ আন্দোলন খুলনা, বাগেরহাট, সাতক্ষীরা এই তিন মহকুমা জুড়ে ছড়িয়ে পড়ে । সাতক্ষীরার উকিল যতীন্দ্রনাথ মিত্র তাঁর আইন ব্যবসা মুলতবি রেখে বিদেশী পন্য ও মাদকদ্রব্য বর্জন এবং স্বদেশী পন্য প্রচলনের জন্য সভা করেন এবং শোভাযাত্রা বের করেন ।[১৮] ধলবাড়িয়ার (কালীগঞ্জ) তরুণ গান্ধীবাদী জমিদার নগেন ভট্টাচার্য ও তাঁর এলাকায় শক্তিশালী আন্দোলন গড়ে তুলে বিশেষ জনপ্রিয় হন ।[১৯] শেখ আবুল আলম (লাবসা, সাতক্ষীরা) গান্ধীজির অসহযোগ আন্দোলনে যোগদান করার অভিযোগে ব্রিটিশ সরকার তাঁকে আটক করে কিছুদিন কারাবন্দী করে রাখেন ।[২০] উকিল শরৎচন্দ্র বাবু (টাউন শ্রীপুর), ডাঃ বিধান চন্দ্র রায় (টাউন শ্রীপুর), পরবর্তীতে পশ্চিমবঙ্গের মূখ্য মন্ত্রী । সাহিত্যিক মোহাম্মদ ওয়াজেদ আলী (বাঁশদহ), অধ্যাপক আব্দুল ওয়াজেদ আলী (সরুলিয়া) প্রমুখ কংগ্রেস দলের সাথে যুক্ত ছিলেন ।[২১] সাহিত্যিক ওয়াজেদ আলী কলকাতা বঙ্গবাসী কলেজে অধ্যয়ন কালে অসহযোগ আন্দোলনে যোগ দিয়েছিলেন ।[২২] সাতক্ষীরায় স্থানীয় অসহযোগ আন্দোলনকারীদের মধ্যে যারা মুখ্য ভূমিকা পালন করেন তাদের মধ্যে গ্রীস্পতি রায় কাব্যতীর্থ (টাউন শ্রীপুর) উকিল যতীন্দ্রনাথ মিত্র (সাতক্ষীরা পৌরসভা), হেডমাস্টার জীতেন্দ্র নাথ মিত্র (কুমিরা), যতীন্দ্রনাথ ঘোষ

---

[১৪] ঐ ।
[১৫] ঐ, পৃষ্ঠা ঃ ১০৬ । আরও দেখবেন, ড. আবু মোঃ দেলোয়ার হোসেন, ***বাংলাদেশের ইতিহাস (১৯০৫-১৯৭১),*** বিশ্ববিদ্যালয় প্রকাশনী, ঢাকা, ২০১৩, পৃষ্ঠা ঃ ৭৯ ।
[১৬] মোঃ আবুল হোসেন, প্রাগুক্ত- পৃষ্ঠা ঃ ১০৬ ।
[১৭] ঐ । আরও দেখবেন, বদরু মোঃ খালেকুজ্জামান, ***তালা উপজেলার ইতিহাস***, ইত্যাদি গ্রন্থ প্রকাশ, ঢাকা-২০০৬, পৃষ্ঠা ঃ ৩০ ।
[১৮] ঐ, পৃষ্ঠা ঃ ১০৭
[১৯] ঐ ।
[২০] ঐ ।
[২১] ঐ ।
[২২] ঐ, পৃষ্ঠা ঃ ১৮ ।

Dhaka University Institutional Repository

(গোপালপুর, তালা) সৈয়দ জালাল উদ্দীন হাশেমী (তেঁতুলিয়া, তালা) ননী গোপাল রায় চৌধুরী (মাগুরা, তালা) সত্যচরণ চক্রবর্তী, রমেন রায় চৌধুরী, শিবপদ বসু, উকিল তারক নাথ মোদক, সাংবাদিক নির্মল চন্দ্র ঘোষ, বিভূতিভূষণ দেব, বিনয় বন্দ্যোপাধ্যায়, মওলানা আহম্মদ আলী (বুলারাটি), প্রমূখ্য উল্লেখ যোগ্য ।[২৩] অসহযোগ আন্দোলন পরিচালনা করার জন্য সারাদেশে জেলা ও মহকুমা পর্যায়ে কমিটি গঠিত হয় । ১৯২১ সালে সাতক্ষীরায় প্রথম কংগ্রেসের কমিটি গঠিত হয় । সৈয়দ জালাল উদ্দীন হাশেমী সভাপতি এবং উকিল যতীন্দ্র নাথ মিত্র সেক্রেটারী নির্বাচিত হন ।[২৪]

১৯৩০ সালে মহাত্মা গান্ধীর নেতৃত্বে লবণ আইন অমান্য আন্দোলন শুরু হলে অন্যান্য স্থানের ন্যায় সাতক্ষীরায় কংগ্রেস কমিটি আরও শক্তিশালী হয়ে ওঠে ।[২৫] এ সময় যারা সাতক্ষীরা এলাকার নেতাকর্মী হিসেবে কমিটিতে যোগদান করেন তারা হলেন- ডাঃ অমূল্য রতন সেন (বালিয়াদহ), ডাঃ পূর্ণচন্দ্র বাবু রাম (ধানদিয়া), গঙ্গাচরণ ভট্টাচার্য্য (কেড়াগাছি), সন্তোষ কবিরাজ সিঙ্গা প্রমুখ ।[২৬]

খুলনার কিশোরী মোহন চ্যাটার্জীর নেতৃত্বে একদল আইন অমান্যকারী সাতক্ষীরায় আসে ২৯ এপ্রিল । এখানে একটি বিরাট সভা হয় এবং আন্দোলন সম্পর্কে বক্তৃতা করেন সত্যচরণ চক্রবর্তী এবং আরও অনেকে ।[২৭]

কিশোরী মোহন চ্যাটার্জী নিষিদ্ধ লবণ বিক্রয় করেন ।[২৮] নিলামে এক প্যাকেট লবণের দাম ওঠে ১০৫ টাকা ।[২৯] জেলায় লবণ আইন অমান্য আন্দোলনের প্রধান কেন্দ্র ছিল আচার্য প্রফুল্য চন্দ্র রায়ের নিজ গ্রাম রাড়ুলিতে । পুলিশের প্রবল বাধার মুখে আইন অমান্য আন্দোলন করেন সত্যাগ্রহীরা । একপক্ষকাল ব্যাপী আইন অমান্য আন্দোলন ও গ্রেফতার পর্ব চলে ।[৩০] সাতক্ষীরার কালীগঞ্জে লবণ আইন ভঙ্গ করা হয় । কালীগঞ্জ থেকে গ্রেফতার হন রতনপুরের তেজেন্দ্র কুমার সরকার, গোলক বিহারী ঘোষ, বিজন ঘোষ, দক্ষিণ শ্রীপুরের প্রফুল্ল মুখার্জী, ধলবাড়িয়া নগেন ভট্টাচার্য, মুকুন্দপুরের নিরঞ্জন রায় সহ আরও অনেককে বিচারে কারাদণ্ড দেয়া হয় ।[৩১] সাতক্ষীরাতে গাঁজা, মদের দোকানে বা স্কুলে পিকেটিং করে অথবা ১৪৪ ধারা অমান্য করে জনসভায় বক্তৃতা দিয়ে বহু নেতা ও শত শত কর্মী কারাবরণ করেন ।[৩২]

---

[২৩] শ্রী সুকুমার মিত্র, প্রাগুক্ত- পৃষ্ঠা ঃ ১০ ।
[২৪] মোঃ আবুল হোসেন, প্রাগুক্ত- পৃষ্ঠা ঃ ১০৯ ।
[২৫] ঐ ।
[২৬] ঐ ।
[২৭] সতীশ চন্দ্র মিত্র, প্রাগুক্ত- পৃষ্ঠা ঃ ৭ ।
[২৮] মোল্লা আমীর হোসেন, প্রাগুক্ত- পৃষ্ঠা ঃ ৪২ ।
[২৯] অজিত কুমার নাগ, *স্বাধীনতা সংগ্রামে খুলনা,* দে'জ পাবলিকেশন্স, কলিকাতাঃ ১৯৮৪, পৃষ্ঠা ঃ ২৫ ।
[৩০] শ্রী সুকুমার মিত্র, প্রাগুক্ত- পৃষ্ঠা ঃ ১০ ।
[৩১] মোঃ আবুল হোসেন, প্রাগুক্ত- পৃষ্ঠা ঃ ১১০ ।
[৩২] ঐ ।

Dhaka University Institutional Repository

১৯৩০ সালে আইন অমান্য আন্দোলনে যশোর খুলনায় কারাদণ্ড ভোগ করে পাঁচ হাজারের অধিক সত্যাগ্রহী ।[৩৩] তাদের মধ্যে সাতক্ষীরা এলাকা থেকে যারা কারাদণ্ড ভোগ করেন তাদের সংক্ষিপ্ত বিবরণ উল্লেখ করা হলোঃ-

(১) ২৩ জুলাই সাতক্ষীরায় মদের দোকানে পিকেটিং করায় ছাত্র সমিতির সভাপতি রামেন্দ্র নাথ রায় চৌধুরী সহ ৬ জন স্বেচ্ছা সেবকের কারাদণ্ড হয় ।

(২) ২৭ জুলাই তৎকালীন খুলনার দক্ষিণাঞ্চলের সর্ববৃহৎ গঞ্জ বড়দল মুদির দোকানে পিকেটিং এ হরিপদ সর্দার, কার্তিক দত্ত, শচীন সরকার, সুবোধ ঘোষ, পতিতপাবন দে, বিষ্ণুপদ ঘোষ ও অমরেন্দ্র নাথ ঘোষ দন্ডিত হন ।

(৩) ৪ আগষ্ট কালীগঞ্জ উপজেলার ধলবাড়িয়ায় লবণ আইন ভঙ্গের অপরাধে স্থানীয় গান্ধীবাদী নেতা জমিদার নগেন্দ্র নাথ ভট্টাচার্য এবং তাঁর সঙ্গে রাজেন্দ্র ভট্টাচার্য ও গীরিন্দ্রনাথ গ্রেফতার হন এবং তাঁদের কারাদণ্ড হয় । সাতক্ষীরার বিশিষ্ট আইনজীবী ও কংগ্রেস নেতা যতীন্দ্রনাথ মিত্র, তালা উপজেলার কুমিরা গ্রামের জীতেন্দ্র নাথ মিত্র সহ অনেকে আইন অমান্য আন্দোলনে নেতৃত্বের কারণে কারাদণ্ড ভোগ করেন । যে সব সংগ্রামী অমানসিক দুঃখ কষ্ট ও নির্যাতন বরণ করেন তাঁদের মধ্যে তালা মাগুরার ননী গোপাল রায় চৌধুরী, সাতক্ষীরার স্থানীয় সাপ্তাহিক পত্রিকার স্বাধীন চেতা সম্পাদক নির্মল চন্দ্র ঘোষ, সাতক্ষীরার সত্যচরণ চক্রবর্তী, রমেন রায় চৌধুরী শিবপদ বসু, তারকনাথ মোদক, বিভূতিভূষণ দে ও বিনয় বন্দ্যোপাধ্যায় । ১৯৩০ সালের আইন অমান্য আন্দোলনের ফলে জেলার সর্বত্র অতূতপূর্ব আলোড়ন সৃষ্টি হয় । আন্দোলন দমনের জন্য সরকার কতটা প্রতিহিংসা পরায়ণ হয়েছিল তাঁর প্রমাণ আনন্দ বাজার পত্রিকায় প্রকাশিত সংবাদ (১৯.১১.১৯৩০) । সাতক্ষীরার উকিল শ্রীযুক্ত তারকনাথ মোদক কংগ্রেস স্বেচ্ছাসেবক দিগকে ঘর ভাড়া দেয়ার অপরাধে ১ বছর কারাদণ্ড এবং ২০০ টাকা অর্থদণ্ড অনাদায়ে আরও এক মাসের কারাদণ্ডে দন্ডিত হয়েছেন । ইংরেজদের বিরুদ্ধে অসহযোগ আন্দোলনের অংশ হিসেবে মওলানা আহম্মদ আলীর নেতৃত্বে পরিচালিত হয় তামাক বিরোধী আন্দোলন ।

কৃষক বিদ্রোহ

উনবিংশ শতাব্দীর শেষ ভাগে জমিদার ও মহাজনের শোষণ ও অত্যাচারের বিরুদ্ধে আঞ্চলিক সংগ্রাম স্বতঃস্ফূর্তভাবে শুরু হয় । ঔপনিবেশিক শোষণ আর জমিদার জোতদারদের অত্যাচারে জনগণ অতিষ্ঠ হয়েছে । তারা এর বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করেছে ও প্রতিবিধানের সুযোগ খুজেছে । অত্যাচার অসহনীয় পর্যায়ে পৌছালে

[৩৩] অজিত কুমার নাগ ঐ, পৃষ্ঠা ঃ ২৪ ।

Dhaka University Institutional Repository

তারা সংঘবদ্ধ ভাবে প্রতিবাদ মুখর হয়ে উঠেছে। জ্বলে উঠেছে প্রতিরোধের আগুন। এসব বিদ্রোহ বিক্ষোভের মধ্যদিয়ে প্রতিবাদী চেতনায় যে বীজ অংকুরিত হয় তা পরে বৃহত্তর রাজনীতির কাঠামোতে গ্রথিত হয়েছে। ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির বঙ্গীয় প্রাদেশিক কমিটির উদ্যোগে ১৯৩৬ সালে কলকাতার এ্যালবার্ট হলে বিভিন্ন জেলার প্রতিনিধিদের নিয়ে বঙ্গীয় কৃষক সভা সংগঠনী কমিটি গঠিত হয়।[৩৪] সাতক্ষীরা মহকুমার পাটকেলঘাটায় কুমিরার অমূল্য মজুমদারের সহযোগিতায় শচীন বসু, অনীল ঘোষ এবং সুবল মিত্র বিরাট কৃষক সমাবেশের আয়োজন করেন।[৩৫] এই সমাবেশের প্রধান বক্তা ছিলেন কৃষক নেতা সুজাত আলী মজুমদার। ১৯৩৬ সালে কৃষক সমিতি হাটবাজারে তোলা বন্ধের আন্দোলন করে। এ আন্দোলনের নেতৃত্ব দেন শচীন বসু।[৩৬] জমিদার ইজারাদারদের উদ্যোগে পুলিশ এ আন্দোলন বন্ধের উদ্যোগ গ্রহণ করে। কৃষক সমিতির উদ্যোগে এর আন্দোলন জয়যুক্ত হয়।[৩৭]

১৯৪৩ সালে সাতক্ষীরা শহরের রসুলপুর মাঠে এক বিরাট কৃষক সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয। সাতক্ষীরা মহকুমার কৃষক আন্দোলন গড়ে তোলার লক্ষে কার্য পরিচালনা করেন। প্রাদেশিক কৃষক সভার পক্ষে প্রবীণ নেতা আব্দুর রেজ্জাক খাঁ এই সভায় সভাপতিত্ব করেন।[৩৮]

১৯৪৪ সালে তালা উপজেলার কুমিরা গ্রামে এই গ্রামের লেবার পার্টির নেত্রী সুধা রায়ের সভাপতিত্বে সমাবেশ হয়।[৩৯] এর আগে ১৯৪৩ সালের শেষভাগে রাড়ুলির আর,কে,বি,কে হরিশচন্দ্র ইনস্টিটিউশনের মাঠে সাতক্ষীরা মহকুমা কৃষক সম্মেলনের অধিবেশন হয়। এ সময় বঙ্গীয় প্রাদেশিক কৃষক সভা থেকে শ্লোগান ওঠে "নিজ মজুরকে সামনে নাও, জমিদারকে রুখে দাও, তেভাগার দাবী কায়েম কর, পনের বিঘার কমে খাজনা নাই সমিতির বাইরে কৃষক নাই ও লাল ঝান্ডার বাইরে গ্রাম নাই"।[৪০]

তেভাগা আন্দোলন সম্পর্কে সাতক্ষীরার মহকুমা প্রশাসক সরকারের কাছে রিপোর্ট দেন, "তেভাগা আন্দোলনের বিষয়টিকে আইন করে শান্ত করা না গেলে সঙ্গত কারণেই আগামী মওসুমে এই আন্দোলন এক বড় আকারে ও অনেক ব্যাপকতা নিয়ে বিপজ্জনক পরিস্থিতি সৃষ্টি করতে পারে।[৪১] তেভাগা আন্দোলন শুরু হওয়ার কয়েক মাস পূর্বে ১৯৪৬ সালের (২১-২৪) মে খুলনা জেলার ফকিরহাটের মৌভোগ গ্রামে বঙ্গীয় কৃষক সভার নবম সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়।[৪২] ইতোমধ্যে সাতক্ষীরার তালা উপজেলার কাশিপুর, পাটকেলঘাটা ও ডুমুরিয়া উপজেলার চুকনগর ও শোভনা অঞ্চলে ব্যাপক কৃষক আন্দোলন গড়ে ওঠে নদীর বাঁধ বাঁধা,

---

[৩৪] মোল্লা আমীর হোসেন, প্রাগুক্ত- পৃষ্ঠা ঃ ৪৩।
[৩৫] মোঃ আবুল হোসেন, প্রাগুক্ত- পৃষ্ঠা ঃ ১১৮।
[৩৬] আরও দেখবেন, মোঃ আবুল হোসেন, প্রাগুক্ত- পৃষ্ঠা ঃ ১০৯।
[৩৭] মোঃ আবুল হোসেন, প্রাগুক্ত- পৃষ্ঠা ঃ ১১৯।
[৩৮] ঐ।
[৩৯] শেখ শাহাদাত হোসেন বাচ্চু, *আচার্য আমার*, খুলনা, ২০০২, পৃষ্ঠা ঃ ২৪০-২৭২।
[৪০] শ্রী জয়ন্ত কুমার ঘোষ, *জীবন স্মৃতি বিজ্ঞানী আচার্য প্রফুল্ল চন্দ্র রায়,* কপোতাক্ষ প্রকাশনী, ঢাকা, ২০০২, পৃষ্ঠা ঃ ১১।
[৪১] মোঃ আবুল হোসেন, প্রাগুক্ত- পৃষ্ঠা ঃ ১১৮।
[৪২] অজিত কুমার নাগ, প্রাগুক্ত- পৃষ্ঠা ঃ ২৪।

Dhaka University Institutional Repository

হাটতোলা প্রভৃতি দাবীকে কেন্দ্র করে।[৪৩] এই আন্দোলনের মূল নেতৃত্বে ছিলেন কুমার মিত্র, অংকুর ঘোষ, কাশিপুর গ্রামের সাজ্জাদ শেখ, কোবাদ আলী শেখ, সামাদ শেখ, বিলায়েত শেখ প্রমুখ।

পাকিস্তানী শাসন আমল

১৯৩৭ সালে মুসলিম লীগের সভাপতি মুহাম্মদ আলী জিন্নাহ উর্দুকে দলের দাপ্তরিক ভাষা হিসেবে প্রবর্তনের উদ্যোগ নিলে এ.কে. ফজলুল হক এর বিরোধিতায় তা সফল হয়নি।[৪৪] ১৯৪০ সালে লাহোর প্রস্তাবের প্রাক্কালে এ নিয়ে মৃদু দ্বন্দ্ব দেখা দেয়। ১৯৪৭ সালে জুন মাসে বাংলার সীমানা নির্ধারনের জন্য গঠিত কমিশন মুসলিম লীগ ও কংগ্রেসের সঙ্গে আলোচনার পর তৎকালীন খুলনা জেলাকে পূর্ব পাকিস্তানের অন্তর্ভূক্ত করা হয়। খুলনায় মুসলিম জনসংখ্যা ৪৯.৩৬%।[৪৫] ১৯৪৭ সালে ভারত বিভক্তির পর পশ্চিম বাংলা স্বায়ত্তশাসনের অধিকার প্রাপ্ত হয় এবং পাকিস্তানের অন্তর্ভূক্ত পূর্ব বাংলা স্বায়ত্তশাসন থেকে পুরোপুরি বঞ্চিত হয়।[৪৬] ফলে যে ঔপনিবেশিক শাসন থেকে ভারতীয় উপমহাদেশের বেশির ভাগ অঞ্চল মুক্ত হলেও পূর্ব বাংলায় তা বহাল থাকে এবং পূর্ব বাংলার মুসলমানদের পাকিস্তান মোহ দুর হতে থাকে। এ আমলেই বাঙালিরা জাতীয়তাবাদী চেতনায় উদ্বুদ্ধ হতে থাকে এবং গড়ে তোলে স্বাধীনতা আন্দোলন। ১৯৪৭ সালে পাকিস্তান রাষ্ট্রের রাজধানী স্থাপিত হয় করাচি শহরে যা পূর্ব বাংলা থেকে প্রায় ১২০০ মাইল দুরে অবস্থিত এবং পাকিস্তানের প্রথম প্রধানমন্ত্রী হন লিয়াকত আলী খান।[৪৭] এমনকি পূর্ব বাংলার গভর্নর হন একজন অবাঙালি এবং পাকিস্তান সামরিক বাহিনী, সিভিল সার্ভিসসহ পূর্ব বাংলা সরকারের উচ্চ পদস্থ আমলারাও হন অবাঙালি মুসলমান। ব্রিটিশ শাসন আমলে পূর্ব বাংলার বেশির ভাগ জমিদার, আইনজীবী, শিক্ষক এবং ব্যাংকার ছিল বর্ণহিন্দুরা।[৪৮] দেশ বিভাগের পর এই পেশাজীবী শ্রেণীর ভারতে চলে যায় এবং ভারত থেকে পাঞ্জাবী এবং উর্দুভাষী মুসলিম এলিটগণের একটি বিরাট অংশ পূর্ব বাংলায় চলে আসে এবং বর্ণহিন্দুদের পূর্বের যে আধিপত্য ছিল সে স্থান দখল করে নেয়।[৪৯]

১৯৪৭ সালে পাকিস্তানে যে সেনাবাহিনী গঠিত হয় তার বেশীর ভাগই ছিল পাঞ্জাবী, বেলুচ, পাঠানদের নিয়ে।[৫০] যে সমস্ত সামরিক বেসামরিক উর্ধ্বতন কর্মকর্তাগণ ভারত থেকে পূর্ব বাংলায় আসে তারা

---

[৪৩] ঐ।

[৪৪] সৈয়দ আনোয়ার হোসেন *'বাঙালি জাতীয়তাবাদের রাজনৈতিক ভিত্তি'* সিরাজুল ইসলাম (সম্পাদিত), *বাংলাদেশের ইতিহাস (১৭০৪-১৯৭১),* এশিয়াটিক সোসাইটি অব বাংলাদেশ, ঢাকা, ১৯৯৩, পৃষ্ঠা ঃ ৫৪৯।

[৪৫] মোঃ আবুল হোসেন, প্রাগুক্ত- পৃষ্ঠা ঃ ১২৫।

[৪৬] সালাহ্ উদ্দিন আহমেদ ও অন্যান্য (সম্পাদিত), *বাংলাদেশ মুক্তিসংগ্রামের ইতিহাস (১৯৪৭-১৯৭১),* আগামী প্রকাশনী, ঢাকা, ২০০২, পৃষ্ঠা ঃ ২৫।

[৪৭] রবীন্দ্রনাথ ত্রিবেদী (সম্পাদিত), *বাংলাদেশের ঐতিহাসিক সংগ্রাম ও মুক্তিযুদ্ধ।*

[৪৮] সের্গেই স্তেপানোভিচ বারানভ, *পূর্ব বাংলা ও অর্থনৈতিক উন্নয়নের বৈশিষ্ট্য ১৯৪৭-১৯৭১,* ড. তাজুল ইসলাম ও অন্যান্য (অনুদিত), জাতীয় সাহিত্য প্রকাশনী, ঢাকা, ১৯৮৬, পৃষ্ঠা ঃ ১৭।

[৪৯] ঐ।

[৫০] ড. মাহবুবর রহমান, *বাংলাদেশের ইতিহাস ১৯৪৭-১৯৭১,* সময় প্রকাশন, ঢাকা, ১৯৯৯, পৃষ্ঠা ঃ ৩৫।

Dhaka University Institutional Repository

পশ্চিম পাকিস্তানী শোষক গোষ্ঠীর স্বার্থের সাথেই একাত্মতা প্রকাশ করে। সকল সরকারি প্রতিষ্ঠানের সদর দপ্তর স্থাপিত হয় করাচীতে এবং এ সকল প্রতিষ্ঠানের সর্বোচ্চ কর্তা ব্যক্তি হন পশ্চিম পাকিস্তানী। প্রকৃত পক্ষে পাকিস্তান পাঞ্জাবীদের রাষ্ট্রে পরিণত হয়। সেখানে বাঙালিদের কোন কার্যকর অংশগ্রহণ ছিল না। পাকিস্তানের মোট জনসংখ্যা ৫৪ শতাংশ বাঙালি হলেও মাত্র ৩ শতাংশ উর্দু জনগোষ্ঠীর ঔপনিবেশিক শাসনের শিকার হন।[৫১]

মুসলিম লীগ প্রধান মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ পাকিস্তানের গভর্নর জেনারেলের পদ লাভ করেন। তিনি ১৯৩৫ সালের ভারত শাসন আইন সংশোধন করে উন্নয়ন বন্টন নীতিমালায় হস্তক্ষেপ করেন।[৫২]

১৯৪৭ সালে পূর্বের যে বন্টন নীতিমালা ছিল তা অগ্রাহ্য করে প্রদেশের সকল আয় এমনকি বিক্রয় পর্যন্ত প্রদেশের পরিবর্তে কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে জমা করতে থাকে।[৫৩] পাট রফতানির সমস্ত অর্থ কেন্দ্রীয় সরকার হস্তগত করতে থাকে। দুই প্রদেশের অর্থনৈতিক বৈষম্য আঞ্চলিক নিয়ন্ত্রণের মাধ্যমে পূর্বাঞ্চলকে ঠেকাতে থাকে। পাঞ্জাব কেন্দ্রীক বড় পুজিপতি গোষ্ঠীর স্বার্থকে রক্ষা করতে গিয়ে শাসক চক্র হাজার মাইলের ভৌগোলিক ব্যবধানে অবস্থিত পূর্ব বাংলার জন সাধারণের আত্ম নিয়ন্ত্রণাধিকারে আঘাত হানে। ১৯৭০ সালে পূর্ব বাংলার জন সংখ্যা ছিল প্রায় ৭০ মিলিয়ন এবং পশ্চিম পাকিস্তানের জন সংখ্যা ছিল ৬০ মিলিয়ন।[৫৪]

পূর্ব বাংলার আয়তন ছিল ৫৪৫০১ বর্গমাইল এবং পশ্চিম পাকিস্তানের আয়তন ছিল ৩১০২৩৬ বর্গমাইল।[৫৫] প্রথম ৩টি পঞ্চ-বার্ষিক পরিকল্পনায় পূর্ব বাংলা এবং পশ্চিম পাকিস্তানের মধ্যে যে বৈষম্য ছিল তা নিম্নরূপঃ

পঞ্চ-বার্ষিক পরিকল্পনা	**পূর্ব বাংলায় বরাদ্দ**	**পশ্চিম পাকিস্তানের বরাদ্দ**
প্রথম	৩২%	৬৮%
দ্বিতীয়	৩২%	৬৮%
তৃতীয়	৩৬%	৬৪%

মাত্রাতিরিক্ত অর্থনৈতিক শোষণের শিকার হন পূর্ব বাংলার লক্ষ লক্ষ মানুষ। ১৯৪৮ সালে পূর্ব বাংলায় এক ভয়াবহ দুর্ভিক্ষের সৃষ্টি হয়।

---

[৫১] ঐ, পৃষ্ঠা ঃ ৮৬।
[৫২] মোল্লা আমীর হোসেন, প্রাগুক্ত- পৃষ্ঠা ঃ ৪৭।
[৫৩] ঐ।
[৫৪] মেসবাহ কামাল, *বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধে বামপন্থীদের ভূমিকা,* গণ প্রকাশনী ও সমাজ চেতনা পাবলিশার্স, ঢাকা, ২০০১, পৃষ্ঠা ঃ ৯৩।
[৫৫] ঐ।

Dhaka University Institutional Repository

১৯৪৮ সালের ১৮ আগস্ট ঈদের দিন র‍্যাডক্লিপ রোয়েদাদের রায়ে সমগ্র খুলনা পাকিস্তানের অন্তর্ভূক্ত হয়।[৫৬] সাতক্ষীরা অঞ্চলের বর্ণহিন্দু, জমিদার, ব্যবসায়ীগণ রাতারাতি ভারতে পাড়ি জমাতে থাকে। পাশাপাশি ভারত থেকে অবাঙালি মুসলমানরা পূর্ব বাংলায় আসে এবং পাকিস্তানের প্রতি আনুগত্য প্রদর্শন করে এবং নাগরিকত্ব গ্রহণ করতে থাকে। পশ্চিম বাংলার হুগলি, দক্ষিণ চব্বিশ পরগনা প্রভৃতি এলাকা থেকে একটা বিরাট মুসলিম জনগোষ্ঠী সাতক্ষীরা শহর এবং এর পার্শ্ববর্তী এলাকায় বসতি স্থাপন করতে থাকে। এদের একটা বড় অংশ উর্দু ভাষাকে রাষ্ট্রভাষা করার ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হয়। যারা ১৯৭১ সালে সংঘটিত যুদ্ধে পাকিস্তানী বাহিনীর সাথে একাত্মতা ঘোষণা করে। এরা সাতক্ষীরা অঞ্চলের বিভিন্ন সময়ে দাঙ্গার সৃষ্টি করে।[৫৭]

১৯৪৮ সালের ভাষা আন্দোলনে সাতক্ষীরা

১৯৪৮ সালের ১১ মার্চ মাসে বাংলা ভাষাকে রাষ্ট্রভাষার দাবীতে সর্ব দলীয় ছাত্র সংগ্রাম পরিষদ ঢাকায় ধর্মঘট পালন করে।[৫৮] আন্দোলন যাতে সফল না হয় সে জন্য ১০ মার্চ খুলনা থেকে অনেক ছাত্র নেতাকে গ্রেফতার করা হয়। গ্রেফতারকৃতদের মধ্যে সাতক্ষীরা মহকুমার আশাশুনি উপজেলার বুধহাটা গ্রামের বিপ্লবী আনোয়ার হোসেন, তালা উপজেলার খলিশখালী গ্রামের বিপ্লবী স্বদেশ বসু, সৈয়দ কামাল বখত প্রমুখ।[৫৯] আন্দোলনে যারা বিশেষ ভূমিকা পালন করেন তাদের মধ্যে আব্দুল হামিদ, মমিন উদ্দীন আহমদ, আব্দুর রউফ, এস.এস.এ জলিল, তাহমিদ উদ্দীন, জিল্লুর রহমান, আবু মোহাম্মদ ফেরদৌস, সৈয়দ কামাল বখত। এছাড়া তালার ইসলামকাঠি গ্রামের তুষার মজুমদার পুলিশি নির্যাতনের শিকার হন।[৬০]

সাতক্ষীরায় ১৯৫২ সালের ভাষা আন্দোলন

১৯৫২ সালে সাতক্ষীরা গালর্স স্কুলের ছাত্রী গুলআরা খান ও সুলতানা চৌধুরীর নেতৃত্বে মহিলা কর্মী বাহিনী গড়ে ওঠে।[৬১] ২২ ফেব্রুয়ারী ১৯৫২ সাতক্ষীরা শহরের রাস্তায় যে প্রথম ছাত্র জনতা মিছিল বের করেছিল তাতে মেয়েদের যোগদানের ঘটনা এটাই প্রথম। ২৩ ফেব্রুয়ারী ১৯৫২ সাতক্ষীরার গুড়পুকুর পাড়ে আমবাগান চত্বরে এক জনসভা অনুষ্ঠিত হয়। এ জনসভায় ঢাকা মেডিকেল কলেজ থেকে চাক্ষুষ অভিজ্ঞতা নিয়ে বাড়ি ফেরত আসা ডাঃ শামসুর রহমানের বক্তৃতা শোনার পর ছাত্র জনতা উত্তাল হয়ে ওঠে।[৬২] উল্লেখ্য, পৃথিবীর ইতিহাসে ভাষা প্রতিষ্ঠার আন্দোলনে জীবন উৎসর্গের মতো মহান ঘটনা ঢাকা শহরে সংগঠিত হওয়ার

---

[৫৬] মোল্লা আমীর হোসেন, প্রাগুক্ত- পৃষ্ঠা ঃ ৪৮।
[৫৭] ঐ।
[৫৮] বদরুদ্দীন উমর, ***ভাষা আন্দোলন প্রসঙ্গঃ কতিপয় দলিল, প্রথম খন্ড***, বাংলা একডেমী, ঢাকা, ১৯৯৫, পৃষ্ঠা ঃ ৩০।
[৫৯] মোঃ আবুল হোসেন, প্রাগুক্ত- পৃষ্ঠা ঃ ১২৬।
[৬০] ঐ।
[৬১] ঐ।
[৬২] ঐ।

Dhaka University Institutional Repository

পর মজলুম জননেতা মওলানা আব্দুল হামিদ খান ভাসানী দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চল পর্যন্ত জনমত গঠন শুরু করেন। দেশের মানুষকে আরও সচেতন ও সংগঠিত করার প্রত্যয়ে এ জনসভা সাতক্ষীরাতেও অনুষ্ঠিত হয়েছিল।[৬৩]

১৯৫২ সালের মার্চে জননেতা আব্দুল হামিদ খান ভাসানী সাতক্ষীরাতে আসেন।[৬৪] তখন যশোর থেকে সাতক্ষীরা সদরের উত্তরে কলারোয়া উপজেলা পর্যন্ত সারা দিনে দুই একটি বাস চলাচল করতো। আর কলারোয়া থেকে সাতক্ষীরা শহর পর্যন্ত এই গোটা রাস্তায় চলত গরুর গাড়ী। মওলানা আব্দুল হামিদ খান ভাসানী কলারোয়া থেকে গরুর গাড়ীতে চড়ে সাতক্ষীরায় আসেন এবং গুড়পুকুরের বটতলায় জনসভা করেন।[৬৫] এ সময়ে সাতক্ষীরার জনগণকে বাংলা ভাষা প্রতিষ্ঠার আন্দোলনে সক্রিয়ভাবে এগিয়ে আসার আহবান জানিয়ে এক ধরনের জাগরণী গান রচনা করা হয়। গলায় হারমনিয়াম ঝুলিয়ে রাস্তায় রাস্তায় গান গেয়ে বেড়ানো হতো। এ কাজের নেতৃত্বে দিতেন সুশোভন আনোয়ার আলী (সাহিত্যিক ওয়াজ্জেদ আলীর পুত্র)।[৬৬] এ সকল কাজে যাঁরা অগ্রণী ভূমিকা পালন করেন তাঁদের মধ্যে অন্যতম রবিনের চাচা খোকন, রসুলপুরের শহীদুল্লাহ খানসহ আরও অনেকে। সাতক্ষীরা পৌরসভায় কুখরালি গ্রামের শেখ লুৎফর রহমান ভাষা আন্দোলনের সময় গণসঙ্গীত শিল্পী ছিলেন।[৬৭] যিনি পরবর্তীতে ঢাকা নজরুল একাডেমীর অধ্যক্ষ হন।

১৯৪৮ সালের ১৯ মার্চ ঢাকার রেসকোর্স ময়দানের একজন সভায় সম্পূর্ণ অগণতান্ত্রিক ভাবে সংখ্যাগরিষ্ঠের ভাষা বাংলাকে বাদ দিয়ে উর্দুকে রাষ্ট্রভাষা করার ঘোষণা করেন তিনি বলেন "Let me make it very clear to you that the state language of Pakistan is going to be Urdu and no other Language".[68]

উপর্যুক্ত উক্তির বিরুদ্ধে শেখ লুৎফর রহমান তার বন্ধু আনিসুল হক চৌধুরীকে দিয়ে লিখিয়ে নেন একটি নতুন গান। ওরে ভাইরে ভাই বাংলাদেশে বাঙালি আর নাই।[৬৯]

---

[৬৩] ঐ।
[৬৪] ঐ, পৃষ্ঠা ঃ ১২৬।
[৬৫] ঐ।
[৬৬] ঐ, পৃষ্ঠা ঃ ১২৮।
[৬৭] ঐ।
[৬৮] বদরুদ্দীন উমর, প্রাগুক্ত- পৃষ্ঠা ঃ ৩৫
[৬৯] মোঃ আবুল হোসেন, প্রাগুক্ত- পৃষ্ঠা ঃ ১২৮

Dhaka University Institutional Repository

১৯৫১ সালে ভাষার ভিত্তিতে পাকিস্তানের অধিবাসীদের শতকরা হারঃ[৭০]

বাংলা ভাষার লোক সংখ্যা	=	৫৬.৪০%
পাঞ্জাবী ভাষার লোক সংখ্যা	=	২৮.৫৫%
পশতু ভাষার লোক সংখ্যা	=	৩.৪৮%
সিন্ধি ভাষার লোক সংখ্যা	=	৫.৪৭%
উর্দু ভাষার লোক সংখ্যা	=	৩.২৭%
বেলুচি ভাষার লোক সংখ্যা	=	১.২৯%
ইংরেজী ভাষার লোক সংখ্যা	=	০.০২%
অন্যান্য ভাষার লোক সংখ্যা	=	১০.৫২%
মোট	=	১০০%

জানা যায়, দেবহাটা উপজেলার ধোপাডাঙ্গা গ্রামের বামপন্থী নেতা লুৎফর রহমান ভাষা আন্দোলনের অন্যতম সৈনিক ছিলেন।[৭১] চলমান আন্দোলনের মধ্য দিয়ে বাংলাভাষা পাকিস্তানের অন্যতম প্রাদেশিক ভাষা হিসেবে সাংবিধানিক স্বীকৃতি পায় ১৯৫৬ সালের ২৯ ফেব্রুয়ারী।[৭২] ১৯৫২ সালের ভাষা আন্দোলন বাঙালির ভাষা, সংস্কৃতি, অর্থনীতি, রাজনীতি এবং সর্বপরি মুক্তিলাভের প্রত্যয়।

১৯৫৪ সালের নির্বাচন, ১৯৬২ সালের শিক্ষা আন্দোলন, ১৯৬৬ সালে স্বায়ত্তশাসনের দাবী, ১৯৬৮-৬৯ এর গণ অভ্যুত্থানের মধ্য দিয়ে অবশেষে ১৯৭০ সালের নির্বাচনে আওয়ামী লীগ সংখ্যা গরিষ্ঠতা লাভ করে।

সাতক্ষীরায় শহীদ মিনার প্রতিষ্ঠার ইতিহাস

সাতক্ষীরায় ভাষা আন্দোলনের অন্যতম আর একটি কীর্তি হল শহীদদের স্মৃতির উদ্দেশ্যে নির্মিত শহীদ মিনার। সাতক্ষীরা শহরে প্রথম শহীদ মিনার নির্মিত হয় ১৯৬২ সালে।[৭৩] সাতক্ষীরা কলেজে, পি এন স্কুলের মাঠে শহীদ মিনার নির্মাণ করা হয়েছিল। এ,কে এম কামাল উদ্দীন ওরফে কাজী কামাল ছট্টু, মোর্তাজুল হক, রফিকুজ্জামান রবি, সাইফুল্লাহ লস্কর, এ্যাডভোকেট শামসুল হকের ভাই শহিদুল্লাহ, মোনাসেফ খান, এমদাদ হোসেন খান, ওলিউর রহমান খান, ফজলুর রহমান, প্রমুখ মিলে সাতক্ষীরায় প্রথম শহীদ মিনার গড়ে

[৭০] ড. মাহবুবর রহমান, প্রাগুক্ত- পৃষ্ঠা ঃ ৮৬।
[৭১] মোঃ আবুল হোসেন, প্রাগুক্ত- পৃষ্ঠা ঃ ১২১
[৭২] ঐ, পৃষ্ঠা ঃ ১২৩।
[৭৩] ঐ, পৃষ্ঠা ঃ ১৩১।

Dhaka University Institutional Repository

তোলেন।[৭৪] কিন্তু সেই শহীদ মিনারের স্থায়ীত্ব বেশীক্ষণ হয়নি। শহীদ মিনার নির্মাণ কাজ শেষ হওয়া অল্পক্ষণের মধ্যেই প্রতিপক্ষরা তা ভেঙ্গে দিত। রাত ৮টা থেকে ৯টার দিকে শুরু করে রাত ২টা থেকে ৩টার মধ্যে নির্মাণ কাজ শেষ করা হতো। শহীদ মিনার নির্মাণ করে ছাত্ররা বাড়ির দিকে রওনা হলেই কলেজ কর্তৃপক্ষ ও ঘ.ঝ.ঋ এর ছেলেরা মিলিত ভাবে শহীদ মিনার ভেঙ্গে ফেলতো। শহীদ মিনার ভাঙ্গার জন্য তাদের সার্বিকভাবে সহযোগিতা করতো মুসলিম লীগের আব্দুল গফুর (এম.এন.এ), আব্দুল বারী খান, আতিয়ার রহমান, মোজাহার আলী (প্রাক্তন পৌর চেয়ারম্যান), শেখ রমজান আলী প্রমুখ ব্যক্তিরা।[৭৫] ১৯৬২ সাল থেকে ১৯৬৫ সাল পর্যন্ত প্রতিবছরই শহীদ মিনার ভাঙ্গা গড়ার প্রক্রিয়া চলে। ১৯৬৬ সালে অদম্য উৎসাহে রাজার বাগান কলেজে আবার শহীদ মিনার নির্মাণ করা হয়।[৭৬] ফেরাজতুল্লাহ ও আনিস নামের দু'জন ছাত্র এ কাজে নেতৃত্বে প্রদান করে।[৭৭] বামপ্রগতিশীল চিন্তাদর্শের অনুসারী দুজন শিক্ষক আব্দুর রফিক ও রাষ্ট্র বিজ্ঞানের সোহরাব হোসেন গোপনে তাদের নানাভাবে সহযোগিতা করতেন। ১৯৬৭ সালে পি.এন হাই স্কুল (সাতক্ষীরার প্রথম স্কুল) ভাষা শহীদ মিনার নির্মিত হয়।[৭৮] ১৯৬৯-৭০ সালের কোন এক সময় কামরুল ইসলাম খানের নেতৃত্বে বর্তমান পাবলিক লাইব্রেরী সংলগ্নে একটি শহীদ মিনার গড়ে তোলা হয়।[৭৯]

১৯৭০ সালের নির্বাচন

১৯৬৯ সালের গণ অভ্যুত্থানে আইয়ুব খানের পতনের পর জেনারেল ইয়াহিয়া খান ক্ষমতা দখল করেন এবং জাতির উদ্দেশ্যে এক ভাষণে গণতন্ত্র ফিরিয়ে দিয়ে তিনি জনগণের নির্বাচিত প্রতিনিধিদের হাতে ক্ষমতা হস্তান্তরের প্রতিশ্রুতি দেন।[৮০] আওয়ামী লীগের দাবীর প্রেক্ষিতে ২৮ নভেম্বর তিনি ঘোষণা করেন যে, আগামী ১৯৭০ সালের ৫ অক্টোবর সার্বজনীন প্রত্যক্ষ ভোটে জন সংখ্যার ভিত্তিতে গণপরিষদ গঠিত হবে।[৮১] ১৯৭০ সালের ১ জানুয়ারী থেকে দেশে রাজনৈতিক কার্য কলাপের উপর বিধি নিষেধ প্রত্যাহার করে নেন। এদিকে পূর্ব পাকিস্তানে ভয়াবহ বন্যা দেখা দিলে ৫ অক্টোবরের পরিবর্তে সরকার জাতীয় পরিষদের নির্বাচনের তারিখ ৭ ডিসেম্বর এবং প্রাদেশিক পরিষদের নির্বাচনের তারিখ ১৭ ডিসেম্বর স্থির করেন।[৮২] সেই মোতাবেক বহুদিনের প্রতীক্ষিত পাকিস্তানের সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। আওয়ামী লীগ ৬ দফার ভিত্তিতে নির্বাচনে

[৭৪] ঐ, পৃষ্ঠা ঃ ১৩২।
[৭৫] ঐ, পৃষ্ঠা ঃ ১৩৩।
[৭৬] ঐ, পৃষ্ঠা ঃ ১৩৪।
[৭৭] ঐ।
[৭৮] শেখ রেজাউল করিম সম্পাদিত কে.এম.এস.সি ইনস্টিটিউশন এর শতবর্ষ পূর্তি অনুষ্ঠান-২০০০ এর স্মরণিকা, তালা, সাতক্ষীরা, পৃষ্ঠা ঃ ২০।
[৭৯] আবুল হোসেন, প্রাগুক্ত- পৃষ্ঠা ঃ ১৩৩।
[৮০] মেসবাহ কামাল, প্রাগুক্ত- পৃষ্ঠা ঃ ৯৪।
[৮১] ড. কালাম হোসেন, ***স্বায়ত্ব শাসন থেকে স্বাধীনতা,*** অঙ্কুর প্রকাশনী, ঢাকা, ১৯৯৪, পৃষ্ঠা ঃ ৪৩-৪৭।
[৮২] ঐ, পৃষ্ঠা ঃ ৪৮।

Dhaka University Institutional Repository

অংশ গ্রহণ করে। নির্বাচনকে কেন্দ্র করে আওয়ামী লীগ স্বায়ত্বশাসন ও স্বাধিকারের ভিত্তিতে ব্যাপক নির্বাচনী প্রচারনা ও সভা শুরু করে। স্বাধিকার স্বাধীনতা চেতনায় বাঙালি জাতি আওয়ামী লীগের নৌকা প্রতীকে ভোট দিয়ে পূর্ব পাকিস্তানের জাতীয় পরিষদের ১৬২টি আসনের মধ্যে (সংরক্ষিত মহিলা আসন বাদে) ৬০টি এবং প্রাদেশিক পরিষদের ৩০০টি আসনের মধ্যে ২৮৮টি আসনে বিজয়ী করে।[৮৩]

প্রাদেশিক পরিষদ নির্বাচনে সাতক্ষীরায় ৫টি আসন থেকে আওয়ামীলীগ প্রার্থীরা জয়লাভ করে।[৮৪] বিজয়ী প্রার্থীরা হলেন মমতাজ আহমেদ (বোয়ালিয়া, কলারোয়া), স.ম আলাউদ্দীন (মিঠাবাড়ী, তালা), পীর জাদা আবু সাঈদ (গুণাকরকাটি, আশাশুনি), খায়রুল আনাম (মাঘুরালি, কালিগঞ্জ) এবং এস.এম ফজলুল হক (গুমানতলী, শ্যামনগর)। আর জাতীয় পরিষদের ৩টি আসনে আওয়ামীলীগ প্রার্থী সৈয়দ কামাল বখত সাকী (তেঁতুলিয়া, তালা), সাতক্ষীরা সদর, কলারোয়া, দেবহাটা, এ্যাডভোকেট আব্দুল গফফার (রাধানগর, সাতক্ষীরা পৌরসভা), শ্যামনগর, আশাশুনি, কালীগঞ্জ এলাকা থেকে এবং সালাহ উদ্দিন, ইউসুফ (ধোপাখোলা, ফুলতলা, খুলনা) তালা, ফুলতলা, ডুমুরিয়া এলাকা থেকে জয় লাভ করেন।[৮৫]

১৯৭০ সালের নির্বাচনে বিজয়ী দলের কাছে রাজনৈতিক ক্ষমতা হস্তান্তর না করে পাকিস্তানী শাসকগোষ্ঠী ষড়যন্ত্র করতে থাকে। অন্যদিকে সুদীর্ঘ আন্দোলন সংগ্রামের পথ পাড়ি দিয়ে তারা স্বাধিকারের অপেক্ষায় প্রহর গুণতে থাকে। ৭ মার্চ ১৯৭১ বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান তাঁর ঐতিহাসিক ভাষণে বাঙালিদের শত্রুর মোকাবেলা করার জন্য প্রস্তুতি নিতে বলেন।[৮৬] বিভিন্ন বামপন্থী রাজনৈতিক দল গেরিলা বাহিনী গড়ে তুলতে থাকে এবং তাদের প্রশিক্ষণ প্রদান করতে থাকে।[৮৭] সাতক্ষীরার মানুষও এ ধারার বাইরে ছিল না। এরই ধারাবাহিকতায় প্রথমে প্রতিরোধ এবং পরে সশস্ত্র মুক্তিযুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়ে।[৮৮]

উপসংহারঃ

উপর্যুক্ত আলোচনায় লক্ষ্য করা যায় যে সাতক্ষীরা অঞ্চলের মানুষ শোষণ এবং নির্যাতনের বিরুদ্ধে প্রাচীন কাল থেকে আন্দোলন করে আসছে। রাজা প্রত্নপাদিত্যের মোগল বাহিনীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ, স্যার প্রফুল্ল চন্দ্র রায়ের ব্রিটিশদের বিরুদ্ধে স্বদেশী আন্দোলন এ অঞ্চলের মানুষের গৌরবের ইতিহাস। ১৯৭০ সালের জাতীয় নির্বাচনের পর শুরু হয় মুক্তিযুদ্ধের প্রাথমিক প্রস্তুতি।

---

[৮৩] ঐ, পৃষ্ঠা ঃ ৪৫।
[৮৪] আবুল হোসেন, প্রাগুক্ত- পৃষ্ঠা ঃ ১৪৪।
[৮৫] ঐ।
[৮৬] হাসান হাফিজুর রহমান সম্পাদিত, ***বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধঃ দলিলপত্র, ১ম খন্ড,*** তথ্য মন্ত্রণালয়, ঢাকা, ১৯৮৬, পৃষ্ঠা ঃ ৩০।
[৮৭] হায়দার আকবর খান রনো, ***স্বাধীনতা যুদ্ধ ও বামপন্থীদের ভূমিকা***, সম্পাদনা মেসবাহ কামাল, প্রাগুক্ত- পৃষ্ঠা ঃ ১৮৫-১৮৮।
[৮৮] ঐ।

Dhaka University Institutional Repository

দ্বিতীয় অধ্যায়

প্রাথমিক প্রস্তুতি ও প্রতিরোধ

ভূমিকাঃ

পাকিস্তানকে টিকিয়ে রাখার জন্য পাকিস্তানী সামরিক সরকার বাঙ্গালীদে দিয়ে বিভিন্ন এলাকায় গঠন করেন রাজাকার বাহিনী, শান্তি কমিটি, আল বদর বাহিনী, আল শামস বাহিনী, । এ সকল বাঙ্গালীরা হত্যা, ধর্ষণ, লুট এবং অগ্নিসংযোগ করতে থাকে । তাদের প্রতিরোধের জন্য গঠিত হয় মুজিব বাহিনী, গেরিলা বাহিনী স্বাধীন বাংলা ছাত্র সংগ্রাম পরিষদ ইত্যাদি ।

"গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা ও গোটা পাকিস্তান ব্যাপী সাধারণ নির্বাচনের দাবী উঠলে জেনারেল ইয়াহিয়া ৭ ডিসেম্বর ১৯৭০ জাতীয় পরিষদের এবং ১৭ ডিসেম্বর প্রাদেশিক পরিষদের নির্বাচনের ঘোষণা দেন ।"

১৯৭০ সালের নির্বাচনে আওয়ামী লীগের নিরঙ্কুশ সংখ্যা গরিষ্ঠতা অর্জনের পর যখন পশ্চিম পাকিস্তানী শাসক গোষ্ঠী শাসন ক্ষমতা হস্তান্তর না করে তখনই শুরু হয় মুক্তি সংগ্রাম ।[৮৯] কারণ নির্বাচনে জনগণ তাদের প্রত্যাখ্যান করে আর এই ফলাফল শাসক শ্রেণী মেনে না নিয়ে নির্বাচন বানচালের ষড়যন্ত্র করতে থাকে । শেখ মুজিবুর রহমান অবিসংবাদিত নেতা হিসেবে বিশ্বের দরবারে আত্মপ্রকাশ করেন । কিন্তু ষড়যন্ত্র চলতেই থাকে, বাঙালীরা যাতে পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী না হতে পারে এবং ৬ দফা যাতে বাস্তবায়িত না হয় এবং কিভাবে ক্ষমতা কুক্ষিগত করে রাখা যায় ।[৯০]

"একাত্তরের স্বাধীনতা যুদ্ধে অন্যান্য রাজনৈতিক শক্তি বিশেষত কমিউনিস্ট ও বামপন্থী দলগুলো গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিল । স্বাধীনতা ও মুক্তির লড়াইকে এগিয়ে নেবার ক্ষেত্রে মওলানা আব্দুল হামিদ খান ভাসানী, মনি সিংহ, অধ্যাপক মোজাফফর আহমেদ, সিরাজ শিকদার, কর্নেল আবু তাহের সহ অন্যান্য বামপন্থী নেতৃবৃন্দ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে ।"[৯১]

ভুট্টো ইয়াহিয়া ষড়যন্ত্র

পাকিস্তান পিপলস পার্টির নেতা জুলফিকার আলী ভুট্টো এবং ইয়াহিয়া খান ক্ষমতা কুক্ষিগত করে রাখতে সচেষ্ট হন এবং 'অপেক্ষা কর ও দেখ' নীতি অবলম্বন করলেন ।[৯২] ১৯৬৯ সালের ২৮ নভেম্বর তিনি

---

[৮৯] স.ম. বাবর আলী, ***স্বাধীনতার দুর্জয় অভিযান,*** সাঁকোবাড়ি প্রকাশন, ২০১০, পৃষ্ঠা ঃ ২১।
[৯০] মেসবাহ কামাল, সম্পাদিত, ***বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধে বামপন্থীদের ভূমিকা,*** গণ প্রকাশনী ও সমাজ চেতনা পাবলিশার্স, ঢাকা, ২০০১, পৃষ্ঠা ঃ ২।
[৯১] মুনতাসীর মামুন, ***পরাজিত পাকিস্তানী জেনারেলদের দৃষ্টিতে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ,*** সময় প্রকাশনী, ঢাকা, ১৯৯৯, পৃষ্ঠা ঃ ১৩৪।
[৯২] ড. কামাল হোসেন, ***স্বায়ত্তশাসন থেকে স্বাধীনতা, ১৯৬৬-১৯৭১,*** অঙ্কুর প্রকাশনী, ঢাকা, ১৯৯৪, পৃষ্ঠা ঃ ৪৩।

Dhaka University Institutional Repository

ঘোষণা করলেন" আইনগত রূপরেখা (লিগ্যাল ফ্রেমওয়ার্ক) ঘোষণা করবেন।[৯৩] ১৯৭০ সালের ২৭ নভেম্বর প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খান ঢাকায় এক সাংবাদিক সম্মেলনে লিগ্যাল ফ্রেমওয়ার্ক অর্ডার এর সঙ্গে সঙ্গতি রেখে শাসনতন্ত্র প্রণীত না হলে সামরিক শাসন অব্যাহত থাকবে বলে ঘোষণা করেন।[৯৪] ১৯৭০ সালের নির্বাচনের পর ক্ষমতায় টিকে থাকার জন্য এবং সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জনকারী দলের কাছে ক্ষমতা হস্তান্তর না করার জন্য ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হন।[৯৫]

১৯৭০ সালের ২৮ মার্চ ঘোষিত আইনগত রূপরেখা আদেশের কয়েকটি উল্লেখযোগ্য ধারায় ঐ উদ্বেগ প্রতিফলিত হয় এবং তাতে ক্ষমতাসীন সংখ্যা লঘুদের স্বার্থরক্ষাকারীরূপ সেনা বাহিনীর ভূমিকা আবারও ফুটে ওঠে।[৯৬]

আইনগত রূপরেখার অনুচ্ছেদ ২০ এ বলা হয় শাসনতন্ত্র প্রণীত হবে ৫টি মৌলিক নীতির ভিত্তিতে। এর চতুর্থ নীতিটি নিম্নরূপ

আইন প্রণয়ন মূলক, প্রশাসনিক ও আর্থিক ক্ষমতা সহ সকল ক্ষমতা ফেডারেল সরকার ও প্রদেশগুলোর সর্বোচ্চ স্বায়ত্ত্বশাসন লাভ করে, তবে বৈদেশিক ও অভ্যন্তরীন ক্ষেত্রে দায়িত্ব পালন এবং দেশের স্বাধীনতা ও ভৌগোলিক সংহতি রক্ষায় আইন প্রণয়ন মূলক, প্রশাসনিক ও আর্থিক ক্ষমতাসহ কেন্দ্রীয় সরকারের হাতেও পর্যাপ্ত ক্ষমতা থাকবে।[৯৭]

রূপরেখার অনুচ্ছেদ ২৫ এ বিধান রাখা হয় যে, শাসনতন্ত্র বিল অনুমোদনের জন্য প্রেসিডেন্টের কাছে পেশ করতে হবে এবং প্রেসিডেন্ট তা অনুমোদন করতে অস্বীকৃতি জানালে গণপরিষদ বিলুপ্ত হয়ে যাবে।[৯৮]

উপর্যুক্ত বিধান পাঞ্জাবী স্বার্থের আনুষ্ঠানিক পৃষ্ঠপোষকতা এবং সার্বভৌম গণপরিষদে সংখ্যা গরিষ্ঠের দ্বারা গৃহীত যে কোন সিদ্ধান্তে সেনাবাহিনীর ভেটো দেয়ার ক্ষমতা সংরক্ষণ করা হল।[৯৯]

ষড়যন্ত্রের বিরুদ্ধে বাঙালীদের অবস্থান

শেখ মুজিবুর রহমান সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের নেতা হিসেবে সঙ্গে সঙ্গে ঘোষণা করলেন যে, যদিও তিনি এক ব্যক্তি এক ভোটের ভিত্তিতে জনগণের নির্বাচিত প্রতিনিধিদের সমন্বয়ে একটি গণপরিষদ গঠনকে স্বাগত জানান কিন্তু উক্ত রূপরেখার অনুচ্ছেদ ২০ এবং ২৫ দ্বারা একে শৃঙ্খলিত করা চলবে না। তিনি ঐ সব বিধান

[৯৩] ঐ, পৃষ্ঠা ঃ ৪৪।
[৯৪] ঐ, পৃষ্ঠা ঃ ৪৫।
[৯৫] ঐ।
[৯৬] ঐ, পৃষ্ঠা ঃ ৪৩।
[৯৭] মুনতাসীর মামুন, প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা ঃ ১৩৪।
[৯৮] ড. কামাল হোসেন, প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা ঃ ৪৪।
[৯৯] ঐ।

Dhaka University Institutional Repository

বাতিলের দাবি জানান এবং দৃঢ়চিত্তে বলেন যে, জনগণের সার্বভৌমত্বের ওপর নিয়ন্ত্রণ চাপানো অবৈধ ও অকার্যকর।[১০০]

নির্বাচন শেষে আওয়ামী লীগ নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করলে ৩ জানুয়ারী ১৯৭১ রেসকোর্স ময়দানে (বর্তমান সোহরাওয়ার্দী উদ্যানে) আওয়ামী লীগের নির্বাচিত সংসদ সদস্যদের শপথ গ্রহণ অনুষ্ঠানে শেখ মুজিবুর রহমান বলেন যে, "দেশের ভবিষ্যৎ শাসনতন্ত্র ৬ দফা ও ১১ দফা কর্মসূচীর ভিত্তিতে প্রণয়ন করা হবে। শেখ মুজিবুর রহমান আরও বলেন আরও সংগ্রাম করতে হবে।"[১০১]

চলমান পরিস্থিতিতে ভূট্টোর ভারত বিরোধী ভূমিকা ও তার প্রতিক্রিয়া

২ ফেব্রুয়ারী ১৯৭১ কাশ্মীরী মুক্তিযোদ্ধারুপে পরিচয়দানকারী দুই তরুণ ইন্ডিয়ান এয়ারলাইন্স এর একটি বিমান ছিনতাই করে লাহোরে নিয়ে গেল। পাকিস্তান পিপলস পার্টি তাদেরকে সিংহবিক্রমশালী বীর হিসেবে তুলে ধরে এবং ভূট্টো নিজে ঐ দুই তরুণকে মাল্যভূষিত করেন। লাহোরের রাজপথে তাদের নিয়ে বিজয়মিছিল হয়।[১০২]

বিমানটিকে ধ্বংস করে দিলে ভারত সরকার তার দেশের উপর দিয়ে পাকিস্তানের বিমান চলাচল নিষিদ্ধ ঘোষণা করে। ঘটনাটি ভারতের বিরুদ্ধে বিষোদগার করার একটি সুযোগ এনে দিল।[১০৩]

উক্ত ঘটনার নিন্দা জানিয়ে শেখ মুজিবুর রহমান একটি বিবৃতি প্রদান করেন যে,

"আমি বিষয়টির তদন্ত এবং সৃষ্ট পরিস্থিতিকে অশুভ উদ্দেশ্য হাসিলে ব্যবহার করা থেকে স্বার্থবাদী মহলকে বিরত রাখতে এবং প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নেয়ার জন্য সরকারের প্রতি আহবান জানাচ্ছি।"[১০৪]

ছিনতাই এবং বিমান ধ্বংসের নিন্দা করায় লাহোরে আওয়ামী লীগের অফিসে ভূট্টোর উস্কানিতে হামলা চালানো হয়। পাকিস্তান সরকার এ ঘটনাকে অভ্যন্তরীন রাজনীতিতে ব্যবহার করে জনসাধারণের দৃষ্টিভঙ্গি অন্যত্র সরিয়ে নেয়ার পায়তারা করতে থাকে এবং পাকিস্তানের সংহতির প্রশ্নে ক্ষমতা হস্তান্তর প্রসঙ্গটি এড়িয়ে যেতে থাকে।[১০৫]

---

[১০০] ঐ।
[১০১] ঐ।
[১০২] ঐ।
[১০৩] মেজর জেনারেল কে.এম শফিউল্লাহ। ***মুক্তিযুদ্ধে বাংলাদেশ***, আগামী প্রকাশনী, ঢাকা, ১৯৯৫, পৃষ্ঠা ঃ ২৬।
[১০৪] ড. কামাল হোসেন, প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা ঃ ৫০।
[১০৫] ঐ।

Dhaka University Institutional Repository

"ভুট্টোর সাথে ব্যর্থ আলোচনা এবং জাতীয় পরিষদের অধিবেশন আহবান বিলম্বের ফলে শঙ্কা ঘনীভূত হতে থাকে এবং পরিষ্কার হয়ে গেল ইয়াহিয়া ও সামরিক জান্তা জাতীয় পরিষদ বসতে না দেয়ার জন্য যেকোন ছুঁতো খুঁজছে।"[১০৬]

জাতীয় পরিষদের অধিবেশন আহবান ও ষড়যন্ত্রের নতুন পর্বের সূচনা

"১৯৭১ সালের মুক্তিযুদ্ধ পূর্ব সময়ে আওয়ামী লীগের নেতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের সাথে রাজনৈতিক বিষয়ে বামপন্থী নেতাদের যে সকল মতবিনিময় ও পরামর্শ হয়েছিল সেখানে তারা ঐক্যমতে পৌছেছিল যে, ১৯৭০ এর নির্বাচনের ফলাফল পাকিস্তানী ষড়যন্ত্রকারীরা মেনে নেবেনা এবং বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রাম অনিবার্য এবং তা সশস্ত্র সংগ্রাম হতে পারে।"[১০৭]

ষড়যন্ত্র, গণহত্যা, নির্যাতন সবকিছুর মাঝেও বাঙালীর অবিসংবাদিত নেতা শেখ মুজিবুর রহমান ৬ দফার ভিত্তিতে সংবিধান রচনার প্রশ্নে অটল থাকেন। জাতীয় পরিষদের অধিবেশন আহবান বিলম্বের কারণে বাঙালীরা বিস্ফোরনোন্মুখ হয়ে ওঠে। এমতাবস্থায় ১৩ ফেব্রুয়ারি ১৯৭১ ইয়াহিয়া ঘোষণা করলেন ৩ মার্চ ১৯৭১ ঢাকায় জাতীয় পরিষদের অধিবেশন বসবে।[১০৮]

ইয়াহিয়ার ঘোষণার পর ১৫ ফেব্রুয়ারি ১৯৭১ পেশোয়ারে এক বিবৃতিতে ভুট্টো বলেন, "আপস বা সমঝোতার লক্ষে কোন মতৈক্য ছাড়া ৩ মার্চ ঢাকায় জাতীয় পরিষদের বৈঠকে যোগদান সম্ভব নয়। ভুট্টো অজুহাত দিয়ে বললেন, যে ঢাকায় গেলে তার দলের সদস্যরা নাকি বিপদে পড়বেন। ভারতীয় বৈরিতা ও ৬ দফা মেনে না নেয়ার কারণে" দুই দফা জিম্মি হওয়ার অবস্থানে তিনি নিজেকে নিয়ে যেতে পারেন না।[১০৯]

১৬ ফেব্রুয়ারি করাচিতে ভুট্টো বললেন, "আসন্ন জাতীয় পরিষদ অধিবেশনে তার দলের যোগদান না করার সিদ্ধান্ত অটল ও অপরিবর্তনীয়, অথচ জানুয়ারিতে ভুট্টো বলেছিলেন যে আওয়ামী লীগের সাথে আরো আলোচনা চালানো হবে এবং এ ধরনের আলোচনা জাতীয় পরিষদের ভেতরেও চলতে পারে। পক্ষান্তরে ভুট্টো এ জাতীয় পরিষদের অধিবেশনে অংশ নিতেই অস্বীকৃতি জানাচ্ছেন এবং জেদ ধরেছেন আওয়ামী লীগের সাথে কোন আলোচনার অবকাশ নেই। ভুট্টো হুমকি দিয়ে বলেন যে, আওয়ামী লীগ প্রণীত শাসন তন্ত্রে তার দল স্বাক্ষর করবে না এবং এব্যাপারে কোন কৈফিয়ত চাইলে জাতীয় পরিষদ কসাইখানায় পরিণত হবে।[১১০]

---

[১০৬] ঐ।
[১০৭] ঐ।
[১০৮] ঐ।
[১০৯] ঐ।
[১১০] মনি সিং, *'মুক্তিযুদ্ধে কমিউনিস্ট পার্টি', বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে বামপন্থীদের ভূমিকা,* মেসবাহ কামাল (সম্পাদিত), প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা ঃ ১৭৩।

Dhaka University Institutional Repository

১৭ ফেব্রুয়ারি বেসামরিক মন্ত্রিসভা বাতিল করার পর ইয়াহিয়া খান তাঁর গভর্নরবৃন্দ ও সামরিক আইন প্রশাসকদের নিয়ে গোপন বৈঠক করলেন।[১১১]

২২ ফেব্রুয়ারি সেনাবাহিনীর রাওয়ালপিন্ডিস্থ সদর দফতরে সিনিয়র জেনারেলদের নিয়ে এক গোপন বৈঠক করেন। এ বৈঠকে সিদ্ধান্ত হয়েছিল ক্ষমতা কিছুতেই বাঙালীদের হাতে দেয়া যাবে না। বরং বাঙালীদের পশ্চিম পাকিস্তানের সকল নির্দেশ মানতে বাধ্য করা হবে। জেনারেলদের ধারণা ছিল, সামরিক বাহিনী যদি পূর্ব পাকিস্তানে বাঙালীদের মনে ভীতি ও ত্রাস সৃষ্টি করতে পারে তাহলেই বাঙালীরা পশ্চিম পাকিস্তানের প্রভুত্ব মেনে নেবে।[১১২]

এমনকি টিক্কা খান ইয়াহিয়া খানকে বলেছিলেন; এক সপ্তাহের সময়দিন, পূর্ব পাকিস্তানে আমি স্বাভাবিক অবস্থা ফিরিয়ে আনতে পারব। এই সম্মেলনের পরই মন্ত্রি পরিষদ বাতিল করা হয়। এসবই সামরিক প্রস্তুতির ইঙ্গিত।[১১৩]

জাতীয় পরিষদের অধিবেশন স্থগিত ঘোষণা ও স্থগিত ঘোষণার প্রতিক্রিয়া

২২ ফেব্রুয়ারি ১৯৭১ সেনাবাহিনীর রাওয়ালপিন্ডিস্থ সদর দপ্তরে সিনিয়র জেনারেলদের নিয়ে প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খান এক গোপন বৈঠকে মিলিত হন।[১১৪] সেখানে বাঙালিদের হাতে ক্ষমতা না দেয়ার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় ১৬ ফেব্রুয়ারি ১৯৭১ ভুট্টো হুমকি দিয়ে বলেছিলেন যে জাতীয় পরিষদের অধিবেশন উপলক্ষে যদি কেউ পশ্চিম পাকিস্তান থেকে ঢাকায় যান খাকি- বা সাদা যে পোশাক ধারীই হোন না কেন তা তিনি করবেন নিজ দায়িত্বে।[১১৫] তারপরও পশ্চিম পাকিস্তান থেকে কয়েকটি নির্বাচিত জনপ্রতিনিধিরা অধিবেশনে যোগদান উপলক্ষে ঢাকায় আসেন।[১১৬] ১৯৭১ সালের ১ মার্চ বেলা ১টা ৫ মিনিটে জাতীয় পরিষদের অধিবেশন অনির্দিষ্ট কালের জন্য স্থগিত ঘোষণা করেন জেনারেল ইয়াহিয়া।[১১৭] বেতার ঘোষণার দ্বারা ইয়াহিয়া বাঙালি জাতিকে নিদারুণ অপমান করেন।[১১৮] প্রেসিডেন্টের এ ঘোষণায় শুধু রাজনীতিবিদ নন সর্বস্তরের মানুষের মধ্যে তীব্র প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করে।[১১৯] মওলানা আব্দুল হানিফ খান ভাসানী, পাকিস্তান মজদুর ফেডারেশন, বিভিন্ন শ্রমিক

---

[১১১] ড. কামাল হোসেন, প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা ঃ ৫৩।
[১১২] ঐ।
[১১৩] ঐ।
[১১৪] ঐ।
[১১৫] ঐ।
[১১৬] ঐ।
[১১৭] ঐ, পৃষ্ঠা ঃ ৫৪।
[১১৮] ঐ।
[১১৯] মেজর রফিকুল ইসলাম, *লক্ষ প্রাণের বিনিময়ে*, অনন্যা প্রকাশন, ঢাকা, ১৯৮১, পৃষ্ঠা ঃ ৬৯।

Dhaka University Institutional Repository

সংগঠন, বুদ্ধিজীবীবৃন্দ এই ঘোষণার প্রতিবাদ করেন এবং পৃথক পৃথকভাবে বিবৃতি প্রদান করেন।[১২০] জাতীয় পরিষদের অধিবেশন স্থগিত করে দেয়ার ঘোষণায় শাসনতান্ত্রিক প্রক্রিয়া ও পাকিস্তানের সংহতি উভয় ক্ষেত্রেই তাদের বিশ্বাস ভেঙ্গে দেয়।[১২১] বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের এই বিবৃতির মাধ্যমে তাঁরা ১৯৭০ এর নির্বাচনকে স্বীকৃতি প্রদান করেন।[১২২]

বেতার ঘোষণাটি শোনার পর মানুষ জঙ্গী জনতারমত মিছিল নিয়ে হোটেল পূর্বাণী অভিমুখে অগ্রসর হতে থাকে। সরকারি কর্মচারীরা সেক্রেটারিয়েট ও অন্যান্য সরকারি অফিস থেকে বেরিয়ে পড়েন, ব্যাংক, বীমাসহ অন্যান্য ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের অফিস গুলো খালি হয়ে যায়।[১২৩] ঢাকা স্টেডিয়ামে ক্রিকেট খেলা চলছিল। মানুষ স্টেডিয়াম ছেড়ে দলে দলে বেরিয়ে আসতে থাকে।[১২৪] ছাত্ররা ইতিমধ্যেই রাজপথে স্বতঃস্ফুর্ত বিক্ষোভ করেছিল। হোটেল পূর্বাণীর সামনে সমবেত মানুষের প্রায় প্রত্যেকেরই হাতে ছিল একটি করে বাঁশ অথবা লাঠি এবং কণ্ঠে ছিল স্বাধীনতার স্লোগান। শত শত খন্ডে বিভক্ত মিছিল গুলো ঢাকার রাজপথ কাপিয়ে তোলে।[১২৫]

আওয়ামী লীগের প্রতিক্রিয়া

বাঙালির সামনে একটাই পথ- প্রতিবাদের পথ। কাজেই সংঘর্ষ অনিবার্য। তুমুল উত্তেজনাপূর্ণ পরিবেশে দলীয় নেতৃবৃন্দ পরিবেষ্ঠিত হয়ে বেলা ৩টা ২০ মিনিটে তাদের দলীয় প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করেন।[১২৬] শেখ মুজিবুর রহমান শত শত বিদেশী সাংবাদিকদের সামনে বললেন, "..... কেবল সংখ্যালঘু দলের ভিন্ন মতের কারণে শাসনতন্ত্র প্রণয়নের গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ায় বাধা দেয়া হয়েছে এবং জাতীয় পরিষদের অধিবেশন অনির্দিষ্ট কালের জন্য স্থগিত করা হয়েছে।[১২৭] এটা খুবই দুর্ভাগ্য জনক।[১২৮] আমরা জনগণের সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশের প্রতিনিধি এবং আমরা এটা বিনা চ্যালেঞ্জে যেতে দিতে পারিনা।"[১২৯]

জনসাধারণ বুঝতে পারে এ অবস্থা থেকে উত্তরণে সশস্ত্র সংগ্রামের বিকল্প নেই। শেখ মুজিব অসহযোগ আন্দোলনের ঘোষণা দিলেন।[১৩০]

---

[১২০] ঐ।
[১২১] ঐ।
[১২২] ঐ, পৃষ্ঠা ঃ ৭০।
[১২৩] ঐ।
[১২৪] ঐ।
[১২৫] মোল্লা আমীর হোসেন, ***মুক্তিযুদ্ধে খুলনা,*** সুবর্ণ প্রকাশন, ঢাকা, ২০০৯, পৃষ্ঠা ঃ ৭২।
[১২৬] ঐ।
[১২৭] ঐ।
[১২৮] ঐ।
[১২৯] রফিকুল ইসলাম, প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা ঃ ৬৮।
[১৩০] কামাল হোসেন, ***স্বায়ত্বশাসন থেকে স্বাধীনতা,*** পৃষ্ঠা ঃ ৫৯।

Dhaka University Institutional Repository

অসহযোগ আন্দোলন

ইয়াহিয়া খান কর্তৃক জাতীয় পরিষদের অধিবেশন স্থগিত ঘোষণার পর শেখ মুজিবুর রহমান যে, অসহযোগ আন্দোলনের ডাক দেন তাতে পূর্ব বাংলার বেসামরিক প্রশাসন অচল হয়ে পড়ে।[১৩১] জনতার বিক্ষোভ মুহূর্তের মধ্যে প্রচন্ড রূপ ধারন করে এবং গোটা পূর্বাঞ্চলে সে বিক্ষোভের আগুন দ্রুত ছড়িয়ে পড়ে।[১৩২] ১ মার্চ ১৯৭১ পরবর্তী ৬ দিনের আন্দোলনের কর্মসূচী ঘোষণা করা হল।[১৩৩] ২ মার্চ ঢাকায় হরতাল, ৩ মার্চ সারাদেশে হরতাল এং ৭ মার্চ ঢাকায় জনসভার ঘোষণা দেয়া হয়।[১৩৪] ২ মার্চ শেখ মুজিবুর রহমান ঘোষণা করলেন, গণবিরোধী শক্তির সঙ্গে কোন ধরনের সহযাগীতা না করা এবং বাংলাদেশের বিরুদ্ধে যে কোন ষড়যন্ত্র সর্বশক্তি দিয়ে প্রতিহত করা, সরকারি কর্মচারীসহ প্রতিটি পেশার প্রত্যেক বাঙালির পবিত্র দায়িত্ব।[১৩৫] অসহযোগ আন্দোলনের নির্দেশাবলী শেখ মুজিব এবং দলীয় নেতৃবৃন্দের অনুমোদনের পর তা প্রচারের দায়িত্ব দেন, তাজউদ্দিন আহমদ, আমীর উল ইসলাম এবং ড. কামাল হোসেনের উপর।[১৩৬] ২ মার্চ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্ররা বাংলাদেশের মানচিত্র খচিত স্বাধীন বাংলাদেশের পতাকা উত্তোলন করেন।[১৩৭] ২ মার্চ প্রচারিত প্রথম নির্দেশপত্রে ৩ মার্চ থেকে ৬ মার্চ যে নির্দেশ দেয়া হল সে অনুসারে সরকারি দফতর সমূহ, সচিবালয়, হাইকোর্ট ও অন্যান্য আদালত, সরকারি ও স্বায়ত্তশাসিত কর্পোরেশন সমূহ যেমন ডাক বিভাগ, রেলওয়ে ও অন্যান্য যোগাযোগ ব্যবস্থা, সরকারি ও বেসরকারি পরিবহন, কলকারখানা, শিল্প ও বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠান সমূহ সবকিছুই হরতালের আওতাভূক্ত।[১৩৮] শুধু এম্বুলেন্স, সংবাদপত্রের গাড়ি, হাসপাতাল, ঔষুধের দোকান, পানি সরবরাহ এই হরতালের আওতা বহির্ভুত থাকে।[১৩৯]

অসহযোগ আন্দোলনের চাপে বেসামরিক প্রশাসন স্থবির হয়ে পড়ায় প্রত্যহ সন্ধ্যায় সামরিক বাহিনী কারফিউ জারি করতে লাগল।[১৪০] আন্দোলনরত জনতা কারফিউ ভঙ্গ করতে গেলে তাদের উপর সৈন্যরা গুলি বর্ষণ করতে থাকে।[১৪১] ২ মার্চ সেনাবাহিনী ৮ জন কে গুলি করে হত্যা করে।[১৪২]

পরিস্থিতি গুরুতর হয়ে উঠলে সামরিক কমান্ডার ইয়াকুব সৈন্য সংখ্যা বৃদ্ধির জন্য সরকারকে চাপ দিতে থাকেন।[১৪৩] মার্চের প্রথম সপ্তাহেই ইয়াকুবকে সরিয়ে কুখ্যাত জেনারেল টিক্কা খানকে পূর্বাঞ্চলের গভর্নর

---

[১৩১] ঐ।
[১৩২] ঐ, পৃষ্ঠা ঃ ৬০।
[১৩৩] ঐ।
[১৩৪] মোল্লা আমীর হোসেন, প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা ঃ ৭৩।
[১৩৫] ড. কামাল হোসেন, প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা ঃ ৫৯।
[১৩৬] ঐ।
[১৩৭] ঐ, পৃষ্ঠা ঃ ৬১।
[১৩৮] ঐ।
[১৩৯] ঐ।
[১৪০] ঐ।
[১৪১] ঐ।
[১৪২] ড. আতিউর রহমান, *মুক্তিযুদ্ধের মানুষ মুক্তিযুদ্ধের স্বপ্ন,* সাহিত্য প্রকাশন, ঢাকা, ১৯৯৭, পৃষ্ঠা ঃ ১৫।
[১৪৩] মোল্লা আমীর হোসেন, প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা ঃ ৭৪।

Dhaka University Institutional Repository

এবং সেনা কমান্ডার নিযুক্ত করেন।[১৪৪] ৩ মার্চ ১৯৭১ পল্টন ময়দানের জনসভায় 'ছাত্র সংগ্রাম পরিষদ' স্বাধীনতার ইশতেহার ঘোষণা করে।[১৪৫] এই ইশতেহারে স্বাধীন সার্বভৌম রাষ্ট্রের নাম করণ করা হয় 'বাংলাদেশ' এবং শেখ মুজিবুর রহমানকে এর সর্বাধিনায়ক ঘোষণা করা হয়।[১৪৬] ৫৪ হাজার ৫ শত ৭১ বর্গমাইল বিস্তৃত ভৌগোলিক এলাকা ৭ কোটি মানুষের আবাস ভূমি হিসেবে উল্লেখ করা হয়।[১৪৭] এই ইশতেহারে ৩টি লক্ষ্য অর্জনের কথা বলা হয়। বলিষ্ঠ বাঙালি জাতি সৃষ্টি ও বাঙালীর ভাষা, সাহিত্য ও সংস্কৃতির পূর্ণ বিকাশের ব্যবস্থা, অঞ্চলে অঞ্চলে ব্যক্তিতে ব্যক্তিতে বৈষম্য নিরসন কল্পে, সমাজতান্ত্রিক অর্থনীতি চালু, ব্যক্তি, বাক ও সংবাদ পত্রের স্বাধীনতার কথা বলা হয়।[১৪৮] স্বাধীনতা আন্দোলন পরিচালনার জন্য গ্রাম, মহল্লা, উপজেলা, মহকুমা, শহর ও জেলায় স্বাধীনতা সংগ্রাম কমিটি গঠন করা হয়।[১৪৯] এলাকায় এলাকায় মুক্তিবাহিনী গঠন করার কর্মপন্থা নেয়া হয়।[১৫০]

৩ মার্চ ১৯৭১ ছাত্রলীগের ইশতেহারে স্বাধীনতা আন্দোলনের যে ধারা প্রকাশ করা হয়- তা নিম্নরূপ।[১৫১]

১। পাকিস্তান সরকারকে বিদেশী শাসক ও শোষক হিসেবে ঘোষণা করা হয় এবং ঐ সরকারের সকল আইন অবৈধ ঘোষণা করা হয়।

২। অবাঙালি মিলিটারিকে বিদেশী ও হামলাকারী শত্রু হিসেবে গণ্যকরে তাদের আক্রমণ খতম করার কথা ঘোষণা করা হয়।

৩। সকল প্রকার ট্যাক্স বন্ধ করার ঘোষণা দেয়া হয়।

৪। পাকিস্তানী পণ্য বর্জন ও সর্বাত্মক অসহযোগ আন্দোলন গড়ে তোলার প্রতিজ্ঞা করা হয়।

৫। উপনিবেশবাদী পাকিস্তানী পতাকা পুড়িয়ে বাংলাদেশের জাতীয় পতাকা ব্যবহারের ঘোষণা দেয়া হয়।

ছাত্র সংগ্রাম পরিষদের স্বাধীনতার ইশতেহার ঘোষণায় সাধারণ মানুষ অসহযোগ কর্মসূচী পালন করতে থাকে। সরকারি কর্মচারিগণ অসহযোগ আন্দোলনে অংশগ্রহণ করলে বেসামরিক প্রশাসন সম্পূর্ণরুপে ভেঙ্গে পড়ে।[১৫২] কারফিউ ভঙ্গ করা জনতার উপর সেনাবাহিনী গুলিবর্ষণ করলে অনেক মানুষ হতাহত হয়। গণ আন্দোলন ব্যাপক আকার ধারন করায় তা দমনের জন্য যথেষ্ট সৈন্য না থাকায় সামরিক কমান্ডার ইয়াকুব সরকারকে সৈন্য বাড়ানোর চাপ দিতে থাকেন। ইয়াহিয়ার কাছে এক গোপন বার্তায় ইয়াকুব চলমান

---

[১৪৪] ঐ।

[১৪৫] হাসান হাফিজুর রহমান সম্পাদিত, ***বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধ, দলিলপত্র, ২য় খন্ড***, তথ্য মন্ত্রণালয়, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, ঢাকা, ১৯৮২।

[১৪৬] পৃষ্ঠা ঃ ৬৬৮।

[১৪৭] ঐ, পৃষ্ঠা ঃ ৬৭০।

[১৪৮] ঐ।

[১৪৯] ড. কামাল হোসেন, প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা ঃ ৫২।

[১৫০] ড. আবু মোঃ দেলোয়ার হোসেন, ***বাংলাদেশের ইতিহাস (১৯০৫-১৯৭১),*** বিশ্ববিদ্যালয় প্রকাশন, ঢাকা, ২০১৩, পৃষ্ঠা ঃ ৪১৫।

[১৫১] ঐ।

[১৫২] কামাল হোসেন, প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা ঃ ৬২।

Dhaka University Institutional Repository

পরিস্থিতির ব্যাখ্যা করেন এবং বাঙালিদের এ উত্থান অপ্রতিহত বলে উল্লেখ করেন।[১৫৩] সমসাময়িক পরিস্থিতি বিশ্লেষণ করে রাও ফরমান আলী বলেন যে ১ মার্চেই পাকিস্তানের ভাঙন ঘটেছিল।[১৫৪] ঔপনিবেশিক শাসন অব্যাহত রাখতে রক্তপিপাসু ইয়াহিয়া অনিবার্য যুদ্ধের পরিস্থিতি সৃষ্টি করে। ৪ মার্চ ১৯৭১ পাকিস্তানের নির্বাচিত নেতৃবৃন্দ, আইনজীবী এবং বুদ্ধিজীবীগণ অধিবেশন স্থগিতের সিদ্ধান্তের সমালোচনা করেন এবং পাকিস্তানের দুই অংশের মধ্যে বিস্তর ব্যবধান হয়েছে বলে মত প্রকাশ করেন।[১৫৫]

৭ মার্চ ১৯৭১, ঢাকায় সংগ্রামী চেতনায় উদ্দীপ্ত প্রায় দশ লাখ লোকের জনসভায় শেখ মুজিবুর রহমান তাঁর ঐতিহাসিক ভাষণ দেন।[১৫৬] দিনটি ছিল বাঙালি জাতির জন্য বহু আকাঙ্খিত। দেশের সকল শহর, নগর, বন্দর ও গ্রামের মানুষ শেখ মুজিবের ভাষণটি শোনার জন্য রেডিও এবং ট্রানজিস্টর অন করে উদগ্রীব হয়ে রইলেন। ইয়াহিয়া সরকার বেতার সম্প্রচার বন্ধ করে দেয়। শেখ মুজিব স্বাধীনতা ঘোষণা করতে পারেন এই আশঙ্কায় সেনা কর্তৃপক্ষ রেসকোর্স ময়দানের চারিদিকে পদাতিক সৈন্য মোতায়ন করে এবং সভাস্থলে গোলা বর্ষণের জন্য গোলন্দাজ বাহিনীর কামান বসানো হয়েছিল।[১৫৭] ঢাকা বিমান বন্দরে এফ ৮৬ স্যাবর জেট বিমান আক্রমণ পরিচালনার জন্য প্রস্তুত রাখা হয়েছিল।[১৫৮] কামানের গোলাবর্ষণের নির্দেশ দেয়ার জন্য প্রস্তুতি নিয়ে একটি হেলিকাপ্টর আকাশে টহল দিতে থাকে।[১৫৯] ইয়াহিয়া খান একটি মাত্র অজুহাত খুজতে থাকে। স্বাধীনতার ঘোষণা হলেই শেখ মুজিব সহ লাখ জনতার উপর সুসজ্জিত সেনাবাহিনী ঝাঁপিয়ে পড়বে।[১৬০]

৭ মার্চের জন সমুদ্রে শেখ মুজিবুর রহমান যে দিক নির্দেশনা মূলকভাষণ দেন তার মূল বিষয় ছিল ৪টি।[১৬১] যথা-

১। চলমান সামরিক আইন প্রত্যাহার।

২। সৈন্যদের ব্যারাকে ফিরিয়ে নিয়ে যাওয়া।

৩। গণহত্যার তদন্ত করা।

৪। নির্বাচিত জনপ্রতিনিধিদের হাতে ক্ষমতা হস্তান্তর করা।

এ সকল দাবির পাশাপাশি তিনি কতগুলো ঘোষণা প্রদান করেন। তিনি বাংলাদেশের সকল অফিস আদালত ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠান অনির্দিষ্ট কালের জন্য বন্ধ ঘোষণা করেন।[১৬২] ব্যাপক ধ্বংস যজ্ঞ চালানো হবে এ

---

[১৫৩] মেসবাহ কামাল, *বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে বামপন্থীদের ভূমিকা, প্রথম খন্ড,* পৃষ্ঠা ঃ ১৭০।
[১৫৪] কামাল হোসেন, প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা ঃ ৬২।
[১৫৫] ঐ।
[১৫৬] ঐ।
[১৫৭] কামাল হোসেন, পৃষ্ঠা ঃ ৯৩।
[১৫৮] ঐ।
[১৫৯] ঐ।
[১৬০] ঐ।
[১৬১] ঐ।

Dhaka University Institutional Repository

আশঙ্কায় তিনি প্রত্যক্ষ ভাবে স্বাধীনতার ঘোষণা না দিয়ে পরোক্ষভাবে ঘোষণা দেন।[১৬৩] তিনি হুশিয়ারি উচ্চারণ করে বলেন " আর যদি একটা গুলি চলে তোমাদের কাছে অনুরোধ রইল প্রত্যেক ঘরে ঘরে দুর্গ গড়ে তোলো। তোমাদের যা কিছু আছে তাই নিয়ে শত্রুর মোকাবেলা করতে হবে। তিনি নির্দেশ দিলেন," প্রত্যেক গ্রাম, প্রত্যেক মহল্লায় আওয়ামী লীগের নেতৃত্বে সংগ্রাম পরিষদ গড়ে তোল এবং তোমাদের যা কিছু আছে তাই নিয়ে প্রস্তুত থাকো। রক্ত যখন দিয়েছি, রক্ত আরো দিবো। এবারের সংগ্রাম মুক্তির সংগ্রাম, এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম।[১৬৪]

৭ মার্চ বঙ্গবন্ধুর ভাষণ বেতার ও টেলিভিশনে প্রচার করার কথা থাকলেও সরকারি বাধায় তা বন্ধ হয়ে গেলে বাঙালি কর্মচারীরা বেতার ও টিভি বর্জন করে। ফলে সরকার কর্তৃক পরের দিন ৮ই মার্চ সকাল সাড়ে আটটায় ভাষণটি সম্প্রচারিত হয়।[১৬৫]

৭ মার্চ বিকাল বেলা ছাত্র ছাত্রীরা রাইফেল নিয়ে ঢাকার রাজপথ প্রদক্ষিণ শুরু করে। ৮ মার্চ থেকে ২৫ মার্চ পর্যন্ত এ প্রশিক্ষণ অব্যাহত থাকে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইউ.ও.টি.সি এর ক্যাডেটরা এ প্রশিক্ষণ পরিচালনা করে।[১৬৬]

স্বাধীন বাংলা সংগ্রাম পরিষদ এক বিবৃতিতে বার্মা ইস্টার্ন, এসো, পাকিস্তান ন্যাশনাল অয়েলস, দাউদ পেট্রেলিয়ামকে সেনা বাহিনীর ব্যবহারের জন্য কোন প্রকার জ্বালানি ও তেল সরবরাহ করতে নিষেধ করেন। জনগণের অসহযোগিতার ফলে পাক বাহিনী জ্বালানি ও খাদ্য সংকটে পড়ে। ১৩ মার্চ ১৯৭১ সরকার এক ১১৫ নম্বর সামরিক আদেশ জারির মাধ্যমে প্রতিরক্ষা খাত থেকে বেতন গ্রহণ কারি কর্মচারীদের কাজে যোগ দিতে বাল এবং আদেশ অমান্যকারীর বিরুদ্ধে আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণের হুমকি দেয়া হয়।[১৬৭]

১৪ মার্চ ১৯৭১ ভুট্টো এক অবাস্তব প্রস্তাবে পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের হাতে ক্ষমতা ছাড়ার ফর্মুলা দেন।[১৬৮] শেখ মুজিবুর রহমান এসব কথায় গুরুত্ব না দিয়ে ১৪ মার্চ ৩৫ দফা ভিত্তিক একটি নির্দেশনামা জারি করেন।[১৬৯] যাতে বলা হয়েছিল সরকারি বিভাগ সমূহ, সচিবালয়, হাইকোর্ট, আধা-স্বায়ত্তশাসিত সংস্থা সমূহ, সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বন্ধ থাকবে। নির্দেশ নামায় বলা হয় জেলা প্রশাসক ও সহকুমা প্রশাসকগণ অফিস না খুলে আওয়ামী লীগ ও সংগ্রাম পরিষদের সহযোগিতায় শান্তি শৃঙ্খলার দায়িত্ব

---

[১৬২] ঐ।
[১৬৩] ঐ, পৃষ্ঠা ঃ ৯৪।
[১৬৪] মোল্লা আমীর হোসেন, প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা ঃ ৭৫।
[১৬৫] ঐ।
[১৬৬] ঐ।
[১৬৭] মেজর রফিকুল ইসলাম, প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা ঃ ৮৩।
[১৬৮] মোল্লা আমীর হোসেন, প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা ঃ ৭৬।
[১৬৯] ঐ।

Dhaka University Institutional Repository

পালন করবেন।[১৭০] পুলিশ বিভাগকেও একই নির্দেশ প্রদান করা হয়। ১৫ মার্চ থেকে পূর্ব পাকিস্তান এ নির্দেশনা অনুসারে পরিচালিত হয়।[১৭১]

ইয়াহিয়া, মুজিব, ভুট্টোর- আলোচনা ব্যর্থঃ সামরিক প্রস্তুতি সম্পন্ন

পূর্ব পাকিস্তানের রাজনৈতিক অবস্থা, উপলব্ধি করে ইয়াহিয়া খান ১৫ মার্চ ঢাকা সফরে আসেন।[১৭২] শেখ মুজিব অসহযোগ আন্দোলন প্রত্যাহার করতে রাজি না হওয়ায় ১৬ মার্চ থেকে আলোচনা এবং অসহযোগ আন্দোলন যুগপৎ চলতে থাকে।[১৭৩]

১৭ মার্চ ১৯৭১ প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খান জেনারেল টিক্কা খানকে নির্দেশ দিয়েছিলেন সামরিক প্রস্তুতি গ্রহণ করতে। সে নির্দেশ অনুসারে ১৮ মার্চ সকালে মেজর জেনারেল খাদিম হোসেন রাজা এবং রাও ফরমান আলী অপারেশন সার্চ লাইটের নীল নকসা তৈরি করেন।[১৭৪]

২০ মার্চ থেকে ২৪ মার্চ পর্যন্ত বিশেষজ্ঞ সদস্য এবং সহযোগীদের নিয়ে বৈঠক চলতে থাকে। রাজনৈতিক ভাবে সমস্যা সমাধানের জন্য দীর্ঘ আলোচনা, জনগণের অসহযোগ আন্দোলন এবং সামরিক প্রস্তুতি জনমনে উদ্বেগ এবং উৎকণ্ঠা বাড়তে থাকে।[১৭৫]

১৯ মার্চ সকালের বৈঠকে শেখ মুজিব ইয়াহিয়া খানকে আবারও জোর দিয়ে বলেন যে, সংকট উত্তোরণের একমাত্র পথ হলো অবিলম্বে সামরিক আইন প্রত্যাহার করে নির্বাচিত গণপ্রতিনিধিদের হাতে ক্ষমতা অর্পন করা এবং এ লক্ষে অন্তর্বর্তী সময়ের জন্য একটি আদেশ জারি করা।[১৭৬]

শেখ মুজিব জোর দিয়ে বললেন, রাজনৈতিক সিদ্ধান্ত রাজনৈতিক নেতারা গ্রহণ করবেন এবং বিশেষজ্ঞরা সেগুলো কার্যকর করার পথ বের করবেন।[১৭৭]

২১ মার্চ ভুট্টো খান বিশেষ নিরাপত্তা ব্যবস্থায় ঢাকায় আসেন। ইতিপূর্বে গোপন সামরিক প্রস্তুতির অংশ হিসেবে ৯ মার্চ লেফটেন্যান্ট জেনারেল টিক্কা খানকে পূর্ব পাকিস্তানের সামরিক আইন প্রশাসক নিয়োগ করা হয়।[১৭৮] প্রতিরাতে পশ্চিম পাকিস্তান থেকে ঢাকায় বিমান করে সৈন্য আমদানি করা হয়। এম.ভি সোয়াত নামক জাহাজে করে বিশাল অস্ত্রের চালান চট্টগ্রাম বন্দরে আসে।[১৭৯] ১৯ মার্চ সেনাবাহিনীর ট্রাক বহর টঙ্গী

---

[১৭০] ঐ।
[১৭১] ঐ।
[১৭২] ঐ।
[১৭৩] ড. আবু মোঃ দেলোয়ার হোসেন, প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা ঃ ৪১৬।
[১৭৪] ঐ।
[১৭৫] ঐ।
[১৭৬] ঐ, পৃষ্ঠা ঃ ৪১৭।
[১৭৭] হাসান হাফিজুর রহমান, সম্পাদিত, *বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধের দলিলপত্র (২য় খন্ড)*, পৃষ্ঠা ঃ (৭৩৯-৭৪৫)
[১৭৮] ঐ।
[১৭৯] মোল্লা আমীর হোসেন, প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা ঃ ৭৭।

Dhaka University Institutional Repository

অতিক্রম করার সময় জনগণ কর্তৃক তা আক্রান্ত হয় এবং সেনা বাহিনী ও জনগণের মধ্যে গোলাগুলি হয়।[১৮০] পাকিস্তান সরকারের শ্বেতপত্রে এমন মিথ্যাচার করা হয় যে, পাকিস্তানী জাহাজ এম.ভি সোয়াত যোগে সেনা ও ট্যাংক সরবরাহ দিল স্বাভাবিক চলাচল।[১৮১] আলোচনা চলাকালে ইয়াহিয়া খান উত্তেজিত হয়ে বলেন- "আওয়ামী লীগ সামরিক সরবরাহে বাধা দিলে তিনি তা সহ্য করবেন না।[১৮২]

২৩ মার্চ পাকিস্তান দিবসে হিসেবে পালিত হতো। ঐদিন হাজার বাংলাদেশের পতাকা বিক্রি হতে থাকে এবং পূর্ব পাকিস্তানের সর্বত্র বাংলাদেশের পতাকা উড়তে থাকে।[১৮৩] ঢাকায় সেভিয়েত কনসুলেট অফিস সহ ব্রিটিশ ডেপুটি হাই কমিশনে বাংলাদেশের পতাকা উড়তে থাকে।[১৮৪]

২৩ মার্চ সন্ধ্যায় আওয়ামী লীগ আলোচক দল জানতে পারলেন সারাদিন লাগাতার ভাবে অর্থনৈতিক বিষয়ে যে আলোচনা চলছে তা শুধুমাত্র সময় ক্ষেপন, ইয়াহিয়া খান সারাদিন ধরেই বাইরে রয়েছেন।[১৮৫] জেনারেলরা ক্যান্টনমেন্টে বৈঠক করেন যেখানে অপারেশন সার্চ লাইটের চূড়ান্ত অনুমোদন দেয়া হয়। দুইজন পরিকল্পনাকারি ২০ মার্চ হেলিকপ্টার যোগে ঢাকার বাইরে তাদের বিশ্বস্ত ব্রিগেড কমান্ডারদের কাছে গিয়ে করণীয় সম্পর্কে বুঝিয়ে দেন।[১৮৬]

২৫ মার্চ ইয়াহিয়া খান আলোচনা বন্ধ করেছেন এবং সর্বত্র প্রচার করতে থাকেন আলোচনা সফল হয়েছে।[১৮৭] ঐদিনই বাঙালি অফিসারদের গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব থেকে সরিয়ে দেয়া হয়। ইপিআর বাহিনীর বিশেষ টহল বন্ধ করে দিয়ে তাদের অস্ত্র জমা নেয়া হয়। ২৫ মার্চেই ইয়াহিয়া গোপনে ঢাকা ত্যাগ করেন সর্বত্র ছড়িয়ে পড়ে ব্যর্থ আলোচনার কথা। ২৫ মার্চ কালরাতে পাকিস্তানি সেনারা বহুবাঙালিকে নির্বিচারে হত্যা করে।[১৮৮]

বাংলাদেশের স্বাধীনতা ঘোষণা

পাকিস্তান সেনাবাহিনী ২৫ মার্চ রাতে পূর্ব পরিকল্পনা অনুসারে পূর্ব বাংলায় গণহত্যা চালায়। ঐ রাতে গণহত্যা চলেছিল ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, মিরপুর, মোহাম্মাদপুর, বিমান বন্দর, রায়ের বাজার, ধানমন্ডি, কলাবাগান, পীলখানা, রাজারবাগ পুলিশ লাইন, সহ প্রভৃতি স্থানে। বিধ্বস্ত হয়ে যায় ঢাকা নগরী হাজার হাজার নর নারী শিশু এই গণহত্যার শিকার হয়।[১৮৯]

---

[১৮০] ঐ।
[১৮১] আবু মোঃ দেলোয়ার হোসেন, প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা ঃ ৪১৮।
[১৮২] ড. কামাল হোসেন, প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা ঃ ৭১।
[১৮৩] মেজর রফিকুল ইসলাম, প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা ঃ ৭৯।
[১৮৪] মোল্লা আমীর হোসেন, প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা ঃ ৭৭।
[১৮৫] ঐ।
[১৮৬] ঐ।
[১৮৭] ঐ, পৃষ্ঠা ঃ ৭৮।
[১৮৮] ঐ।
[১৮৯] কামাল হোসেন, প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা ঃ ৮০।

শেখ মুজিবুর রহমান ২৫ মার্চ রাতে শত্রুর হাতে বন্দি হওয়ার আগেই স্বাধীনতার ঘোষণা প্রদান করেন। চট্টগ্রামের আওয়ামী লীগ নেতা মোঃ আব্দুল হান্নান, জহুর আহমদ চৌধুরী ও অন্যান্য নেতৃবৃন্দ "স্বাধীন বাংলা বিপ্লবী বেতার কেন্দ্র" গড়ে তোলেন। ২৫ মার্চ মধ্যরাতে ২৬ মার্চ ১ম প্রহরে পাকিস্তানী সেনাদের হাতে বন্দি হওয়ার পূর্বে ধানমন্ডি ৩২ নম্বর বাসা থেকে ওয়ারলেস যোগে স্বাধীনতার ঘোষণা প্রদান করেন। উক্ত ঘোষণাটি স্বাধীন বাংলা বিপ্লবী বেতার কেন্দ্র থেকে প্রচার করা হয়।[১৯০] বার্তাটি এরূপ- "This may be my last message, from today Bangladesh is independent. I call upon the people of Bangladesh wherever you might be and with what ever you have, to resist the army of occupation to the last. Your Fight must go on until the last soldier of the Pakistan occupation army is expelled from the soil of Bangladesh and final victory is achieved."

স্বাধীনতা ঘোষনার বার্তাটি রাত ১১টা ৩৮ মিনিটে চট্টগ্রামে আওয়ামী লীগ নেতাদের কাছে পৌছায় এবং ২৬ মার্চ বেলা ২.১০টায় চট্টগ্রাম আওয়ামী লীগ সাধারণ সম্পাদক আব্দুল হান্নান বঙ্গবন্ধুর পক্ষে স্বাধীনতার ঘোষণাটি প্রচার করেন।

১০ এপ্রিল ১৯৭১ মুজিব নগরে অস্থায়ী বাংলাদেশ সরকার গঠিত হাল সরকারের পক্ষ থেকে স্বাধীনতার আনুষ্ঠানিক ঘোষণা দেয়া হয়।

সাতক্ষীরার রাজাকার ও পিসকমিটিঃ

১৯৭১ সালের ১০ এপ্রিল, পূর্ব পাকিস্তানের জামায়াত ইসলামীর প্রধান আমীর অধ্যাপক গোলাম আযম তথাকথিত পিস কমিটি গঠন করেন। পাকিস্তানের সামরিক সরকারের আদর্শপুষ্ট রাজনৈতিক দল জামায়াতে ইসলামী, নেজামে ইসলামী, পি,ডি,পি ও মুসলিম লীগ মিলে গঠিত হয় পিস কমিটি।[১৯১] এই পিস কমিটি গঠনের লক্ষ্য ছিল, মুক্তিযুদ্ধকে প্রতিহত করা এবং মুক্তিযোদ্ধাদের নির্মূল করে পাকিস্তানী বাহিনীকে সহযোগিতা প্রদান করা। তারা ভারতগামী শরণার্থীরা যাতে পূর্ব পাকিস্তান থেকে কোন ধরনের মালপত্র বহন করে নিতে না পারে, সেদিকে কড়া নজর রাখে এবং পথ থেকে সবকিছু লুটপাট করতে থাকে। ১০ এপ্রিল ১৯৭১ পাকিস্তানের সংহতিকে রক্ষা করার জন্য পাকিস্তান পন্থী রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ ১৪০ সদস্য বিশিষ্ট কেন্দ্রীয় পিস কমিটি গঠন করেন। কেন্দ্রীয় পিস কমিটি গঠনের পর জেলা, মহকুমা, উপজেলা ও ইউনিয়ন

[১৯০] মোল্লা আমীর হোসেন, প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠাঃ ৭৭-৭৯। আরও দেখবেন, হাসান হাফিজুর রহমান, *বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধের দলিলপত্র, ৩য় খন্ড,* পৃষ্ঠাঃ ০১।

[১৯১] মোঃ আবুল হোসেন, প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা ঃ ১৬৫।

পর্যায়ে পিস কমিটি গঠন করে।[১৯২] তৎকালীন খুলনা জেলা পিস কমিটির আহবায়ক হন মওলানা এ.কে.এম ইউসুফ।[১৯৩] ১৯ এপ্রিল পাকিস্তানী বাহিনী সাতক্ষীরায় আসার পর পলাশপোল মাঠে মুসলিম লীগ নেতা দিদার বখত খান এর নেতৃত্বে সাতক্ষীরা মহকুমায় পিস কমিটি গঠিত হয়।[১৯৪] কমিটির গঠনতন্ত্র নিম্নরূপঃ

১) সভাপতি	ঃ	আব্দুল বারী খান (রসুলপুর)
২) সহ-সভাপতি	ঃ	এম.এন.এ আব্দুল গফুর (বাটকেখালি)
৩) সেক্রেটারি	ঃ	কাজী শামছুর রহমান (এম.পি)
৪) জয়েন্ট সেক্রেটারি	ঃ	আব্দুল্লাহ হেল বাকী (সুলতানপুর, বুলারাটি)
৫) সদস্য	ঃ	শেখ আব্দুল কাশেম (ঝিকরা)
		সৈয়দ এরশাদ হোসেন (জালালাবাদ)
		এ্যাডভোকেট আনছার আলী (উথুলী) পরবর্তীতে এম.পি
		মোজাহার আলী (পলাশপোল)
		সোলায়মান গাজী (পলাশপোল)
		আবু মসলিম (কাটিয়া)
		ডাঃ আনোয়ার আলী (পলাশপোল)
		ডাঃ সারোয়ার (বাটকেখালী)
		মৌলভী মাজেদ আলী (পুরাতন সাতক্ষীরা)
		আব্দুল গফফার (কুলিয়া)
		শেখ আলী বকস (ছনকা)
		শেখ আবুল হোসেন (নলতা)
		এস.এম. আমজাদ হোসেন (আশাশুনি)
		মকবুল হোসেন (কেয়ারগাতি)
		আব্দুল খালেক মোল্লা (নকিপুর)
		হাজী সহরব আলী (গাবুরা)
		মওলানা আব্দুস সাত্তার (হরিপুর)।

এরপর উপজেলা ও ইউনিয়ন পর্যায়ে যে পিস কমিটি গঠিত হয়েছিল অধিকাংশ ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান ছিলেন উক্ত কমিটির সভাপতি।[১৯৫] পরবর্তীতে এদেরই নেতৃত্বে এদেশীয় লোকদের নিয়ে

---

[১৯২] ঐ।
[১৯৩] ঐ।
[১৯৪] ঐ।

রাজাকার, আলবদর এবং আলশামস বাহিনী গঠন করা হয়। সংক্ষিপ্ত সময়ে তাদের সামরিক প্রশিক্ষণ দিয়ে মুক্তিযোদ্ধাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার জন্য প্রস্তুত করা হয়। রাজাকারদের পাকিস্তানের কেন্দ্রীয় সরকার থেকে ভাতা এবং অস্ত্র প্রদান করা হতো।[১৯৬] ২২ এপ্রিল ১৯৭১ ইসলামী ছাত্র সংঘের ময়মনসিংহ জেলার সভাপতি মোহাম্মাদ আশরাফ হোসাইনের নেতৃত্বে জামালপুরে গঠিত হয়েছিল আলবদর বাহিনী।[১৯৭] এরপর সারাদেশে ইসলামী ছাত্র সংঘের শাখা গুলোকে আলবদর বাহিনীতে রূপান্তর করা হয়। আলবদর বাহিনীর খুলনা জেলার প্রধান ছিলেন মতিউর রহমান খান এবং সাতক্ষীরার প্রধান ছিলেন আবুল বাশার।[১৯৮] ১৯৭১ সালের মে মাসে খুলনা শহরের খানজাহান আলী রোডের একটি আনসার ক্যাম্পে ৯৬ জন জামায়াত ইসলামীর কর্মী নিয়ে আমীর এ.কে.এম ইউসুফের নেতৃত্বে রাজাকার বাহিনী গঠিত হয়।[১৯৯] সাতক্ষীরা মহকুমা রাজাকার বাহিনীর কমান্ডার ছিলেন জয়নুদ্দীন আহমেদ। মহকুমা রাজাকার হেডকোয়ার্টার ইনচার্জ ছিলেন আব্দুল্লাহ হেল বাকী। এই সংগঠনের হেডকোয়ার্টার ছিল সাতক্ষীরা প্রাণনাথ স্কুলে, এটি সাতক্ষীরার প্রথম হাইস্কুল।[২০০]

মুক্তিযুদ্ধে সাতক্ষীরার সেক্টরগত অবস্থান

মুক্তিযুদ্ধকে সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার জন্য সমগ্র বাংলাদেশকে ১১টি সেক্টরে ভাগ করা হয়।[২০১] সাতক্ষীরা ছিল ৮ নং সেক্টর এবং ৯ নং সেক্টরের অধীনে। ৮ নং সেক্টরের দায়িত্ব এবং মেজর এম.এ মঞ্জুর (আগস্ট থেকে ডিসেম্বর) ৮ নং সেক্টরের অধীনে সাতক্ষীরা অঞ্চলের ঘোজাডাঙ্গা ও হাকিমপুর ক্যাম্পের সাব-সেক্টর কমান্ডারগণ যথাক্রমে ক্যাপ্টেন এ.টি.এম সালাউদ্দীন পরবর্তীতে ক্যাপ্টেন মাহাবুব উদ্দীন আহমদ আলফা কোম্পানীর দায়িত্বে ছিলেন।[২০২] ক্যাপ্টেন আজম চৌধুরী এবং ক্যাপ্টেন শফিকুল্লাহ ই কোম্পানীর দায়িত্বে ছিলেন। যারা গ্রুপ কমান্ডারের দায়িত্বে ছিলেন তাদের মধ্যে অন্যতম হলেন, লেঃ আক্তার হোসেন, সুবেদার আব্দুল মালেক, সুবেদার শামসুল হক, সুবেদার আব্দুল জব্বার, সুবেদার তবারক উল্লাহ, সুবেদার আইয়ুব আলী, হাবিলদার গোলাম জিলানী, নায়েক সুবেদার জাহাঙ্গীর, নায়েক গুরফান, হাবিলদার আব্দুল কাদের, সুবেদার আব্দুর সাত্তার, নায়েব সুবেদার ওয়াবদুর রহমান, নামের সুবেদার ইলিয়াস পাটোয়ারী প্রমুখ।[২০৩]

৯ নম্বর সেক্টরের সাতক্ষীরা অঞ্চলের হিঙ্গলগঞ্জ (ভারত) সাব-সেক্টরের কমান্ডার ছিলেন ক্যাপ্টেন এম নুরুল হুদা।[২০৪] শমসের নগরের প্রধান ছিলেন লেঃ মাহফুজ আলম বেগ।[২০৫] টাকী ক্যাম্প সাব-সেক্টর

---

[১৯৫] ঐ।
[১৯৬] ঐ।
[১৯৭] ঐ, পৃষ্ঠা ঃ ১৬৬।
[১৯৮] ঐ।
[১৯৯] ঐ।
[২০০] ঐ।
[২০১] হাসান হাফিজুর রহমান, ঐ, ৩য় খন্ড, পৃষ্ঠাঃ ১০।
[২০২] মোঃ আবুল হোসেন, প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা ঃ ১৬৭।
[২০৩] ঐ।
[২০৪] ঐ।

কমান্ডার ছিলেন ক্যাপ্টেন শাহজাহান মাস্টার ও খুলনা সাব-সেক্টর কমান্ডার ছিলেন গাজী রহমত উল্লাহ দাদু, ক্যাপ্টেন জিয়াউদ্দিন, লেঃ এ.এস.এম শামসুল আরেফিন। এছাড়া হাবিলদার সোবহান, হাবিলদার, আব্দুল গফুর, লেঃ আহসান উল্লাহ, মিজানুর রহমান, সুবেদার আবুল বাশার, শেখ ওয়াহেদুজ্জামান, স.ম বাবর আলী প্রমুখ। ক্যাপ্টেন জিয়াউদ্দিন, এই সেক্টরের সুন্দরবন অঞ্চলে শক্তঘাটি গড়েছিলেন।[২০৬]

স্বাধীন বাংলা ছাত্র সংগ্রাম পরিষদ

মুক্তিযুদ্ধকে গতিশীল করতে স্বাধীন বাংলা ছাত্র সংগ্রাম পরিষদই প্রধান ভূমিকা পালন করে।[২০৭] সাতক্ষীরা অঞ্চলে যারা মুক্তিযোদ্ধাদের সংগঠক হিসাবে দায়িত্ব পালন করেন। তৎমধ্যে আওয়ামী লীগের বর্ষীয়ান নেতা সৈয়দ কামাল বখত সাকী (এম.এন.এ), এ্যাডভোকেট এনতাজ আলী, মীর এশরাক আলী, আব্দুল গফুর (এম.এন.এ) এ্যাডভোকেট মনসুর আহম্মদ, স.ম বাবর আলী, কামরুল ইসলাম খান, মুসতাক আহম্মদ রবি, কাজী কামাল ছটু, আব্দুস সালাম মোড়ল, মোস্তাফিজুর রহমান, গাজী আবুল হোসেন, কামরুল ইসলাম খান, এরশাদ হোসেন খান চৌধুরী (হাবলু), শেখ আবু নাসিম ময়না, শেখ নিজাম উদ্দিন, সকলেই সাতক্ষীরা পৌরসভার বাসিন্দা। এছাড়া শেখ আলিউজ্জামান বাবু (বাঁশদহ), জিল্লুর রহমান মাস্টার (ভাটপাড়া), রফিকুল ইসলাম (পাথরঘাটা)।[২০৮]

তালা উপজেলাঃ

স.ম আলাউদ্দিন (এম.পি.এ), ইঞ্জিনিয়ার শেখ মুজিবুর রহমান (আওয়ামী লীগের সংসদ সদস্য), আলী আহম্মদ, শেখ রেজাউল করিম, অনাথ বন্ধু মন্ডল, সুভাষ চন্দ্র সরকার (অধ্যক্ষ), কল্যাণ চন্দ্র মন্ডল, সৈয়দ খালেদ বখত, সুজায়েদ আলী মাস্টার প্রমুখ।

কলারোয়া উপজেলাঃ

মমতাজ উদ্দীন আহমদ (এম.পি.এ), শিক্ষক নেতা শেখ আমানউল্লাহ, মুসলিম উদ্দিন, মাস্টার আনোয়ার হোসেন, মুহম্মদ রিয়াজ উদ্দীন, এস.এম এমতাজ আলী, ডাক্তার আহম্মদ হোসেন, শ্যামাপদ শেঠ, বি.এম নজরুল ইসলাম, প্রমুখ।

---

[২০৫] ঐ।
[২০৬] ঐ।
[২০৭] মীর মুস্তাক আহমেদ রবি, চেতনায় একাত্তর, জোনাকী প্রকাশনী, ঢাকা, ২০০৮, পৃষ্ঠা ঃ ৫২।
[২০৮] মোঃ আবুল হোসেন, প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা ঃ ৫১।

আশাশুনি উপজেলাঃ

এস.এম নওয়াব আলী (এম.পি), মুহম্মদ আব্দুল হান্নান, এস.এম আব্দুল মজিদ, সিদ্দিক আলী সানা, চেয়ারম্যান আব্দুল ওয়াহাব, নজরুল ইসলাম, চিত্তরঞ্জন বিশ্বাস, প্রমুখ ।

দেবহাটা উপজেলাঃ

লুৎফর রহমান, মাস্টার আজিয়ার রহমান, আতিয়ার রহমান, আব্দুর রহমান দাদু, আব্দুর হাসান সাউদ, আতিয়ার রহমান বিশ্বাস, দেলদার রহমান সরদার, সনৎ কুমার সেন, মুজাহিদ ক্যাপ্টেন শাহজাহান মাস্টার প্রমুখ ।

কালীগঞ্জ উপজেলাঃ

খায়রুল আনাম (এম.পি.এ), মাস্টার জেহের আলী, ডাঃ হযরত আলী আহম্মদ, আসাদুর রহমান খান, রূপচাঁন আলী সরদার প্রমুখ ।

শ্যামনগর উপজেলাঃ

এ.কে ফজলুল হক (এম.পি.এ), দেবীরঞ্জন মন্ডল, শেখ আতিয়ার রহমান, অধ্যক্ষ জি.এম আব্দুল হক, এ্যাডভোকেট নুরুল হক গাইন, বিশ্বনাথ দাস, ডাঃ আব্দুল জলিল, দেবীরঞ্জন বিশ্বাস প্রমুখ ।

মুজিব বাহিনী

মহান স্বাধীনতা যুদ্ধে ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্ট, ই.পি.আর পুলিশ, আনসার ও মুজাহিদ দের নিয়ে গঠন করা হয় M.F অর্থাৎ মুক্তিফৌজ ।[২০৯] সাধারণ বাহিনীর সদস্যদের বলা হত F.F ফ্রিডম ফাইটার্স । শিক্ষিত রাজনৈতিক সচেতন ছাত্র ও যুবকদের ১৯৭১ সালের মে মাসে মুজিব বাহিনী বা Bangladesh Liberation Force (BLF) গঠন করা হয় । এই বাহিনীর সদস্যদের ৪২ দিনের গেরিলা প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয় । খুলনা বিভাগের মুজিব বাহিনীর প্রধান ছিলেন বর্ষীয়ান ছাত্র নেতা তোফায়েল আহমেদ এবং সহ অধিনায়ক ছিলেন কাজী আরেফ আহমেদ ও নূরে আলম জিকু । সাতক্ষীরা মহকুমা মুজিব বাহিনীর প্রধান ছিলেন ইঞ্জিনিয়ার শেখ মুজিবুর রহমান ও ডেপুটি প্রধান ছিলেন ছাত্রনেতা মোস্তাফিজুর রহমান ও আব্দুস সালাম মোড়ল ।[২১০]

[২০৯] মীর মুস্তাক আহমেদ রবি, প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা ঃ ৫১ ।
[২১০] মোঃ আবুল হোসেন, প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা ঃ ১৬৯ ।

১৯৭১ সালের ১৩ আগস্ট মুজিব বাহিনীর প্রশিক্ষণ শেষ করে উনিশ সদস্যের প্রথম দলটি হাকিমপুর সীমান্ত দিয়ে বাংলাদেশের অভ্যন্তরে প্রবেশ করে।[২১১] তাঁদের সাথে ২৫/৩০ জনের এফ.এফ বাহিনীর আর একটি দলও ছিল। বাংলাদেশের অভ্যন্তরে প্রবেশ করে তারা প্রথম ক্যাম্প স্থাপন করে তালা উপজেলার মাগুরা গ্রামের অজয় রায় চৌধুরীর (ঝুনু) বাবুর বাড়িতে।[২১২] মাগুরা ক্যাম্প এর দায়িত্বে ছিলেন ইউনুস আলী ইনু। বাতুয়া ডাঙ্গা ক্যাম্পের দায়িত্বে ছিলেন কামরুজ্জামান টুকু। সাতক্ষীরায় মুজিব বাহিনীর সদস্য সংখ্যা বাড়ার সাথে সাথে বিভিন্ন স্থানে ক্যাম্প স্থাপিত হতে থাকে। প্রত্যেক ক্যাম্পের সাথে যোগাযোগ রক্ষার জন্য ওয়ারলেস এর ব্যবস্থা ছিল।[২১৩] যে সকল স্থানে মুজিব বাহিনীর ক্যাম্প স্থাপিত হয়েছিল সেগুলো নিম্নরূপঃ[২১৪]

১। সুমনডাঙ্গা ক্যাম্প দায়িত্বে ছিল (কাজী রিয়াজ)

২। পাইকপাড়া ক্যাম্প (দেবহাটা) দায়িত্বে ছিল স.ম আশরাফ আলী সরদার।

৩। মাগুরা ক্যাম্প, (তালা) ইউনুচ আলী ইনু।

৪। মুড়াগাছা ক্যাম্প, (তালা), আব্দুস সালাম মোড়ল।

৫। কাশিপুর ক্যাম্প (তালা), আতিয়ার রহমান।

৬। চাঁদকাটি (তালা), শরিফুল ইসলাম।

৭। বাতুয়াডাঙ্গা ক্যাম্প (তালা), ইঞ্জিনিয়ার মুজিবুর রহমান।

৮। বড়দল ক্যাম্প আশাশুনি দায়িত্বে- গৌরপদ।

৯। কেয়ারগাতি ক্যাম্প আশাশুনি- আব্দুল আজিজ সানা ও আব্দুর রউফ।

১০। শাহপুর ক্যাম্পঃ আব্দুর রশিদ ও নাজেম।

১১। শেরে বাংলা ক্যাম্প (প্রতাপনগর) আশাশুনি দায়িত্বে মতিয়ার রহমান।

১২। পানিয়া ক্যাম্প-কালিগঞ্জ দায়িত্বে ছিলেন আসাদুর রহমান।

১৩। ঘুশুড়ি ক্যাম্প- আবুল খায়ের। এছাড়া লক্ষীনাথপুর, বেরামপুর, রাজাপুর, বেলেডাঙ্গা, আটুলিয়া, শ্যামনগর, প্রভৃতি স্থানে মুজিব বাহিনীর ক্যাম্প স্থাপিত হয়। প্রত্যেক ক্যাম্পে ২৫/৩০ জন যোদ্ধা রাখা হতো।

সুন্দরবনের অভ্যন্তরে খিজির আলীর নেতৃত্বে আর একটি ক্যাম্প স্থাপিত হয়। এই ক্যাম্পে মুক্তিযোদ্ধাদের প্রশিক্ষক ছিলেন গাজী রহমত উল্লাহ দাদু।[২১৫] আশাশুনি উপজেলার হেতাল বুনিয়ায় স্থাপিত ক্যাম্পটির নাম করণ করা হয় 'শহীদ কাজল' ক্যাম্প।

---

[২১১] ঐ।
[২১২] ঐ।
[২১৩] ঐ।
[২১৪] ঐ, পৃষ্ঠা ঃ ১৭০।
[২১৫] ঐ, পৃষ্ঠা ঃ ১৭১।

সাতক্ষীরায় মুক্তিযুদ্ধে বামপন্থীদের অবদান

মুক্তিযুদ্ধ চলাকালে ১৯৭১ সালে সারাদেশে কমিউনিস্ট বিপ্লবীদের পূর্ব বাংলা সমন্বয় কমিটির নেতৃত্বে সারা দেশে ১৪ টি ঘাটি অঞ্চল হিসেবে গড়ে ওঠে।[২১৬] সাতক্ষীরার তালা উপজেলার সৈয়দ কামেল বখত্ এর নেতৃত্বে গড়ে ওঠে শক্তিশালী সশস্ত্র বাহিনী।[২১৭] ১৯৭১ সালের ১৫ অক্টোবর তিনি আন্ততায়ীর গুলিতে নিহত হন।[২১৮] কামেল বখত এর মৃত্যুতে দেশ এক সম্ভাবনাময় বিপ্লবীকে হারিয়েছে।

বিপ্লবী আজমল হক ও কমরেড নজির হোসেন খান চৌধুরী টুটুল ১৯৭১ সালের মুক্তিযুদ্ধে তালা অঞ্চলের একটা বাহিনীর নেতৃত্বে ছিলেন।[২১৯] তালা উপজেলার খলিষখালী অঞ্চলে তিনি শক্তিশালী ঘাঁটি স্থাপনে সক্ষম হন। ১৯৭১ সালের ২০ জুলাই তিনি স্বাধীনতার সপক্ষে সাংগঠনিক কার্যপরিচালনা কালে সাতক্ষীরা শহরের একটি গোপন আস্তনায় পাকিস্তানী হানাদার বাহিনীর হাতে ধরা পড়েন। অবর্ণনীয় শারীরিক নির্যাতনের পর তাদের দুই জনকে যশোর সেনা নিবাসে হস্তান্তর করা হয়। দেশ স্বাধীন হওয়ার কিছুদিন পূর্বে জেল থেকে বের করে তাঁদের যশোরের কোন এক নিভৃত বদ্ধভূমিতে হত্যা করা হয়। তাদের লাশের কোন হদিস মেলেনি।[২২০]

প্রদীপ কুমার মজুমদার, ১৯৭০ সালের সাধারণ নির্বাচনে তালা ডুমুরিয়া এলাকা থেকে সংসদ নির্বাচন করেন। মুক্তিযুদ্ধ চলাকালে তিনি উপজেলা সংগ্রাম পরিষদের সাধারণ সম্পাদক ছিলেন।[২২১]

জি.এম. আব্দুল হক: জি.এম. আব্দুল হক ছাত্র জীবনে ছাত্র ইউনিয়নের নেতা হিসেবে সাতক্ষীরা সরকারি কলেজ থেকে রাজনৈতিক জীবন শুরু করেন। ১৯৭১ সালের মুক্তিযুদ্ধে সক্রিয় ভূমিকা পালন করেন। ভারতের ধলচিতা, বসির হাট, দক্ষিণ চব্বিশ পরগনা 'যুব সংবর্ধনা শিবির' এর পলিটিক্যাল মোটিভেটর ছিলেন।[২২১ ক]

সৈয়দ ঈসা: ১৯৬৫ সালে বিএল কলেজের ছাত্র অবস্থায় পূর্ব পাকিস্তান ছাত্র ইউনিয়নে যোগদান করেন। ১৯৬৭ সালে কারা বরণ করেন এসময় তিনি খুলনা জেলা ছাত্র ইউনিয়নের সহ-সাধারণ সম্পাদক ছিলেন। ১৯৭১ সালের স্বাধীনতা যুদ্ধের অন্যতম সংগঠক ছিলেন। তিনি মুক্তিযুদ্ধে সক্রিয় ভাবে অংশগ্রহণ করেন।[২২১ খ]

সৈয়দ দীদার বখত্: ১৯৫৪ সালে একুশে ফেব্রুয়ারী উদ্‌যাপনে নেতৃত্ব দানের জন্য গ্রেফতার হন। ১৯৬২ সালে হামিদুর রহমান শিক্ষা কমিশন বাতিলের আন্দোলনে এবং আইয়ূব বিরোধী আন্দোলনের জন্য

---

[২১৬] হায়দার আকবর খান রনো, স্বাধীনতা যুদ্ধ ও বামপন্থীদের ভূমিকা, মেসবাহ কামাল (সম্পাদিত), প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা ঃ ১৯২।
[২১৭] ঐ।
[২১৮] ঐ, পৃষ্ঠাঃ ২০৪।
[২১৯] ঐ, পৃষ্ঠাঃ ১৯০।
[২২০] মোঃ আবুল হোসেন, প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা ঃ ২৭০।
[২২১] ঐ, পৃষ্ঠা ঃ ২৭৫। [২২১ক] পৃষ্ঠা ঃ ২৪৯ [২২১খ] পৃষ্ঠা ঃ২৭৩ [২২১গ] পৃষ্ঠা ঃ২৪৪

কারাবরণ করেন। ছাত্র জীবনে তিনি দৌলতপুর বিএল কলেজ ছাত্র-ইউনিয়নের সাধারণ সম্পাদক ছিলেন। ১৯৭১ সালে মুক্তিযুদ্ধের অন্যতম সংগঠক ছিলেন। তিনি মুক্তিযুদ্ধের সশস্ত্র সংগঠক শহীদ কামেল বখত্ এর ভাই।[২২১ গ]

মুক্তিযুদ্ধে সাতক্ষীরার বুদ্ধিজীবী

১৯৭১ সালের মুক্তিযুদ্ধ চলাকালে স্বাধীনতাকামী বহু চিকিৎসক মুক্তিযোদ্ধাদের ক্যাম্পে চিকিৎসা সেবা প্রদান করেন।[২২২] তাদের মধ্যে অন্যতম হলেন-

১। ডাঃ রশীদ রেজা (কাটিয়া) সাতক্ষীরা হাকিমপুর ক্যাম্প।

২। ডাঃ হযরত আলী আহমদ (হাড়দ্দহ) কালীগঞ্জ সন্নের বাগান ক্যাম্পের চিকিৎসক।

৩। ডাঃ আব্দুল জলিল (নকিপুর) শ্যামনগর, বনগাঁ এর চাঁদপুর ক্যাম্প।

৪। ডাঃ রফিকুল ইসলাম (আশাশুনি) কাজলগনর ক্যাম্প।

৫। ডাঃ সন্তোষ কুমার (মাগুরা) মুজিব বাহিনী ক্যাম্প।

৬। ডাঃ মোজাম্মেল হক (আচিনতলা) তালা ক্যাম্প।

প্রখ্যাত সাংবাদিক তোয়াব খান (রসুলপুর) স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্রের ভাষ্যকার ছিলেন।[২২৩] তিনি পিন্ডির প্রলাপ, 'রক্তলাল পিন্ডি' এর পাঠক ও লেখক ছিলেন। বিশিষ্ট সাংবাদিক আবেদ খান 'জবাব দাও' অনুষ্ঠান পরিচালনা করতেন। সিকান্দার আবু জাফর (তেঁতুলিয়া-তালা) 'অভিযোগ ইশতেহার' স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র থেকে প্রচারিত হত।[২২৪]

১৯৭১ সালের মে মাসে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের দ্বার ভাঙ্গা বিল্ডিং এ সর্বস্তরের দেশত্যাগী শিক্ষকদের সমাবেশ গঠিত হয় 'বাংলাদেশ শিক্ষক সমিতি' সদস্যের কার্যকরী কমিটিতে অন্যতম ছিলেন শিক্ষক নেতা শেখ আমানুল্লাহ।[২২৫]

সাতক্ষীরায় শহীদ বুদ্ধিজীবীদের মধ্যে যাদের নাম জানা যায় তারা হলেন আইনজীবী কাজী মশরুর আহমেদ, শহীদ সাংবাদিক খন্দকার আবু তালেব, শহীদ ডাঃ কাজী ওবায়দুল হক, শহীদ এস.এম এন্তাজ আলী, শহীদ শেখ আলী আহমেদ, শহীদ আফছার উদ্দীন আহমেদ[২২৬], শহীদ সুখরঞ্জন সমাদ্দার প্রমুখ। সুখরঞ্জন সমাদ্দার, অধ্যাপক, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়, ১৪ এপ্রিল, ১৯৭১ রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় প্রাঙ্গণে পাকিস্তানী হানাদার বাহিনীর হাতে নিহত হন। তিনি কিছুকাল সাতক্ষীরার তালা উপজেলার কে.এম.এস.সি.

---

[২২২] ঐ, পৃষ্ঠা ঃ ১৭৩।
[২২৩] ঐ, ১৭২।
[২২৪] ঐ।
[২২৫] ঐ।
[২২৬] ঐ।
২২৬(ক) সাক্ষাৎকার, শেখ রেজাউল করিম, প্রধান শিক্ষক কে.এম.এস.সি. ইনস্টিটিউশন, তালা, সাতক্ষীরা।

ইনস্টিটিউশনে শিক্ষকতা করেন। রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগারের সামনে তাঁর সমাধি রয়েছে।[২২৬(ক)] এরপর শুরু হয় সশস্ত্র মুক্তিযুদ্ধ যেখানে সাতক্ষীরার মুক্তিসেনারা জীবন বাজি রেখে যুদ্ধ করে।

উপসংহার: ২৫ মার্চ রাতে পাকিস্তানী হানাদার বাহিনী যখন নির্বিচারে গণহত্যা চালায় তখন শেখ মুজিবুর রহমান স্বাধীনতার ঘোষণা দেন। তিনি পাকিস্তানী হানাদার বাহিনীকে মোকাবেলা করার নির্দেশ প্রদান করেন। বাঙ্গালী পুলিশ, ই.পি.আর এবং বামপন্থী রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ শত্রু সেনাদের প্রাথমিক ভাবে প্রতিরোধ করেন। দলে দলে এদেশের কিশোর, যুবক, কৃষক শ্রেণির মানুষ ভারতে গিয়ে দীর্ঘস্থায়ী যুদ্ধের প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেন। তারপর শুরু হয় সশস্ত্র মুক্তিযুদ্ধ।

তৃতীয় অধ্যায়

সশস্ত্র মুক্তিযুদ্ধ

ভূমিকাঃ

পাকিস্তানী হানাদার বাহিনীকে মোকাবেলা কারার জন্য মুজিব বাহিনী, গেরিলা বাহিনী, ভারতের বিভিন্ন ক্যাম্প থেকে প্রশিক্ষণ গ্রহণ করে সশস্ত্র মুক্তিযুদ্ধে যোগদেয় পরবর্তীতে ভারতীয় সেনা বাহিনীর সমন্বয়ে গঠিত হয় মিত্র বাহিনী । বিভিন্ন যুদ্ধে পাকিস্তানী ও রাজাকার বাহিনী পরাজিত হতে থাকে ।

কলারোয়া উপজেলা

৩.১ বেলেডাঙ্গার ভয়াবহ যুদ্ধ

বেলেডাঙ্গা সাতক্ষীরা মহকুমার কলারোয়া উপজেলা থেকে ৯ কিলোমিটার দুরে অবস্থিত একটি সীমান্ত গ্রাম ।[২২৭] এই স্থানে পাকিস্তানী হানাদাররা একটি শক্তিশালী ক্যাম্প স্থাপন করে যেটি বাঙ্কার দিয়ে সুরক্ষিত ছিল । এই ক্যাম্প থেকে বিভিন্ন সময় পাকিস্তানী সেনাও রাজাকারসহ প্যাট্রোলপার্টি স্থানীয় লোকজনের উপর চরম অত্যাচার আর নির্যাতন চালাতো, মেয়েদের ধরে আনতো, গরু ছাগল ধরে আনতো, লুটপাত করতো ।[২২৮] ক্যাপ্টেন শফিউল্লাহ তার 'ই' কোম্পানী নিয়ে ঐ এলাকায় পূর্ব থেকেই যুদ্ধ লিপ্ত ছিলেন ।[২২৯] ব্যাপক রেকীতে খোঁজ-খবরের আলোকে মেজর মঞ্জুরের নির্দেশে ক্যাপ্টেন মাহবুব, ক্যাপ্টেন শফিউল্লাহ, তৌফিক এলাহী বেলেডাঙ্গা ক্যাম্প আক্রমণের মাধ্যমে মিলিটারীদের উৎখাত করার পরিকল্পনা গ্রহণ করেন ।[২৩০] হানাদার বাহিনী পার্শ্ববর্তী হঠাৎগঞ্জে একটা শক্তিশালী ইউনিট স্থাপন করে যেটি আর্টিলারীসহ সকল প্রকার আধুনিক সমরাস্ত্রে সজ্জিত ছিল এবং এখান থেকে মাদরা, কাকডাঙ্গা, বেলেডাঙ্গাসহ পার্শ্ববর্তী অঞ্চলে পাহারা দেয় এবং মুক্তিযোদ্ধাদের বাংলাদেশের অভ্যন্তরে প্রবেশে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে ।[২৩১] ৮ নম্বর সেক্টর কমান্ডার মেজর মঞ্জুর মুক্তিযোদ্ধাদের মূল ঘাঁটি হাকিমপুরে অবস্থান করতেন, এখান থেকে ক্যাপ্টেন শফিউল্লাহ, ক্যাপ্টেন মাহবুব ও তৌফিক এলাহী চৌধুরী বেঙ্গল রেজিমেন্টের সৈনিক, ইপিআর, আর মুক্তিযোদ্ধাদের নিয়ে পাকিস্তানী হানাদার বাহিনী ক্যাম্প ও টহলে হামলা চালাতেন । যুদ্ধটি প্রায় ৭৮ ঘণ্টা

---

[২২৭] স.ম. বাবর আলী, স্বাধীনতার দুর্জয় অভিযান । সাঁকো বাড়ি প্রকাশন, ঢাকা, পৃষ্ঠা ২২০, সাক্ষাৎকার, কামরুজ্জামান বাবু, সাতক্ষীরা । ১৫/০৪/২০১৬ সাতক্ষীরা ।

[২২৮] সাক্ষাৎকার, মোঃ জিয়াদ আলী, কলারোয়া, সাতক্ষীরা । ১৬/০৪/২০১৬ বেলেডাঙ্গা ।

[২২৯] মেজর রফিকুল ইসলাম (অবঃ), দক্ষিণ পশ্চিম রণাঙ্গন- ১৯৭১ । সুচয়নী পাবলিশার্স, ঢাকা, পৃষ্ঠা- ৯৩ ।

[২৩০] সাক্ষাৎকার, মোঃ আবুল হোসেন, কলারোয়া, সাতক্ষীরা । ১৭/০৪/২০১৬ বেলেডাঙ্গা ।

[২৩১] সাক্ষাৎকার, মোঃ আবুল হোসেন, কলারোয়া, সাতক্ষীরা ।

স্থায়ী হয়।[২৩২] ১৬ সেপ্টেম্বর ভোর রাত ৪টায় প্রায় ১৫০ জন মুক্তিযোদ্ধাসহ নিয়মিত সৈনিক, ইপিআর বাহিনীর এক শক্তিশালী বাহিনী নিয়ে ক্যাপ্টেন মাহবুব ও শফিউল্লাহ বেলেডাঙ্গা মিলিটারী ক্যাম্পে আক্রমণ চালায়।[২৩৩] মিলিটারী যাতে বেলেডাঙ্গা ক্যাম্পে যোগ দিয়ে তাদের শক্তি বৃদ্ধি করতে না পারে সে জন্য মুক্তিযোদ্ধা কমান্ডার মোসলেমের নেতৃত্বে ৫০ জন মুক্তিযোদ্ধা বাগআঁচড়া থেকে মিলিটারী আসার রাস্তা পাহারা দেবার দায়িত্ব নেয় এবং তাদের প্রতিহত এবং ধ্বংস করে দেবার জন্য ৪টা এল.এম.জি, ১২টা এস.এল.আর ২ ইঞ্চি মর্টার, রাইফেল এবং গ্রেনেডের ব্যবস্থা করা হয়।[২৩৪] প্রতি ১০ জনের মধ্যে একজন ছিলেন এলএমজি ম্যান। অপরদিকে কমান্ডার আব্দুল গাফফারের নেতৃত্বে অস্ত্রশস্ত্র সজ্জিত ৪০ জনের একটি শক্তিশালী দল মিলিটারীদেরকে প্রতিহত করার জন্য কলারোয়া-কোমরপুর রাস্তা বন্ধ করে দেয়।[২৩৫] ইপিআর সুবেদার তাবারক উল্লাহ, ইপিআর হাবিলদার ইলিয়াস পাটোয়ারিসহ একটি শক্তিশালী কোম্পানী ক্যাপ্টেন মাহবুব ও ক্যাপ্টেন শফিউল্লাহ'র নেতৃত্বে বেলেডাঙ্গা ক্যাম্পের শক্তিশালী হানাদার বাহিনীর শিবিরে আক্রমণ পরিচালনা করে।[২৩৬] ক্যাম্পের শক্তি, অস্ত্রশস্ত্র, গোয়েন্দার রিপোর্টের চেয়েও প্রায় দ্বিগুণ ছিল। ফলে দুর্ধর্ষ পাকিস্তানী বাহিনী ব্যাপকভাবে গোলাবর্ষণ করতে থাকে এবং এ অবস্থায় মুক্তিযোদ্ধাদের শক্তিশালী অবস্থানে থাকা কঠিন ব্যাপার হয়ে দাড়ায়। তবে মুক্তি বাহিনী বেলেডাঙ্গার একটি পুকুর পাড়ের তেঁতুল গাছের নীচে একটি শক্তিশালী ডিফেন্স গঠন করে এবং এখান থেকে পাকিস্তানী হানাদার বাহিনীর উপর আক্রমণ পরিচালনা করতে থাকে।[২৩৭] পাকিস্তানী সেনারা যাতে বৈকারী ত্যাগ করে এই উদ্দেশ্যে মেজর মঞ্জুর, কমান্ডার নাছির ও আব্দুস সাত্তারের নেতৃত্বে প্রায় ৬০ জন শক্তিশালী মুক্তিযোদ্ধা বৈকারী ক্যাম্প আক্রমণ করে।[২৩৮] ভারতীয় বাহিনীর নেতৃত্বে থাকা কর্ণেল নায়ার মুক্তিবাহিনীকে আর্টিলারী সাপোর্ট দেয় এবং মেজর মঞ্জুরের সাথে যৌথভাবে যুদ্ধ পরিচালনা করতে থাকে এবং গোলাগুলি আর শেলিংয়ের শব্দে প্রায় ১০-১২ কিলোমিটার পর্যন্ত এক ভয়াবহ অবস্থা বিরাজ করতে থাকে। বেলেডাঙ্গা যুদ্ধে হাবিলদার দুদু মিয়া, সুবেদার আব্দুল মালেক, হাবিলদার আব্দুল ওয়াদুদ, নায়েক গোফরান দুঃসাহসিক ভূমিকা পালন করেন।[২৩৯] স্থানীয়দের মধ্যে আরও যারা ছিলেন তারা হলেন- মোঃ রেজাউল হক, নাছির উদ্দিন, আব্দুল মাজেদ (যুদ্ধাহত), আইয়ুব আলী ওয়াজেদ আলী, আবুল হোসেন, আব্দুল জব্বার, মুসা আলী, এমাদুল হক (শহীদ), জায়েদ আলী, আব্দুল মালেক (যুদ্ধাহত), ইঞ্জিনিয়ার আমির আলী, ছায়েদ আলী (যুদ্ধাহত), আকবর আলী, চিত্তরঞ্জন বিশ্বাস, আশরাফ আলী, মহসিন

---

[২৩২] সাক্ষাৎকার,মোঃ আবুল হোসেন, কলারোয়া, সাতক্ষীরা। পৃষ্ঠা- ৯৪।
[২৩৩] সাক্ষাৎকার, আব্দুল জব্বার মোড়ল, কলারোয়া, সাতক্ষীরা।
[২৩৪] সাক্ষাৎকার, প্রফেসর ড. এম.এ বারী, সহকারী কমান্ডার, বাংলাদেশ মুক্তিযোদ্ধা সংসদ, সাতক্ষীরা জেলা ইউনিট কমান্ড। ১৭/০৪/২০১৬ সাতক্ষীরা।
[২৩৫] সাক্ষাৎকার, দেবী রঞ্জন মন্ডল, কমান্ডার, বাংলাদেশ মুক্তিযোদ্ধা সংসদ, শ্যামনগর উপজেলা কমান্ড, সাতক্ষীরা।
[২৩৬] স.ম. বাবর আলী, 'প্রাগুক্ত' ও সাক্ষাৎকার, মুক্তিযোদ্ধা মোঃ আবুল হোসেন, কলারোয়া, সাতক্ষীরা।
[২৩৭] সাক্ষাৎকার, মুক্তিযোদ্ধা মোঃ আবুল হোসেন, কলারোয়া, সাতক্ষীরা।
[২৩৮] সাক্ষাৎকার, মুক্তিযোদ্ধা মোঃ আবুল হোসেন, কলারোয়া, সাতক্ষীরা।
[২৩৯] রফিকুল ইসলাম 'প্রাগুক্ত' পৃষ্ঠা- ৯৪।

আলী, হরনাথ ঘোষ, হাবিলদার সিরাজ, হাবিলদার আব্দুল কাদের, রবিউল ইসলাম, মাস্টার আতিয়ার রহমান, আলতাফ হোসেন প্রমুখ।[২৪০] পাকিস্তানী বাহিনী বেপরোয়াভাবে মুক্তিবাহিনীর উপর গোলাবর্ষণ করতে থাকে এবং ১৮/১৯ সেপ্টেম্বর পাকিস্তানীদের গোলার আঘাতে ক্যাপ্টেন শফিউল্লাহ গুরুতর আহত হন। ফলে মুক্তিযোদ্ধারা দারুনভাবে আতঙ্কিত হয়ে পড়ে এবং এই অবস্থায় জাকারিয়া, এমাদুল হক, শফিক চৌধুরীসহ মোট ২৭ জন মুক্তিযোদ্ধা প্রাণপণে যুদ্ধ করতে করতে প্রাণ দেয়।[২৪১] এদিকে সুবেদার তবারক উল্লাহ পাকিস্তানী বাহিনীর অগ্রগতিকে থামাতে প্রাণপণে যুদ্ধ করতে থাকে এবং এক সময় পাকিস্তানী বাহিনী তবারক উল্লাহকে ঘিরে ফেলে।[২৪২] নিজের জীবন বাজি রেখে মুক্তিযোদ্ধাদের জীবন বাঁচিয়ে ইতিহাসে তিনি অমর হয়ে আছেন। এদিকে নায়েক সুবেদার ইলিয়াস পাটোয়ারী এবং মোসলেমের দৃঢ় নেতৃত্বে পাকিস্তানী সেনাদের বিপাকে ফেলে দেয় এবং তারা পিছু হাটতে বাধ্য হয়।[২৪৩] ১৮-১৯ সেপ্টেম্বর যুদ্ধের ভয়াবহতা ব্যাপক ছিল এবং এখানে বীর মুক্তিযোদ্ধা আব্দুস সাত্তার (রাজশাহী), মারাত্মকভাবে আহত হন এবং তাকে ভারতে নেওয়ার পথে প্রচুর রক্তক্ষরণে শাহাদত বরণ করেন।[২৪৪] অন্যদিকে পাকিস্তানী বাহিনী যশোর থেকে আনা সমরাস্ত্র ও সৈন্য সজ্জিত হয়ে মুক্তিযোদ্ধাদের উপর আক্রমণ চালাতে থাকে।[২৪৫] কিন্তু মুক্তিযোদ্ধাদের সাপ্লাই লাইন অচল ও গোলাবারুদের রসদ শেষ হয়ে যেতে থাকে এবং তারা গ্রুপ গ্রুপ বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে। ক্যাপ্টেন শফিউল্লাহ আহত হবার কারণে ক্যাপ্টেন মাহবুব দায়িত্ব গ্রহণ করেন এবং শফিউল্লাহকে মুক্তিবাহিনীর ক্যাম্পে এনে সুচিকিৎসার ব্যবস্থা করা হয়।[২৪৬] পঞ্চম দিনে যুদ্ধের ভয়াবহতা আরও মারাত্মক আকার ধারন করে যেটি মুক্তিবাহিনীর মধ্যে হতাশা সৃষ্টি করে। নায়েক সুবেদার ইসমাইল হোসেন ফায়ারিং ব্যাপকতা দেখে তার দায়িত্বে থাকা কাট অফ পার্টি প্রত্যাহার করে।[২৪৭] কিন্তু মেজর মঞ্জুর ও ক্যাপ্টেন মাহবুব দক্ষতার সাথে যুদ্ধ পরিচালনা করতে থাকে এবং পশ্চাদপসারণে সিদ্ধান্ত নেয়।[২৪৮] একটা পর্যায় যুদ্ধরত অবস্থায় ক্যাপ্টেন মাহবুব গুরুতর আহত হন এবং যুদ্ধক্ষেত্র ত্যাগ করতে বাধ্য হন।[২৪৯] জাহাঙ্গীর হাবিলদার ও তার বাহিনীর অসীম সাহসিকতায় মুক্তিযোদ্ধারা নিরাপদ স্থানে অবস্থান করতে সক্ষম হয় কিন্তু সুবেদার তবারক উল্লাহ অসম সাহসিকতার সাথে শত্রু নিধন করতে করতে পাকিস্তানী সেনাদের কাছে ধরা পড়েন।[২৫০] এছাড়া বোয়ালিয়া গ্রামের আব্দুল মালেক পিতা আব্দুল মাজিদ পাকিস্তানী সেনাদের হাতে ধরা পড়েন এবং তাদের উপর পাকিস্ত

---

[২৪০] 'বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ' ৭ম খন্ড। বাংলাদেশ সেনাবাহিনী, এশিয়া পাবলিকেশন্স, ঢাকা।
[২৪১] 'বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ' ৭ম খন্ড। বাংলাদেশ সেনাবাহিনী, এশিয়া পাবলিকেশন্স, ঢাকা।
[২৪২] সাক্ষাৎকার, মোঃ আবুল হোসেন, সহকারী কমান্ডার, বাংলাদেশ মুক্তিযোদ্ধা সংসদ, কলারোয়া উপজেলা কমান্ড, সাতক্ষীরা।
[২৪৩] সাক্ষাৎকার, মোস্তফা নুরুল আলম, নারকেলতলা, সাতক্ষীরা।
[২৪৪] স.ম. বাবর আলী, 'প্রাগুক্ত' পৃষ্ঠা- ২২১।
[২৪৫] স.ম. বাবর আলী, 'প্রাগুক্ত' পৃষ্ঠা- ২২২।
[২৪৬] স.ম. বাবর আলী, 'প্রাগুক্ত' ও সাক্ষাৎকার মোসলেম আলী হাজরা, কেঁড়াগাছি, কলারোয়া, সাতক্ষীরা। ১৫/০৪/২০১৬ কেঁড়াগাছি।
[২৪৭] সাক্ষাৎকার মোসলেম আলী হাজরা, কেঁড়াগাছি, কলারোয়া, সাতক্ষীরা।
[২৪৮] সাক্ষাৎকার, মোঃ আব্দুল জব্বার। ১৫/০৪/২০১৬ বেলেডাঙ্গা।
[২৪৯] সাক্ষাৎকার, মোঃ আব্দুল জব্বার।
[২৫০] সাক্ষাৎকার, মোঃ আবুল হোসেন।

ানী সেনারা অমানুষিক নির্যাতন চালাতে থাকে। স্বাধীনতার পর তাদের সবাইকে যশোর ক্যান্টনমেন্ট থেকে উদ্ধার করা হয় কিন্তু আব্দুল মালেক খান সেনাদের অত্যাচারে মানষিক ভারসাম্য হারিয়ে ফেলে।[২৫১] অসম সাহসিকতার জন্য সুবেদার তবারক উল্লাহকে বীর বিক্রম খেতাবে ভূষিত করা হয়।[২৫২] অবশেষে পাকিস্তানী বাহিনীদের গোলাগুলি থেমে গেলে মোসলেমসহ অন্যান্য মুক্তিযোদ্ধারা নিরাপদ স্থানে একত্রিত হয়।[২৫৩] এই ভয়াবহ যুদ্ধে প্রায় ২৭ জন মুক্তিযোদ্ধা শহীদ হয়েছে যেটা মুক্তিযোদ্ধাদের বেশ হতাশ করে দেয়।[২৫৪] কিন্তু সহযোদ্ধাদের রক্তের প্রতিশোধের অন্বেষণায় শুরু হয় আবার নতুন নতুন আক্রমণ। স্থানীয় একজন ওয়াপদা প্রকৌশলী জানিয়েছেন, বেলেডাঙ্গার এই যুদ্ধে প্রায় পাকিস্তানীদের ২ জন অফিসার এবং ৭৩ জন সৈন্য নিহত হয়েছে।[২৫৫] আর যেসব মুক্তিযোদ্ধারা শহীদ হন তারা হলেন- লেঃ নায়েক হাসেম ইপিআর, মুনসুর আলীসহ মোট ২৭ জন।[২৫৬] বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাসে বেলেডাঙ্গার যুদ্ধ এক অবিস্মরণীয় ইতিহাস হয়ে থাকবে।

কলারোয়া উপজেলা

৩.২ ইলিশপুর রাজাকার ক্যাম্প অপারেশন

কলারোয়া উপজেলার কেরালকাতা ইউনিয়নের ইলিশপুর কাউন্সিল অফিসে রাজাকাররা একটি শক্তিশালী ক্যাম্প গঠন করেছিল।[২৫৭] এই ক্যাম্পে রাজাকাররা দিন দিন উশৃঙ্খল হয়ে উঠে এবং তাদের অত্যাচারে গ্রামগুলোর সাধারণ মানুষের জীবন অসহনীয় হয়ে উঠে। একদল গ্রামবাসী গোপনে এ খবর মুক্তিবাহিনীর ক্যাম্পে পৌছে দেয়। সুতরাং মুক্তিযোদ্ধারা আর কালবিলম্ব না করে উক্ত রাজাকার ক্যাম্প আক্রমণের চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। আব্দুল গফফার ও মোসলেমের যৌথ নেতৃত্বে ২৫ জনের এক বাহিনী নিয়ে ইলিশপুর রাজাকার ক্যাম্প সমূলে উৎখাত করার পরিকল্পনা করেন।[২৫৮] সম্ভবতঃ সেপ্টেম্বর মাসের মধ্যভাগে চন্দনপুর ক্যাম্প থেকে অন্ধকার রাতে কমান্ডার মোসলেম উদ্দিন ও কমান্ডার আব্দুল গফফারের নেতৃত্বে একদল মুক্তিযোদ্ধা ইলিশপুরে পৌছায়।[২৫৯] চারিদিকে অন্ধকার আর কর্দমাক্ত রাস্তার কারণে তাদের পৌছাতে কিছুটা বিলম্ব হয়। গোপনে গোয়েন্দাদের দেওয়া খবরে জানা যায় মাত্র ২০ জন রাজাকার আছে।[২৬০] এদিকে আবার

---

[২৫১] সাক্ষাৎকার, মোঃ গোলাম মোস্তফা, কমান্ডার, বাংলাদেশ মুক্তিযোদ্ধা সংসদ, কলারোয়া উপজেলা কমান্ড, সাতক্ষীরা।
[২৫২] সাক্ষাৎকার, সহকারী কমান্ডার, বাংলাদেশ মুক্তিযোদ্ধা সংসদ, জেলা ইউনিট কমান্ড, সাতক্ষীরা।
[২৫৩] সাক্ষাৎকার, সহকারী কমান্ডার, বাংলাদেশ মুক্তিযোদ্ধা সংসদ, জেলা ইউনিট কমান্ড, সাতক্ষীরা।
[২৫৪] স.ম. বাবর আলী, 'প্রাগুক্ত' পৃষ্ঠা- ২২২।
[২৫৫] স.ম. বাবর আলী, 'প্রাগুক্ত' ও সাক্ষাৎকার, মোসলেম উদ্দীন হাজরা, কেঁড়াগাছী।
[২৫৬] স.ম. বাবর আলী, 'প্রাগুক্ত' ও সাক্ষাৎকার, মোসলেম উদ্দীন হাজরা, কেঁড়াগাছী। পৃষ্ঠা- ২২৩।
[২৫৭] সাক্ষাৎকার, মোঃ গোলাম মোস্তফা, কলারোয়া, সাতক্ষীরা।
মোঃ আবুল হোসেন, 'সাতক্ষীরা জেলার ইতিহাস', কাকলি পাবলিশার্স, খুলনা, ২০১১। পৃষ্ঠা- ১৮৬।
[২৫৮] সাক্ষাৎকার, সৈয়দ আলী গাজী, কলারোয়া, সাতক্ষীরা। ১৫/০৪/২০১৬ ইলিশপুর।
[২৫৯] সাক্ষাৎকার, সৈয়দ আলী গাজী, কলারোয়া, সাতক্ষীরা।
[২৬০] স.ম. বাবর আলী, 'প্রাগুক্ত' পৃষ্ঠা- ২৪৩।

রাজাকারদের সবার কাছে অস্ত্র নাই জেনে মুক্তিযোদ্ধারা অনেক আনন্দিত হয়।[২৬১] রাত প্রায় ১২টার পরে কমান্ডারের নির্দেশে গোলাগুলি শুরু হয়। অন্যদিকে রাজাকাররা পাল্টা জবাব দিতে থাকে।[২৬২] রাজাকারদের মধ্যে ৪/৫ জন সাহসী ছিল যারা বেশ কয়েক ঘন্টা ধরে যুদ্ধ চালিয়ে যায়।[২৬৩] মুক্তিযোদ্ধাদের প্রচন্ড আক্রমণে শত্রুপক্ষ পরাস্ত হয় এবং মুক্তিযোদ্ধা ক্যাম্প ঘেরাও করে রাজাকারদের আত্মসমর্পন করতে বাধ্য করে।[২৬৪] এদিকে মুক্তিবাহিনী যুদ্ধ করতে করতে ক্যাম্প ঘিরে ফেলে অন্যথায় রাজাকারদের পালাবার পথ বন্ধ হয়ে যায় এবং প্রায় দু ঘন্টা যুদ্ধ চলার পর অস্ত্রসহ ৫ জন রাজাকার মুক্তিযোদ্ধাদের কাছে আত্মসমর্পন করে এবং বাকী রাজাকাররা ক্যাম্পে অস্ত্র ফেলে পালিয়ে জীবন রক্ষা করে।[২৬৫] ইলিশপুর ক্যাম্পে অভিযান সফলভাবে সম্পন্ন হওয়ায় মুক্তিযোদ্ধারা অনেক উল্লাসিত হয় এবং ইলিশপুর ক্যাম্প চিরকালের জন্য রাজাকার মুক্ত হয়। ইলিশপুর ক্যাম্পের অভিযান ছিল মুক্তিযোদ্ধাদের বীরত্বে গাথা অভিযান। অভিযানে যে সমস্ত বীর মুক্তিযোদ্ধা প্রাণপণ লড়াই করেছিলেন তাদের মধ্যে মোঃ গোলাম মোস্তফা, মোঃ রবিউল ইসলাম, মোঃ আব্দুল জব্বার, মোঃ এবাদুল্লাহ, নজিবর রহমান, সুরত আলী, সৈয়দ আলী গাজী অন্যতম।[২৬৬]

কলারোয়া উপজেলা

৩.৩ হিজলদি আক্রমণ

হিজলদি কলারোয়া উপজেলার অন্তর্গত একটি গ্রাম যেখানে ১৯৭১ সালে পাকিস্তানী বাহিনী একটি ক্যাম্প স্থাপন করে।[২৬৭] এই গ্রামে ২৭ আগষ্ট পাকিস্তানী বাহিনীর সাথে মুক্তিযোদ্ধাদের এক খন্ড যুদ্ধ সংঘটিত হয় এবং এই যুদ্ধে বেশ কয়েকজন পাকিস্তানী সেনানিহত হয়েছিল।[২৬৮] মুক্তিযোদ্ধাদের দুঃসাহসিক অভিযানে পাকিস্তানী বাহিনী পরাজিত হয় এবং পালিয়ে যেতে বাধ্য হয়। এদিকে হিজলদি এলাকা থেকে পাকিস্তানী বাহিনী নিধনের পর পার্শ্ববর্তী চন্দনপুর হাইস্কুলে মুক্তিবাহিনী একটি ক্যাম্প স্থাপন করে।[২৬৯] পরবর্তীতে ঐ ক্যাম্প থেকে মুক্তিযোদ্ধারা কলারোয়া ও বাগআঁচড়াসহ বেশ কয়েকটি এলাকায় যুদ্ধ পরিচালনা করে। এই আক্রমণে যে সমস্ত মুক্তিযোদ্ধা নেতৃত্ব দিয়েছিলেন তাদের মধ্যে মোঃ আব্দুল জব্বার, মোঃ গোলাম মোস্তফা অন্যতম।[২৭০]

---

[২৬১] সাক্ষাৎকার, মোঃ আব্দুল জব্বার। ১৫/০৪/২০১৬ ইলিশপুর।
[২৬২] সাক্ষাৎকার, মোঃ আব্দুল জব্বার।
[২৬৩] মোঃ আবুল হোসেন, 'প্রাগুক্ত' পৃষ্ঠা- ১৮৬।
[২৬৪] সাক্ষাৎকার, মোঃ গোলাম মোস্তফা। ১৫/০৪/২০১৬ ইলিশপুর।
[২৬৫] সাক্ষাৎকার, মোঃ গোলাম মোস্তফা।
[২৬৬] সাক্ষাৎকার, মোঃ গোলাম মোস্তফা।
[২৬৭] মোঃ আবুল হোসেন, 'প্রাগুক্ত' পৃষ্ঠা- ১৮৬। ১৭/০৪/২০১৬ হিজলদি।
[২৬৮] সাক্ষাৎকার, মোঃ আব্দুল জব্বার।
[২৬৯] সাক্ষাৎকার, মোঃ গোলাম মোস্তফা।
[২৭০] সাক্ষাৎকার, মোঃ গোলাম মোস্তফা।

কলারোয়া উপজেলা

৩.৪ খোরদো যুদ্ধ

খোরদো গ্রামটি কলারোয়া উপজেলার অন্তর্গত একটি গ্রাম যেখানে ক্যাপ্টেন শফিউল্লাহ, কমান্ডার গফফার ও কমান্ডার মোসলেমের নেতৃত্বে মুক্তিবাহিনী পাকিস্তানী সেনাদের উপর আক্রমণ করে।[২৭১] মুক্তিবাহিনী তিনটি দলে বিভক্ত হয় যার প্রথমটি ক্যাপ্টেন শফিক উল্লাহর নেতৃত্বে প্রায় ৩০/৩৫ জনের একটি দল অভয়নগরের দিক থেকে এসে ত্রিমোহনী পার হয়ে খোরদো আসে এবং এদের অদিকাংশই ইপিআর আর বাকী মুক্তিযোদ্ধা।[২৭২] কমান্ডার গফফারের নেতৃত্বে ২য় দল কাঠালতলা থেকে কপোতাক্ষ নদী পার হয়ে খোরদো গ্রামে আসে।[২৭৩] অন্যদিকে কমান্ডার মোসলেমের নেতৃত্বে ৩০/৩৫ জনের তৃতীয় দলটি বেলা ১১ টার মধ্যে রাইটা-আলিপুর পার হয়ে খোরদো পৌছায়।[২৭৪] লক্ষ্য ছিল পাকিস্তানী সেনাদের সাহায্যকারী একটি ধনী দালালের একটি পাটের গুদাম (JMC- সরকারি পাঠক্রয় কেন্দ্রে) আগুন লাগিয়ে দেওয়া।[২৭৫] এ আক্রমণ সফলভাবে সম্পন্ন করে তবে ইতোমধ্যে পাকিস্তানী বাহিনী কলারোয়া থেকে খবর পেয়ে চলে আসে এবং প্রচন্ড যুদ্ধ শুরু হয়। বেশ কয়েক ঘন্টা ধরে যুদ্ধ চলে এবং মুক্তিবাহিনীর সকল দলই ধীরে ধীরে পশ্চাদপসরণ করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে।[২৭৬] এরপর মোসলেম ও তার নেতৃত্বে মুক্তিবাহিনীর দলটি উলুডাঙ্গা দিক থেকে চন্দনপুর ক্যাম্পে ফিরে আসে।[২৭৭] অন্যদিকে ক্যাপ্টেন শফিউল্লাহ বাটরা গ্রামের অন্তর্গত ইউপি মেম্বার শহিদুল ইসলামের বাড়িতে এসে আশ্রয় গ্রহণ করে।[২৭৮] এদিকে কমান্ডার গফফার ও তার দল অভয়নগরে ফিরে এল। গফফারের নেতৃত্বে দলে আরও ছিলেন গোলাম মোস্তফা, আবুল হোসেন, এ,জেড নজরুল ইসলাম, এবাদুল্লাহ, নজিবর রহমান, পরিতোষ, সন্তোষ সরকার প্রমুখ।[২৭৯] এই যুদ্ধে পাকিস্তানী সেনা ও রাজাকারদের মধ্যে থেকে কয়েকজন মারাত্মকভাবে আহত হয় এবং ৪/৫ জন মুক্তিযোদ্ধা সামান্য আঘাত পায়।[২৮০] তবে এই যুদ্ধে হৃদয় বিদারক করা ঘটনা হল ওমর আলী নামে একটি ছেলে পাকিস্তানী সেনাদের হাতে ধরা পড়ে থাকে পাকিস্তানী হানাদার অমানুষিক অত্যাচার নির্যাতন করে। যার ফলে সে পাগল হয়ে যায় এবং আর কোনদিন সে স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরে আসেনি।[২৮১]

---

[২৭১] স.ম. বাবর আলী, 'প্রাগুক্ত' পৃষ্ঠা ২৪৪। ১৭/০৫/২০১৬ খোরদো।
[২৭২] স.ম. বাবর আলী, 'প্রাগুক্ত' পৃষ্ঠা ২৪৪। ও সাক্ষাৎকার, মোঃ গোলাম মোস্তফা।
[২৭৩] স.ম. বাবর আলী, 'প্রাগুক্ত' পৃষ্ঠা ২৪৪। ও সাক্ষাৎকার, মোঃ আবুল হোসেন।
[২৭৪] স.ম. বাবর আলী, 'প্রাগুক্ত' পৃষ্ঠা ২৪৪। ও সাক্ষাৎকার, মোঃ আবুল হোসেন।
[২৭৫] সাক্ষাৎকার, মোঃ গোলাম মোস্তফা, কমান্ডার, বাংলাদেশ মুক্তিযোদ্ধা সংসদ, কলারোয়া উপজেলা কমান্ড, সাতক্ষীরা।
[২৭৬] সাক্ষাৎকার, মোঃ গোলাম মোস্তফা, কমান্ডার, বাংলাদেশ মুক্তিযোদ্ধা সংসদ, কলারোয়া উপজেলা কমান্ড, সাতক্ষীরা।
[২৭৭] সাক্ষাৎকার, মোঃ গোলাম মোস্তফা, কমান্ডার, বাংলাদেশ মুক্তিযোদ্ধা সংসদ, কলারোয়া উপজেলা কমান্ড, সাতক্ষীরা।
[২৭৮] সাক্ষাৎকার, মোঃ গোলাম মোস্তফা, কমান্ডার, বাংলাদেশ মুক্তিযোদ্ধা সংসদ, কলারোয়া উপজেলা কমান্ড, সাতক্ষীরা।
[২৭৯] স.ম. বাবর আলী, 'প্রাগুক্ত' পৃষ্ঠা ২৪৫।
[২৮০] স.ম. বাবর আলী, 'প্রাগুক্ত' ও সাক্ষাৎকার, মোঃ আবুল হোসেন। ১৭/০৫/২০১৬ খোরদো।
[২৮১] স.ম. বাবর আলী, 'প্রাগুক্ত' ও সাক্ষাৎকার, মোঃ আবুল হোসেন।

কলারোয়া উপজেলাঃ

৩.৫ যশোর সাতক্ষীরা মহাসড়কের পাঁচটি ব্রিজ ধ্বংসের দুঃসাহসিক অভিযান

কলারোয়া উপজেলা, যশোর ও সাতক্ষীরা প্রধান সড়কে অবস্থিত হওয়ায় এটি গুরুত্বপূর্ণ অঞ্চল হিসেবে পরিচিত।[২৮২] এই বাজারটি ভারত সীমান্তের কাছাকাছি হওয়ার কারণে পাকিস্তানী সেনারা এর উপর বিশেষ গুরুত্বারোপ করে বাগআঁচড়া ইউনিয়ন পরিষদে রাজাকার, মিলিটারী ঘাঁটি স্থাপন করে এবং প্রায়ই পাকিস্তানী সেনারা এখানে এসে রাত যাপন করে।[২৮৩] ফলে রাজাকার, পাকিস্তানী সেনাও মিলিশিয়াদের অত্যাচারে সাধারণ মানুষ, দোকানদার, বাজারের ব্যবসায়ী অতিষ্ট হয়ে উঠে। রাজাকাররা প্রায়ই নারী নির্যাতন করতো, কৃষকের গরু ছাগল ধরে আনত, সাধারণ মানুষকে অকারণে মারধর, দোকান থেকে জিনিসপত্র কিনে টাকা না দেওয়া ইত্যাদি অমানবিক কাজকর্ম করতে থাকে।[২৮৪] পাকিস্তানী সেনারা যাতে যশোর থেকে সাতক্ষীরায় শক্তি বৃদ্ধি না করতে পারে তার জন্য পথের ব্রিজগুলো উড়িয়ে দেয়ার সিদ্ধান্ত নেয়।[২৮৫] সোনাবাড়ি ব্রিজঃ এটি যশোর-সাতক্ষীরা রোডের উপর অবস্থিত একটি ব্রিজ। ব্রিজটি এক্সপ্লোসিভ মাইন দিয়ে উড়িয়ে দেয়া হয়।[২৮৬] ব্রজবাকসা কলারোয়া থেকে উত্তরে অবস্থিত একটি গুরুত্বপূর্ণ বাজার। এখানকার ব্রিজটি উড়িয়ে দেয়া হয়।[২৮৭] ব্রজবাকসা বাজারের স্থানীয় রাজাকার বাহিনী মুক্তিযোদ্ধাদের বাড়িতে গিয়ে অত্যাচার করতে থাকে।[২৮৮] ইলিশপুর বাজারের একটি রাজাকারদের টর্সার সেল ছিল।[২৮৯] এখানে সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের মেয়েদের ধরে এনে জোর পূর্বক ধর্ষণ করা হত। ২০-২৫ জন রাজাকার এই ক্যাম্পে সর্বদা অবস্থান করত।[২৯০] মাঝে মধ্যে পাকিস্তানী সেনারা এখানে অবস্থান করলে পাশ্ববর্তী এলাকা থেকে গরু ছাগল ধরে এনে জবাই করে ফেলত।[২৯১] ইলিশপুর ব্রিজটি ধ্বংস করে দেয়া হয়।[২৯২] রাইটা আলাইপুর ব্রিজটি যশোর সাতক্ষীরা মহাসড়কে অবস্থিত।[২৯৩] মোঃ গোলাম মোস্তফার নেতৃত্বে একটি দল এই ব্রিজটি ধ্বংস করে।[২৯৪] সলিমপুর ব্রিজটিও একই সড়কে অবস্থিত।[২৯৫] এই ব্রিজটিও এফ.এফ বাহিনীর সদস্যরা ধ্বংস করে দেয়।[২৯৬] উপযুক্ত ৫টি

---

[২৮২] সাক্ষাৎকার, মোঃ আইয়ুব আলী, বোয়ালিয়া, কলারোয়া, সাতক্ষীরা। উপজেলা ডেপুটি কমান্ডার, সাতক্ষীরা মুক্তিযোদ্ধা সংসদ।
[২৮৩] সাক্ষাৎকার, মোঃ আইয়ুব আলী, বোয়ালিয়া, কলারোয়া, সাতক্ষীরা। উপজেলা ডেপুটি কমান্ডার, সাতক্ষীরা মুক্তিযোদ্ধা সংসদ।
[২৮৪] স.ম. বাবর আলী, 'প্রাগুক্ত' পৃষ্ঠা ২৫১।
[২৮৫] সাক্ষাৎকার, মোঃ গোলাম মোস্তফা, কমান্ডার, কলারোয়া উপজেলা মুক্তিযোদ্ধা সংসদ। ১৭/০৫/২০১৬ কলারোয়া।
[২৮৬] সাক্ষাৎকার, মোঃ গোলাম মোস্তফা, কমান্ডার, কলারোয়া উপজেলা মুক্তিযোদ্ধা সংসদ।
[২৮৭] সাক্ষাৎকার, মোঃ গোলাম মোস্তফা, কমান্ডার, কলারোয়া উপজেলা মুক্তিযোদ্ধা সংসদ।
[২৮৮] সাক্ষাৎকার, মোঃ গোলাম মোস্তফা, কমান্ডার, কলারোয়া উপজেলা মুক্তিযোদ্ধা সংসদ।
[২৮৯] সাক্ষাৎকার, মোঃ আবুল হোসেন, সহকারী কমান্ডার, কলারোয়া উপজেলা মুক্তিযোদ্ধা সংসদ।
[২৯০] সাক্ষাৎকার, মোঃ আবুল হোসেন, সহকারী কমান্ডার, কলারোয়া উপজেলা মুক্তিযোদ্ধা সংসদ।
[২৯১] সাক্ষাৎকার, মোঃ আইয়ুব আলী, বোয়ালিয়া, কলারোয়া, সাতক্ষীরা।
[২৯২] সাক্ষাৎকার, মোঃ আইয়ুব আলী, বোয়ালিয়া, কলারোয়া, সাতক্ষীরা।
[২৯৩] সাক্ষাৎকার, মোঃ আব্দুর জব্বার, মুক্তিযোদ্ধা, কলারোয়া, সাতক্ষীরা।
[২৯৪] সাক্ষাৎকার, মোঃ আব্দুর জব্বার, মুক্তিযোদ্ধা, কলারোয়া, সাতক্ষীরা।
[২৯৫] সাক্ষাৎকার, মোঃ আব্দুর জব্বার, মুক্তিযোদ্ধা, কলারোয়া, সাতক্ষীরা।
[২৯৬] সাক্ষাৎকার, সৈয়দ আলী গাজী, মুক্তিযোদ্ধা, কলারোয়া, সাতক্ষীরা। ১৭/০৫/২০১৬ কলারোয়া।

অভিযানে যারা অংশ নেয় তারা হলেন- মোঃ আব্দুল গফফার, মোঃ গোলাম মোস্তফা, সৈয়দ আলী গাজী, মোঃ আবুল হোসেন, মোঃ রবিউল ইসলাম, সোহরাব হোসেন, মেনুদ্দীন গাজী, শফিউল্লাহ, পরিতোষ কুমার, সন্তোষ সরকার, মোঃ ওমর আলী, প্রমুখ।[২৯৭] এ সকল ব্রিজ ধ্বংসের পর মাজেদ খাঁ (আলাইপুর)[২৯৮], কাশেম চেয়ারম্যান (কলারোয়া)[২৯৯], মুক্তিযোদ্ধাদের বাড়িতে অগ্নিসংযোগ করে।[৩০০] ব্রজবাকসা এলাকার রাজাকার কমান্ডার মোঃ আবু তালেব মুক্তিযোদ্ধাদের বাড়িতে অগ্নিসংযোগ করে।[৩০১] ঐ সকল ব্রিজ ধ্বংসের পর পাকিস্তানী সেনারা পায়ে হেটে আক্রমণ করত।[৩০২]

কলারোয়া উপজেলা

৩.৬ কাকডাঙ্গা অভিযান

কাকডাঙ্গা ভারত সীমান্তের কাছাকাছি অবস্থিত সাতক্ষীরা মহকুমার কলারোয়া উপজেলার অন্তর্গত একটি গ্রাম। সীমান্তের অতি নিকটে অবস্থিত হওয়ায় পাকিস্তানী বাহিনী এটির গুরুত্ব বিবেচনা করে এখানে শক্তিশালী ঘাঁটি স্থাপন করে। অন্যদিকে কাকডাঙ্গা থেকে কিছু দুরে কেঁড়াগাছিতে মুক্তিবাহিনী ঘাঁটি স্থাপন করে এবং মূলঘাঁটি ভারতীয় এলাকায়। খান সেনাদের অতি মজবুত বাঙ্কার ট্যাংক, ভারী কামান ও অস্ত্রশস্ত্র সুসজ্জিত দুঃসাহসী পাকিস্তানী সেনাদের নিয়ে প্রতিরক্ষা এলাকা গড়ে তোলে। তবে মুক্তিযোদ্ধারা পাকিস্তানী সেনাদের কখনও পাকিস্তানী সেনাদেরকে শান্তিতে থাকতে দেয়নি। এখানে পাকিস্তানী বাহিনী ও মুক্তিবাহিনী সবাই সমানভাবে তৎপর ছিল এবং এটির নেতৃত্বে থাকে ৮ নম্বর সেক্টরের মেজর মঞ্জুর। এলাহী বক্স কমান্ডার নামে পরিচিত এক যোদ্ধা ও তার তিন সহোদর ভাই অনেকবার জীবনের ঝুঁকি নিয়ে গেরিলা কায়দায় পাকিস্তানী সেনাদের প্রতিরক্ষা এলাকায় ঢুকে আক্রমণ চালাতো এবং কিছু না কিছু তছনছ করে দিয়ে আসতো। তিনি সাতক্ষীরা এলাকায় এলাহী বক্স কমান্ডার নামে পরিচিত এবং সারাজীবন তিনি নিয়মিত আনসার কমান্ডার এবং সহোদর মহাজন সরদার আনসার বাহিনীর সদস্য। একবার আগড়দাঁড়ীতে তার ভাই একরাম রেকী করতে গিয়ে কৃষক বেশে ধরা পড়ে কিন্তু অনেক নির্যাতনের পরও তিনি মুখ খোলেননি বরং ১২ দিন পর এসে চিকিৎসা শেষে তিনি আবার মুক্তিযুদ্ধে যোগদান করেন।[৩০৩] এলাহী বক্স কমান্ডারের ছোট দলটি হঠাৎগঞ্জের আইচপাড়া গ্রামের আমবাগানে রেকী করতে গিয়ে ধরা পড়ে, তারা বেঁচে যান কিন্তু তার ভাই পাকিস্তানী বাহিনীর হাতে ধরা পড়ে। কিন্তু বহু কৌশল প্রয়োগ করে ৪ জন খান সেনাকে হত্যা করে তিনি চলে আসতে সক্ষম হন। এলাহী বক্স কমান্ডারের রণকৌশলের মূল সূত্র চোরাগুপ্তা ঝটিকা আক্রমণ। উভয় পক্ষ সবসময়

[২৯৭] সাক্ষাৎকার, সৈয়দ আলী গাজী, মুক্তিযোদ্ধা, কলারোয়া, সাতক্ষীরা।
[২৯৮] সাক্ষাৎকার, মোঃ গোলাম মোস্তফা, কমান্ডার, কলারোয়া উপজেলা মুক্তিযোদ্ধা সংসদ।
[২৯৯] সাক্ষাৎকার, মোঃ গোলাম মোস্তফা, কমান্ডার, কলারোয়া উপজেলা মুক্তিযোদ্ধা সংসদ।
[৩০০] সাক্ষাৎকার, মোঃ আবুল হোসেন, সহকারী কমান্ডার, কলারোয়া উপজেলা মুক্তিযোদ্ধা সংসদ।
[৩০১] সাক্ষাৎকার, মোঃ আবুল হোসেন, সহকারী কমান্ডার, কলারোয়া উপজেলা মুক্তিযোদ্ধা সংসদ।
[৩০২] সাক্ষাৎকার, মোঃ আবুল হোসেন, সহকারী কমান্ডার, কলারোয়া উপজেলা মুক্তিযোদ্ধা সংসদ।
[৩০৩] সাক্ষাৎকার, মোঃ গোলাম মোস্তফা। ১৭/০৫/২০১৬ কাকডাঙ্গা।

সর্তক থাকার কারণে কেউ কাউকে যুদ্ধে পরাজিত করে পুরোপুরি অপসারণ করতে পারিনি। কাকডাঙ্গায় যুদ্ধের পুরোটা সময় পাকিস্তানী হানাদার বাহিনী ও মুক্তিবাহিনীর মুখোমুখি অবস্থান এবং কখনও প্রচন্ড যুদ্ধে সেক্টর কমান্ডার মেজর মঞ্জুর, ক্যাপ্টেন মাহবুব, ক্যাপ্টেন শফিউল্লাহ, এ আর চৌধুরী একত্রে মিলিত হয়ে পাকিস্তানী বাহিনীর উপর আক্রমণ চালানোর সিদ্ধান্ত নিলেন।[৩০৪] মেজর মঞ্জুর হেলিকপ্টারে উঠে অনেক উপর থেকে দুরবীনের সাহায্যে পাকিস্তানী সেনাদের পুরো প্রতিরক্ষা পর্যবেক্ষণ করেন ও ছবি নেন এবং তারপর তিনি আক্রমণ করার নির্দেশনা দেন। তিনি নিজে এ যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেন।[৩০৫] কাকডাঙ্গা সামরিক দিক থেকে গুরুত্বপূর্ণ স্থান হবার কারণে মুক্তিযোদ্ধারা এখানে ৪০/৫০টা বাঙ্কার ও ট্যাংক তৈরী করে প্রতিরক্ষা দূর্গ গড়ে তোলে এবং এখান থেকে গেরিলা কায়দায় পাকিস্তানী বাহিনীর উপর নিয়মিত আক্রমণ চালাতো।[৩০৬] সোনাই পূর্বপার সবসময় মুক্তিযোদ্ধাদের দখলে থাকে এবং মাঝে মাঝে মুক্তিযোদ্ধারা যুদ্ধ করতে করতে বোয়ালিয়া পর্যন্ত অগ্রসর হয়।[৩০৭] বোয়ালিয়ার পাশে হঠাৎগঞ্জে খানসেনারা দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলের শক্তিশালী ঘাঁটি তৈরী করে। মুক্তিযোদ্ধাদের সাথে ইপিআর, বেঙ্গল রেজিমেন্টের সৈনিক ছাড়াও কমান্ডার মোসলেম উদ্দিন এবং কমান্ডার আব্দুল গফফারের সঙ্গে যারা অংশগ্রহণ করেন তারা হলেন- গোলাম মোস্তফা, এবাদুল্লাহ, মুজিবর রহমান, মেহের আলী মিস্ত্রী, ইমান আলী, আমজাদ আলী, আমজাদ হোসেন, নুরুল ইসলাম, তারক চন্দ্র মন্ডল, সবুর আলী, বজলুর রহমান, গিয়াস উদ্দিন, কার্ত্তিক চন্দ্র সরকার, এ.জেড নজরুল ইসলাম, শওকত নামে তিনজন, হানেফ আলী মন্ডল, আবুল হোসেন, তৌফিকুর রহমান, আয়ূব আলী, আব্দুল জব্বার।[৩০৮] মুক্তিযোদ্ধাদের দুর্দান্ত সাহস ও প্রচন্ড তোপের মুখে পাকিস্তানী হানাদার বাহিনী কাকডাঙ্গা ছেড়ে হঠাৎগঞ্জে প্রতিরক্ষায় চলে যেতে বাধ্য হয়।[৩০৯] যার ফলে মুক্তিবাহিনী গৌরবের সাথে কাকডাঙ্গা দখল করে সেখানে নিজেদের শক্তিশালী ডিফেন্স গড়ে তোলে। এই যুদ্ধে ১২ জন খানসেনা এবং ২০/২৫ জন রাজাকার নিহত হয়।[৩১০] অন্যদিকে হাওলাখালি গ্রামের ৩ জন লোককে মুক্তিবাহিনীর সাহায্যকারী হিসাবে সন্দেহ করে ধরে নিয়ে যায় এবং নির্মম অত্যাচার নির্যাতনের পর হত্যা করে।[৩১১] কাকডাঙ্গা গ্রামের নিবাসী আফতাব সরদারের পুত্র মুনসুর আলী খানসেনাদের সেলিং এর আঘাতে মৃত্যুবরণ করে।[৩১২] বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধের ইতিহাসে কাকডাঙ্গা যুদ্ধের স্মৃতি অমর হয়ে আছে। মেজর মঞ্জুর ও ক্যাপ্টেন মাহবুবের বীরত্ব গাঁথা আমাদের স্বাধীনতা সংগ্রামের অমর কাব্য হয়ে আছে।

---

[৩০৪] সাক্ষাৎকার, শেখ তৈয়েবুর রহমান (শান্ত), পৌর মুক্তিযোদ্ধা কমান্ডার, সাতক্ষীরা। ১৮/০৫/২০১৬ সাতক্ষীরা।
[৩০৫] সাক্ষাৎকার, কার্ত্তিক চন্দ্র সরকার, মুক্তিযোদ্ধা।
[৩০৬] সাক্ষাৎকার, আশরাফ আলী, কলারোয়া।
[৩০৭] সাক্ষাৎকার, মোঃ আবুল হোসেন। ১৭/০৫/২০১৬ কাকডাঙ্গা।
[৩০৮] সাক্ষাৎকার, মোঃ আবুল হোসেন মুক্তিযোদ্ধা।
[৩০৯] সাক্ষাৎকার, মোঃ আবুল হোসেন মুক্তিযোদ্ধা।
[৩১০] স.ম. বাবর আলী, 'প্রাগুক্ত' পৃষ্ঠা-২৬০।
[৩১১] সাক্ষাৎকার, মোঃ আশরাফ আলী।
[৩১২] সাক্ষাৎকার, মোঃ আশরাফ আলী ও মোসলেম উদ্দীন হাজরা, কেঁড়াগাছী, কলারোয়া।

কলারোয়া উপজেলা

৩.৭ সোনাবাড়িয়া আক্রমণ

সোনাবাড়িয়া গ্রামটি ভারত বাংলাদেশ সীমান্তের নিকটবর্তী কলারোয়া উপজেলায় অবস্থিত এবং সীমান্তবর্তী গ্রাম হওয়ার কারণে সামরিক কারণে খুব গুরুত্বপূর্ণ একটি স্থান।[৩১৩] ভৌগোলিক অবস্থানের কারণে মুক্তিযোদ্ধাদের কাছে যেমন গুরুত্বপূর্ণ তেমনি সামরিক কৌশলগত কারণে পাকিস্তানী বাহিনী রাজাকারদের কাছে এটি গুরুত্ববহ। মিলিটারী গ্রামটিকে বিশেষ নজরে রাখে কারণ সোনাবাড়িয়ার বেশ কয়েকজন যুবক মুক্তিযুদ্ধে যোগদান করে। এদিকে দিনের পর দিন রাজাকারদের অত্যাচার সাধারণ মানুষের উপর নির্যাতন, মেয়েদের ধরে আনা, গরু ছাগল ধরে আনা বেড়ে যেতে থাকে।[৩১৪] মুক্তিযুদ্ধের প্রাথমিক পর্যায়ে সোনাবাড়িয়া গ্রামে পাকিস্তানী হানাদার ও রাজাকাররা শক্তিশালী ঘাঁটি স্থাপন করে। অন্যদিকে এমপিএ মমতাজ উদ্দীন আহমদ, শেখ আমানউল্লাহ, মোসলেম উদ্দিন, আব্দুল গফফার, তপন ঘোষসহ অনেকে ভারতের হাকিমপুর ক্যাম্পে অবস্থান করে।[৩১৫] রাজাকার ও হানাদার বাহিনীর খবরাখবর জানার জন্য ভাদিয়ালী গ্রামের রজব আলীকে নিযুক্ত করা হয়।[৩১৬] কিন্তু পাকিস্তানী বাহিনীর দালাল ডাঃ আব্দুর রহমান বুঝতে পারে রজব আলীর সাথে মুক্তিবাহিনীর যোগাযোগ আছে এবং সেই কারণে রাজাকার জমির আলীসহ ৩/৪ জন রজব আলীকে পিঠমোড়া দিয়ে বেধে নিয়ে যায়।[৩১৭] নির্মম অত্যাচারের পর তাকে হত্যা করে তার লাশ ফেলে রেখে যায় কিন্তু তিনি বেঁচে ছিলেন এবং তার ভাগ্নে মারাত্মক আহত অবস্থায় তাকে খুজে পায়।[৩১৮] তাকে ডাক্তারের কাছে নেওয়া হলেও কেউ সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দেয় নি। অবশেষে চিকিৎসার অভাবে রজব আলী মৃত্যুবরণ করেন এবং রাস্তার পাশেই তাকে কবর দেওয়া হয় যেটি আজও অযত্ন অবহেলায় পড়ে আছে।[৩১৯] রজব আলীকে হত্যার দিন পাকিস্তানী সেনাদের সাথে নিয়ে রাজাকাররা হিন্দু পাড়ায় প্রবেশ করে এবং মন্দিরের পূজারী হাজরা গাঙ্গুলিকে ধরে নিয়ে যায়।[৩২০] এক দালাল আব্দুর রহমান শিবু পোদ্দারকে পাকিস্তানী বাহিনীর কাছে ধরিয়ে দেয় এবং শুরু করে তার উপর নির্মম অত্যাচার।[৩২১] এভাবে অমানুষিক নির্যাতনের স্বীকার হয়ে শিবু পোদ্দার মৃত্যুবরণ করে।[৩২২] পাকিস্তানী সেনারা সোনাবাড়িয়ার শহীদুল চেয়ারম্যানের বাড়ি ও মেম্বর মোকাররম হোসেনের বাড়ির পাশে শক্তিশালী ঘাঁটি স্থাপন করে এবং ইপিআর ক্যাম্পকে তাদের ঘাঁটি হিসেবে

---

[৩১৩] সাক্ষাৎকার, মোঃ গোলাম মোস্তফা। ১৭/০৫/২০১৬ সোনাবাড়িয়া।
[৩১৪] সাক্ষাৎকার, মোঃ গোলাম মোস্তফা ও আরও দেখবেন- স.ম. বাবর আলী 'প্রাগুক্ত' পৃষ্ঠা- ২৬৬।
[৩১৫] সাক্ষাৎকার, মোঃ গোলাম মোস্তফা ও আরও দেখবেন- স.ম. বাবর আলী 'প্রাগুক্ত' পৃষ্ঠা- ২৬৬।
[৩১৬] সাক্ষাৎকার, মোঃ গোলাম মোস্তফা ও আরও দেখবেন- স.ম. বাবর আলী 'প্রাগুক্ত' পৃষ্ঠা- ২৬৬ এবং সাক্ষাৎকার, মোঃ আব্দুল গফফার, কলারোয়া।
[৩১৭] সাক্ষাৎকার, মোঃ গোলাম মোস্তফা।
[৩১৮] সাক্ষাৎকার, মোঃ গোলাম মোস্তফা।
[৩১৯] সাক্ষাৎকার, মোঃ মোমতাজ আলী, দক্ষিণ সোনাবাড়িয়া। ১৭/০৫/২০১৬ সোনাবাড়িয়া।
[৩২০] সাক্ষাৎকার, মোঃ সৈয়দ আলী গাজী।
[৩২১] সাক্ষাৎকার, মোঃ সৈয়দ আলী গাজী।
[৩২২] মোঃ গোলাম মোস্তফা

গড়ে তোলে।[৩২৩] পাকিস্তানী সেনা ও রাজাকারদের অত্যাচারের মাত্রা দিনের পর দিন বেড়ে যেতে থাকে। কমান্ডার মাহবুব, আব্দুল গফফার ও কমান্ডার শফিউল্লাহ মাদরা সোনাবাড়িয়া আক্রমণের মাধ্যমে পাকিস্তানী বাহিনী ও রাজাকারদের বিতাড়িত করার পরিকল্পনা করে।[৩২৪] মাদরা ও সোনাবাড়িয়ায় পাকিস্তানী সেনাদের বিপরীতে মুক্তিবাহিনী চান্দা ও ভাদিয়ালী গ্রামে ডিফেন্স তৈরি করে।[৩২৫] সেপ্টেম্বর মাসে একটি বিশাল মুক্তিবাহিনী মাদরা সোনাবাড়িয়া পাকিস্তানী সেনাদেরকে শক্তিশালী ঘাঁটিতে আক্রমণ চালনা করে।[৩২৬] খান সেনাদের তিন গুপ্তচর পিয়ার মোহাম্মদ, আব্দুল আজিজ ও মওলানা খালেক ধরা পড়ে এবং তাদের কাছ থেকে পাকিস্তানী হানাদার বাহিনীর বিভিন্ন খোজখবর জানতে পেরে মুক্তিযুদ্ধের গতি আরও বৃদ্ধি করে।[৩২৭] মুক্তিযোদ্ধারা বীর বিক্রমে লড়াই চালিয়ে যায় এবং রাজাকারদের হাকিমপুর ক্যাম্প বন্দি করে রাখা হয়। ভোররাত থেকে সমগ্র এলাকায় চলে ভয়াবহ যুদ্ধ এবং উভয়পক্ষের গোলাগুলিতে সোনাবাড়িয়া পুকুর পাড় মহৎ রণক্ষেত্রে পরিণত হয়। কমান্ডার আব্দুল গফফারের নেতৃত্বে একটি মুক্তিযুদ্ধের দল কোমরপুর থেকে রূপঘাঁট গ্রাম পর্যন্ত খোয়ার রাস্তায় মাইন বসায়।[৩২৮] ওদিকে যুদ্ধের সার্বিক অবস্থা তদারকি করার জন্য পাকিস্তানী বাহিনীর ক্যাপ্টেন সোনাবাড়িয়ায় গাড়ী যোগে আসতে থাকে কিন্তু রূপঘাঁট পুলের কাছে আসলে প্রচন্ড বিস্ফোরণ ঘটে এবং গাড়ী উল্টে ক্যাপ্টেনসহ ৫/৬ জন নিহত হয় যেটি মুক্তিযোদ্ধাদেরকে আরও উৎসাহিত করে তোলে।[৩২৯] মুক্তিবাহিনীরা প্রাণপণ লড়াই চালিয়ে যেতে থাকে এবং যার ফলে পাকিস্তানী সেনারা ভীত সন্ত্রস্ত হয়ে পড়ে এবং পিছু হটতে বাধ্য হয়। এই পরাজয়ের কারণে মুক্তিযুদ্ধ চলাকালীন সময়ে আর কখন পাকিস্তানী বাহিনী শক্তিশালী ডিফেন্স স্থাপন করতে পারিনি। বীর বিক্রমে যেসব মুক্তিযোদ্ধা লড়াই করে গেছেন তারা হলেন কমান্ডার মোসলেম এর নেতৃত্বে আবুল হোসেন, আমির আলী, শওকত আলী চৌকিদার, শওকত আলী শেখ, তৌফিকুর রহমান, আকবর আলী, ছুরত আলী, মোহর আলী মিস্ত্রী, আমজেদ আলী, ইমাম আলী প্রমুখ ব্যক্তিবর্গ।[৩৩০] এদিকে মুক্তিযুদ্ধ চলাকালীন সময়ে বর্তমান কমান্ডার গোলাম মোস্তফা তাঁর আপন মামা রাজাকার কমান্ডার আফিল উদ্দিনকে বন্দি করে মুক্তিযোদ্ধাদের হাতে অর্পন করে।[৩৩১]

---

[৩২৩] মোঃ গোলাম মোস্তফা ও সাক্ষাৎকার, মোসলেম উদ্দীন হাজরা, কেঁড়াগাছী, কলারোয়া।
[৩২৪] সাক্ষাৎকার, মোঃ আব্দুল গফফার, কলারোয়া। ১৭/০৫/২০১৬ সোনাবাড়িয়া।
[৩২৫] সাক্ষাৎকার, মোঃ আব্দুল গফফার, কলারোয়া।
[৩২৬] সাক্ষাৎকার, মোঃ আব্দুল গফফার, কলারোয়া। আরও দেখবেন, স.ম. বাবর আলী 'প্রাগুক্ত' পৃষ্ঠা- ২৬৬।
[৩২৭] সাক্ষাৎকার, মোঃ আব্দুল গফফার, কলারোয়া। আরও দেখবেন, স.ম. বাবর আলী 'প্রাগুক্ত' পৃষ্ঠা- ২৬৬।
[৩২৮] সাক্ষাৎকার, মোঃ আব্দুল গফফার, কলারোয়া। আরও দেখবেন, স.ম. বাবর আলী 'প্রাগুক্ত' পৃষ্ঠা- ২৬৬।
[৩২৯] মোঃ আব্দুল গফফার, কলারোয়া।
[৩৩০] সাক্ষাৎকার, মোঃ আব্দুল গফফার, কলারোয়া।
[৩৩১] সাক্ষাৎকার, মোঃ আব্দুল গফফার, কলারোয়া।

Dhaka University Institutional Repository

সাতক্ষীরা সদর উপজেলা

৩.৮ জিন্নাহ পার্কে মুক্তিযুদ্ধের প্রশিক্ষণ

জিন্নাহ পার্ক সাতক্ষীরা সদরে অবস্থিত স্বাধীনতা সংগ্রাম ও মুক্তিযুদ্ধের একটি অন্যতম স্মৃতি বিজড়িত স্থান।[৩৩২] কারণ মুক্তিযুদ্ধের সময়ে কয়েকজন তরুণ সামরিক প্রশিক্ষণের মহড়া শুরু করে সাতক্ষীরা কলেজের ড্যামি রাইফেল নিয়ে।[৩৩৩] আকবর, নাছির উদ্দিন, কচি গজনফর কবীর, আনিসুর রহমান খান বাবুল, আলী আশরাফ, কামরুল ইসলাম, শাহনেওয়াজ, খোকা, খলিলুল্লাহ ঝড়ু, কণ্ট্রাক্টর মাহবুব সহ প্রায় ২৫ জন এই প্রশিক্ষণ মহড়ায় অংশগ্রহণ করে।[৩৩৪] তাদের বিশ্বাস পাকিস্তান বাহিনী যেকোন মুহূর্তে বাঙালীদের উপর আক্রমণ করবে যেটি সারা দেশব্যাপী ছড়িয়ে পড়বে তাই তারা দীর্ঘস্থায়ী যুদ্ধের প্রস্তুতি গ্রহণ করে। তারা মূলত প্রগতিশীল রাজনীতিতে বিশ্বাসী।[৩৩৫] এই সময় তরুণেরা তাদের যুদ্ধের প্রস্তুতি শুরু করে মার্চের তৃতীয় সপ্তাহ থেকে এপ্রিলের প্রথম সপ্তাহ পর্যন্ত যখন পর্যন্ত পাকিস্তানী সেনারা সাতক্ষীরায় প্রবেশ করেনি।[৩৩৬] এই যুদ্ধের প্রশিক্ষণের মহড়ায় প্রধান দায়িত্ব পালন করেন খায়রুল বাশার।[৩৩৭] খায়রুল বাশার, শেখ নিজাম উদ্দিন এবং তৎকালীন স্যানেটারী অফিসারের ছেলে কামরুল ইসলাম ভারতের বশিরহাটে গিয়ে সেখানকার এস.ডি.ও. এর সাথে দেখা করে অস্ত্র সংগ্রহ করার পরিকল্পনা করে।[৩৩৮] কিন্তু তিনি রাজনৈতিক নেতাদের সাথে যোগাযোগ করার কথা বলেন। তখন তারা বশিরহাটের সিপিএস নেতাদের সাথে দেখা করে যুদ্ধের প্রস্তুতি সম্পর্কে বর্ণনা করেন।[৩৩৯] নেতারা অস্ত্র ব্যতীত যুদ্ধকালীন প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র দিতে আগ্রহ প্রকাশ করেন তবে শর্ত থাকে যে, এই সব জিনিসপত্র তারা শুধুমাত্র আওয়ামীলীগের লোকজনের কাছে হস্তান্তর করবেন।[৩৪০] এ জন্য খায়রুল বাশার একটি চিঠি লেখেন এবং সেটি কানন গাইনের মাধ্যমে সাতক্ষীরায় এ্যাডভোকেট আব্দুল গফফারের নিকট পাঠিয়ে দেন এবং তাকে পরেরদিন ভোমরা বন্দরে উপস্থিত থাকার জন্য বলেন।[৩৪১] তার পরের দিন খায়রুল বাশার, শেখ নিজাম উদ্দিন এবং কামরুল ইসলাম বশিরহাট কলেজের এনসিসি'র ইন্সট্রাক্টরের মাধ্যমে এক ট্রাক শুকনো খাবার, প্রাথমিক চিকিৎসার দ্রব্যাদি এবং বস্ত্রসস্ত্র ভোমরা বন্দরে অপেক্ষারত সাতক্ষীরার এ্যাডভোকেট আব্দুল গফফার এবং আওয়ামী লীগের সদস্য কাজী

---

[৩৩২] স.ম. বাবর আলী 'প্রাগুক্ত'
[৩৩৩] সাক্ষাৎকার, মোঃ ছামছুর রহমান, দক্ষিণ কামাল নগর, সাতক্ষীরা। ১৮/০৬/২০১৬ কামালনগর।
[৩৩৪] সাক্ষাৎকার, মোঃ ছামছুর রহমান, দক্ষিণ কামাল নগর, সাতক্ষীরা।
[৩৩৫] সাক্ষাৎকার, মোঃ ছামছুর রহমান, দক্ষিণ কামাল নগর, সাতক্ষীরা।
[৩৩৬] সাক্ষাৎকার, প্রফেসর ড. এম.এ বারী, মুক্তিযোদ্ধা, সাতক্ষীরা। ১৮/০৬/২০১৬ কামালনগর।
[৩৩৭] সাক্ষাৎকার, প্রফেসর ড. এম.এ বারী, মুক্তিযোদ্ধা, সাতক্ষীরা।
[৩৩৮] সাক্ষাৎকার, প্রফেসর ড. এম.এ বারী, মুক্তিযোদ্ধা, সাতক্ষীরা।
[৩৩৯] সাক্ষাৎকার, প্রফেসর সুভাষ চন্দ্র সরকার, মুক্তিযোদ্ধা, সাতক্ষীরা। ১৮/০৬/২০১৬ কামালনগর।
[৩৪০] সাক্ষাৎকার, প্রফেসর সুভাষ চন্দ্র সরকার, মুক্তিযোদ্ধা, সাতক্ষীরা।
[৩৪১] সাক্ষাৎকার, প্রফেসর সুভাষ চন্দ্র সরকার, মুক্তিযোদ্ধা, সাতক্ষীরা।

Dhaka University Institutional Repository

কামাল ড্রাইভারের কাছে হস্তান্তর করেন।[৩৪২] জিনিসপত্র হস্তান্তর করার সময় ক্যাপ্টেন কাজী এবং মুসলিম লীগের আব্দুল গফুর উপস্থিত ছিলেন এবং ক্যাপ্টেন কাজী গফুর সাহেবের জিপ গাড়ীতে মালামাল বহন করে সাতক্ষীরায় আনা হয়।[৩৪৩] এদিকে খায়রুল বাশার ও শেখ নিজাম উদ্দিন তাদের সাথে সাতক্ষীরায় না ফিরে অন্য পথে তাদের প্রশিক্ষণ মাঠের দিকে চলে যায়।[৩৪৪] প্রশিক্ষণ মহড়া ১৫/২০ দিন চলে এবং তারপর জনগণকে মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণ এবং জনযুদ্ধের প্রস্তুতি নেওয়ার জন্য প্রশিক্ষণরত তরুণেরা বিভিন্ন গ্রুপে বিভক্ত হয়ে যায় এবং গ্রাম অঞ্চলে ছড়িয়ে ছিটিয়ে পড়ে। খায়রুল বাশারের নেতৃত্বাধীন দলে মুক্তিযোদ্ধারা হলেন- কন্ট্রাক্টর মাহবুব, খলিলুল্লাহ ঝড়ু, আনিসুর রহমান খান বাবুল।[৩৪৫] যখন সাতক্ষীরায় পাকিস্তানী হানাদার বাহিনীর আসা শুরু করে তখন প্রশিক্ষণরত মুক্তিযোদ্ধারা বিভিন্ন ক্যাম্প থেকে মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণ করে এবং কাঙ্খিত বিজয় অর্জন করে।[৩৪৬] খায়রুল বাশার নয় নম্বর সেক্টরের দায়িত্ব পালন করেন এবং অন্য দিকে আট নম্বর সেক্টরের হাকিমপুর ক্যাম্পে থাকেন আনিসুর রহমান খান বাবুল।[৩৪৭] কিন্তু অত্যন্ত পরিতাপের বিষয় এই যে, মুক্তিযোদ্ধাদের প্রথম প্রশিক্ষণ মহড়ার এই স্থানটি একটি ক্লাবের নিকট থেকে ক্রয়-বিক্রয়ের মাধ্যমে মসজিদ আর ব্যক্তিগত সম্পত্তিতে পরিণত হয়েছে।[৩৪৮]

সাতক্ষীরা সদর উপজেলাঃ

৩.৯ সাতক্ষীরা ট্রেজারী থেকে অস্ত্র সংগ্রহ ও এস.ডি.ও আটক

ইতোমধ্যে সারা দেশব্যাপী যুদ্ধ শুরু হয়ে গেছে এবং বীর বাঙালীরা নিজেদের জীবন বাজি রেখে যুদ্ধে যোগদান করা শুরু করেছে। পাকিস্তানী হানাদার বাহিনী জেলা শহর খুলনা দখল করে সেখানে ক্যাম্প গঠন করেছে। সুতরাং যেকোন মূহুর্তে খান সেনারা সাতক্ষীরায় আসবে এটি নিশ্চিত এবং সাধারণ নিরহ জনগণের উপর হত্যা নিধন চালাবে। সুতরাং পাকিস্তানী হানাদারদের প্রতিহত করা আবশ্যক এবং এর জন্য প্রয়োজন হয় অস্ত্র যেটি দিয়ে পাকিস্তানী সেনাদের নিধন করা সম্ভব হবে। সাতক্ষীরার ট্রেজারীতে অস্ত্রের মজুদ আছে। অন্যদিকে গফুর সাহেব বিপ্লবী চিন্তাধারার রাজনীতিক এবং বামপন্থী রাজনীতির উপর তিনি বেশ লেখাপড়া করেন।[৩৪৯] তিনি ছিলেন পাইকগাছা, কয়রা আশাশুনি থেকে নির্বাচিত এম.এন.এ।[৩৫০] সুতরাং তিনি

[৩৪২] স.ম. বাবর আলী 'প্রাগুক্ত' পৃষ্ঠা- ২৫৩।
[৩৪৩] স.ম. বাবর আলী 'প্রাগুক্ত' পৃষ্ঠা- ২৫৩।
[৩৪৪] স.ম. বাবর আলী 'প্রাগুক্ত' পৃষ্ঠা- ২৫৩।
[৩৪৫] সাক্ষাৎকার, প্রফেসর ড. এম.এ বারী, মুক্তিযোদ্ধা, সাতক্ষীরা।
[৩৪৬] সাক্ষাৎকার, প্রফেসর ড. এম.এ বারী, মুক্তিযোদ্ধা, সাতক্ষীরা।
[৩৪৭] সাক্ষাৎকার, প্রফেসর ড. এম.এ বারী, মুক্তিযোদ্ধা, সাতক্ষীরা।
[৩৪৮] সাক্ষাৎকার, প্রফেসর সুভাষ চন্দ্র সরকার, মুক্তিযোদ্ধা, সাতক্ষীরা।
[৩৪৯] স.ম. বাবর আলী 'প্রাগুক্ত' পৃষ্ঠা- ১৮৪, আরও দেখবেন, মীর মুস্তাক আহমেদ রবি, চেতনায় একাত্তর, জোনাকী প্রকাশনী, পৃষ্ঠা-৫৪।

Dhaka University Institutional Repository

সাতক্ষীরায় যখন এলেন তখন যুব কর্মীরা ছাত্ররা যেন আশা উদ্দীপনা ফিরে পেল এবং নতুন উদ্যোমে কাজ করার মনোভাব ব্যক্ত করে। এদিকে তিনি সর্বত্রই সংগ্রাম পরিষদ, আওয়ামী স্বেচ্ছা সেবক বাহিনী ও স্বাধীন বাংলা ছাত্র সংগ্রাম পরিষদের মাধ্যমে প্রতিরোধ সৃষ্টির লক্ষ্যে ব্যাপক কর্মকান্ড চালিয়ে যান।[৩৫১] তারা চিন্তা ভাবনার মাধ্যমে পুলিশের সাথে যোগাযোগ করে ট্রেজারী থেকে অস্ত্র নেওয়ার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। এই লক্ষ্যে গফুর সাহেব, সুবেদার আয়ুব পুলিশের এসডিপি ও এর সাথে আলাপ আলোচনা করেন।[৩৫২] খুলনা জেলার পুলিশ সুপার এ,আর খন্দকার বাঙালী জাতীয়তাবাদের ধারক ও বাহক ছিলেন।[৩৫৩] এ জন্য তিনি আগে থেকেই তার অধীনস্ত পুলিশ বাহিনীকে গোপন নির্দেশ প্রদান করেন যে, আওয়ামীলীগের নেতৃত্বে গঠিত সংগ্রাম পরিষদের সাথে যোগাযোগ রক্ষা করে তাদের নির্দেশ মতো কাজ করার জন্য।[৩৫৪] এদিকে এস.ডি.পি.ও (মহাকুমা পুলিশ সুপার) অস্ত্র দিতে রাজী হলেন।[৩৫৫] যে কারণে সাতক্ষীরা ট্রেজারী থেকে ৩৫০টা থ্রি নট থ্রি (৩০৩) রাইফেল ও ৩০/৪০ বক্স গুলি পাওয়া গেল।[৩৫৬] মুস্তাফিজ, কামরুল ইসলাম খান, মাসুদ, এনামুল, তিনু, হাবলু অস্ত্র ও গোলাবারুদ সংগ্রহ করেন।[৩৫৭] স্বাধীনতা যুদ্ধের শুরুতে অস্ত্র ও গোলাবারুদ প্রাপ্তি মুক্তিযোদ্ধাদের শক্তিমাত্রা প্রবলভাবে বৃদ্ধি করে এবং ছাত্র-যুবক-তরুণেরা আশা উদ্দীপনা নিয়ে দৃঢ় প্রত্যয়ের সাথে স্বাধীনতা যুদ্ধে অংশগ্রহণ করে। তৎকালীন ছাত্র যুবকেরা জানতো না অস্ত্রের কোন প্রশিক্ষণ এবং তারা সশস্ত্র যুদ্ধ সর্ম্পকে অজ্ঞাত ছিল। কিন্তু দেশ শত্রু মুক্ত করতে নিজের প্রাণের মায়া ত্যাগ করে যুদ্ধে অংশগ্রহণ করাই তাদের একমাত্র দৃঢ় প্রত্যয়। তারা যেমন নির্ভীক তেমন উদ্যোমে ভরপুর। অনেক তরুণেরা তখন এই অস্ত্রের প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণ করে তাদের মধ্যে শামসুদ্দোহা কাজল নামে এক ছেলে পি.এন. হাইস্কুলের দশম শ্রেণীতে পড়তো। কাজলের বাড়ি সাতক্ষীরার পাশাপোল।[৩৫৮] তার বাবা আশরাফ উদ্দিন চারিদিকে এই ভয়াবহ অবস্থা থেকে তাকে বাড়ি নেওয়ার জন্য আসেন। কিন্তু অনেক ছাত্র যুবকই কাজলকে বাড়ি নিতে বাধা প্রদান করেন এবং তারা কাজলের বাবাকে বুঝিয়ে বলেন, আমরা সবাই আপনার সন্তান।[৩৫৯] আমাদের বাবা-মা বাড়িতে আমাদের জন্য চিন্তা করে, কান্নাকাটি করে। কিন্তু আমরা দেশকে পাকিস্তানী হানাদার বাহিনী মুক্ত করার জন্য মানুষের উপর নির্মম অত্যাচারের প্রতিশোধ নেবার জন্য সংগ্রাম করছি, আপনি বাধা প্রদান না করে আমাদের জন্য দোয়া করবেন। সুতরাং কাজলের বাবা কাজলকে দেশের

---

[৩৫০] ঐ।
[৩৫১] ঐ।
[৩৫২] সাক্ষাৎকার, শেখ তৈয়েবুর রহমান (শান্ত)। ৩০/০৫/২০১৬ পলাশপোল।
[৩৫৩] সাক্ষাৎকার, শেখ তৈয়েবুর রহমান (শান্ত)।
[৩৫৪] সাক্ষাৎকার, শেখ তৈয়েবুর রহমান (শান্ত)।
[৩৫৫] সাক্ষাৎকার, শেখ তৈয়েবুর রহমান (শান্ত)।
[৩৫৬] সাক্ষাৎকার, শেখ তৈয়েবুর রহমান (শান্ত)।
[৩৫৭] সাক্ষাৎকার, শেখ তৈয়েবুর রহমান (শান্ত)।
[৩৫৮] সাক্ষাৎকার, শেখ তৈয়েবুর রহমান (শান্ত)।
[৩৫৯] সাক্ষাৎকার, শেখ তৈয়েবুর রহমান (শান্ত)।

Dhaka University Institutional Repository

জন্য ভোমরায় রেখে যায়।[৩৬০] কিন্তু অত্যন্ত পরিতাপের বিষয় কাজলকে আর তাঁর মায়ের কোলে ফিরে যেতে হয়নি। কারণ টাউন শ্রীপুরে পাকিস্তানী বাহিনীর সাথে সামনা সামনি যুদ্ধে কাজল শহীদ হয়।[৩৬১] ঐ সময় খালেদ মাহমুদ নামের একজন পাঞ্জাবী সাতক্ষীরা মহকুমায় এস.ডি.ও ছিলেন।[৩৬২] সুতরাং তিনি পাঞ্জাবী হওয়ায় ভবিষ্যতে অবশ্যই পাকিস্তানী বাহিনীতে যোগদান করবেন এবং বাঙালীদের নির্মম অত্যাচারে সাহায্য করবেন। সুতরাং তাকে আটক করার পরিকল্পনা করা হয় এবং সে অনুযায়ী খালেদ মাহমুদকে গ্রেফতার করে মুসলীম লীগের গফুর সাহেবের বাড়িতে জিম্মি করে রাখা হয়।[৩৬৩] তৎকালীন সাতক্ষীরায় দুজন গফুর ছিলেন, যাদের একজন সংগ্রামী বীর এম.এন.এ. আব্দুল গফুর।[৩৬৪] তিনি নবম সেক্টরের মুক্তিযুদ্ধের অন্যতম সংগঠক অন্যদিকে একজন মুসলিম লীগের গফুর যিনি পরবর্তীতে পাকিস্তানীদের শুভাকাঙ্খীতে পরিণত হন।[৩৬৫] ২৯ মার্চ আব্দুল গফুর এম.এম.এ সহ কয়েকজন ছাত্রনেতা মুসলিম লীগের গফুর সাহেবের বাড়িতে এস.ডি.ও খালেদ মাহমুদকে ভোমরায় আনার জন্য যান।[৩৬৬] কিন্তু তিনি এস.ডি.ও কে হস্তান্তর করতে অস্বীকৃতি জানান। এই খবর পেয়ে সুবেদার আয়ুব এক গাড়ী ই.পি.আর সহ অতি দ্রুত মুসলিম লীগের গফুরের বাড়িতে আসে।[৩৬৭] কিন্তু গফুর সাহেব তারপরও খালেদ মাহমুদকে হস্তান্তর করতে নারাজ এবং অনেক তর্ক বির্তকের পর যখন কাজ হল না, তখন গফুরের বন্দুক কেড়ে নিয়ে তাকে বন্দী করে গাড়ীতে তোলা হল।[৩৬৮] কিন্তু গফুর সাহেবের পুত্র বধূ (সিরাজের স্ত্রীর) অনেক কাকুতি মিনতিতে তার প্রাণের বিনিময়ে তাদের বাড়ির এক বাথরুমের ভিতর থেকে এস.ডি.ও খালেদ মাহমুদকে বের করে দিল।[৩৬৯] তখন পাঞ্জাবী এস.ডি.ও কে ধরে ভোমরায় আনা হলো এবং ভোমরা কাস্টম অফিসের মুক্তিবাহিনী ক্যাম্পে তাকে আটক রাখা হল।[৩৭০] এ খবর চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ে এবং বহু লোকজন তাকে দেখতে আসে। যার ফলে গফুর সাহেব ও সুবেদার আয়ুবের এ ধরনের কাজ চারিদিকে প্রশংসিত হয় অন্যদিকে মুসলিম লীগের জিম্মাদার গফুর সাহেবের দুর্নাম ছড়িয়ে পড়ে।[৩৭১] কিন্তু চারিদিকে লোকজনের কাছে খবর পেয়ে এম.এন.এ কামাল বখত সাকী ভোমরা কাস্টম অফিসের মুক্তিবাহিনী ক্যাম্পে আসেন এবং গফুর ভাই সহ অনেকের উপর প্রচন্ড রাগ এবং ধমকাতে থাকেন।[৩৭২] সাকী সাহেবের এই ধরনের আচারণে সবাই মর্মাহত হয় এবং পাঞ্জাবী এস.ডি.ও এর প্রতি এই

---

[৩৬০] মীর মুস্তাক আহমেদ রবি, 'প্রাগুক্ত', পৃষ্ঠা-৫৬।
[৩৬১] ঐ।
[৩৬২] ঐ।
[৩৬৩] স.ম. বাবর আলী 'প্রাগুক্ত' পৃষ্ঠা- ১৮৫।
[৩৬৪] স.ম. বাবর আলী 'প্রাগুক্ত' পৃষ্ঠা- ১৮৫।
[৩৬৫] স.ম. বাবর আলী 'প্রাগুক্ত' পৃষ্ঠা- ১৮৫।
[৩৬৬] স.ম. বাবর আলী 'প্রাগুক্ত' পৃষ্ঠা- ১৮৫।
[৩৬৭] সাক্ষাৎকার, মোঃ আব্দুল হান্নান।
[৩৬৮] সাক্ষাৎকার, মোঃ আব্দুল হান্নান।
[৩৬৯] সাক্ষাৎকার, মোঃ আব্দুল হান্নান।
[৩৭০] স.ম. বাবর আলী 'প্রাগুক্ত' পৃষ্ঠা- ১৮৫।
[৩৭১] ঐ।
[৩৭২] ঐ।

Dhaka University Institutional Repository

ধরনের দুর্বলতা প্রমাণ করলো যে, সাকী সাহেবের ভূমিকা যুদ্ধে কী রূপ হতে পারে।[৩৭৩] সাকী সাহেব প্রচন্ড ক্ষোভ নিয়ে মুক্তিবাহিনী ক্যাম্প ত্যাগ করে। এরপর এস.ডি.ও খালেদ মাহমুদকে বন্দী অবস্থায় ভারতীয় কর্তৃপক্ষের নিকট হস্তান্তর করা হয়।[৩৭৪] এই ঘটনায় পাকিস্তানী বাহিনী ক্ষিপ্ত হয়ে উঠে অন্যদিকে মুক্তিবাহিনীদের মধ্যে আশা ও উদ্দীপনার সঞ্চার করে। মোটকথা সাতক্ষীরা ট্রেজারী থেকে অস্ত্র গ্রহণ এবং পাঞ্জাবী এস.ডি.ও খালেদ মাহমুদকে গ্রেফতার করা মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাসে অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ বিষয়।

সাতক্ষীরা সদর উপজেলাঃ

৩.১০ ন্যাশনাল ব্যাংক অভিযান

পাকিস্তানী হানাদার বাহিনীর বিরুদ্ধে দেশে যুদ্ধ শুরু হয়ে গেছে কিন্তু যুদ্ধকে সঠিকভাবে পরিচালনা করতে অস্ত্র-গোলাবারুদ, টাকা পয়সা, সৈন্যদের আহার যোগানো একটি মৌলিক বিষয় হয়ে দাড়ায়। এছাড়া যুদ্ধ কতদিন পর্যন্ত স্থায়ী হবে তারও কোন ঠিক নেই। প্রতিদিনের প্রয়োজনীয় জিনিসের যোগান দেওয়ার জন্যও টাকা প্রয়োজন। এম.এন.এ আব্দুল গফুর একজন দক্ষ রাজনীতিবিদ।[৩৭৫] তিনি ভোমরা ক্যাম্পে ছিলেন, বিপ্লবী রাজনীতির উপর তিনি ব্যাপক পড়াশোনা করেছেন। তিনি সর্বসম্মতিতে যেকোন একটি ব্যাংক থেকে অপারেশনের মাধ্যমে টাকা আনার সিদ্ধান্ত নেন।[৩৭৬] কিন্তু এটি অত্যন্ত জটিল, কঠিন ও ঝুঁকিপূর্ণ কাজ। এজন্য তারা ই.পি.আর সুবেদার আয়ুব আলীর সাথে আলাপ আলোচনা করেন। তিনি বাংলাদেশের প্রতি আনুগত্য প্রকাশ করে যুদ্ধে সাহায্য করার জন্য সকল প্রকার প্রস্তাব গ্রহণ করেছেন। সুবেদার আয়ুব একাত্মতা প্রকাশ করেন এবং তিনি নিজে সব খোজখবর এনে দিবেন বলে জানান।[৩৭৭] তিনি খোজখবরের মাধ্যমে জানতে পারেন শহরের ন্যাশনাল ব্যাংক অব পাকিস্তান শাখায় দুই কোটি টাকা এবং অনেক সোনা রাখা আছে যার মাধ্যমে একটি ছোট খাটো সরকার বা সেনাবাহিনী কয়েকমাস পরিচালনা করা যায়।[৩৭৮] সুতরাং এম.এন.এ গফুর ও সুবেদার আয়ুব আলী ব্যাংকের প্রহরায় নিযুক্ত রিজার্ভ ফোর্স ও পুলিশের সাথে আলাপ আলোচনা করেন।[৩৭৯] তারা সবাই দেশের কল্যাণে ব্যাংক অভিযানে সাহায্য সহযোগিতা করার আশ্বাস দেয়।[৩৮০] সুতরাং সিদ্ধান্ত নেওয়া হয় যে, ১৯ এপ্রিল দিবাগত রাতে ন্যাশনাল ব্যাংক অব পাকিস্তান এর সাতক্ষীরা শাখায়

---

[৩৭৩] ঐ।
[৩৭৪] ঐ।
[৩৭৫] সাক্ষাৎকার, শেখ তৈয়েবুর রহমান শান্ত, সাতক্ষীরা পৌর মুক্তিযোদ্ধা কমান্ডার। ৩০/০৫/২০১৬ পলাশপোল।
[৩৭৬] স.ম. বাবর আলী 'প্রাগুক্ত' পৃষ্ঠা- ১৮৬।
[৩৭৭] স.ম. বাবর আলী 'প্রাগুক্ত' পৃষ্ঠা- ১৮৬।
[৩৭৮] মীর মুস্তাক আহমেদ রবি, চেতনায় একাত্তর, জোনাকী প্রকাশনী, পৃষ্ঠা-৫৪।
[৩৭৯] ঐ।
[৩৮০] ঐ।

Dhaka University Institutional Repository

অপারেশন করে টাকা এনে নবগঠিত বাংলাদেশ সরকারের কাছে জমা দেয় হয়।[৩৮১] এদিকে ১৯ এপ্রিল সাতক্ষীরার যুব ও ছাত্রনেতারা সাধারণ লোকেরা যেন ভীড় না করে সে জন্য শহরে কারফিউ জারি করে।[৩৮২] এছাড়া সর্বোচ্চ নিরাপত্তার জন্য পুলিশের নিরস্ত্র করা হবে যদিও তারা সাহায্য করার প্রতিশ্রুতি দিয়েছে এবং ব্যাংকের ম্যানেজারকে এনে স্ট্রংরুম খুলে টাকা ও সোনাদানা নিয়ে যাওয়া হবে।[৩৮৩] ১৯ এপ্রিল সন্ধ্যার পূর্ব মূহুর্তে এম.এন.এ গফুর ও সুবেদার আয়ুবের নেতৃত্বে ৩০/৩৫ জন সশস্ত্র ই.পি.আর যুবনেতা সালাম, মুস্তাফিজ, হাবল্লু, মাসুদ, এনামুল, খসরু, কামাল প্রমুখ এক দুঃসাহসিক অভিযানের প্রস্তুতি নেয়।[৩৮৪] সবার মনে যেমন উদ্যম ও আনন্দ বিরাজ করছে তেমনি দেশের জন্য তারা ব্যাংক অপারেশনে যাচ্ছে এর জন্য অনেক শঙ্কাও কাজ করছে। রাত ৮ টায় এম.এন.এ গফুর ও সুবেদার আয়ুব সাতক্ষীরার এস.ডি.ও এর জীপ, ওয়াপদার জীপ এবং পাবলিক হেলথ এর একটা পিকআপ ভ্যানসহ ব্যাংকের সামনের দরজায় আসেন এবং এই অভিযানের দুই নেতা এম.এন.এ গফুর ও সুবেদার আয়ুব আলী আগের পরিকল্পনা অনুযায়ী সুকৌশলে পুলিশদেরকে নিরস্ত্র করে তালা ভেঙ্গে ব্যাংকে ঢোকেন।[৩৮৫] কিন্তু সমস্যাটা হল স্ট্রংরুমের তালার আকার অভাবনীয় রকমের বড় যেটা দেখে সবাই অবাক।[৩৮৬] এত বড় তালা ভাঙ্গা সম্ভব নয় বলে ব্যাংকের ম্যানেজার কে চাবিসহ ধরে আনার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয় এবং সিদ্ধান্ত অনুযায়ী সুবেদার আয়ুব জীপ ম্যানেজারকে আনতে যান।[৩৮৭] অন্যদিকে এম.এন.এ গফুর সহ অন্যান্যরা চেষ্টা চালিয়ে যেতে থাকেন। সেজন্য খুব দ্রুত একটা লোহার শাবল যোগাড় করে তালা ভাঙ্গা, ভোল্ট ও হ্যান্ডেল খোলার চেষ্টা করা হয় কিন্তু সমস্যা আরও জটিল আকার ধারন করে, তালা ভাঙ্গলো না।[৩৮৮] অন্যদিকে সুবেদার যখন ম্যানেজারকে আনলেন তখন ভোল্ট ও হ্যান্ডেল বেকে যাবার কারণে চাবি দিয়েও তালা খুলল না।[৩৮৯] সুতরাং স্ট্রংরুম ভাঙ্গা ছাড়া আর কোন উপায় নেই। সবাই তারা চরম উত্তেজনার মধ্যে সময় পার করে। শাবল কুড়াল যোগাড় করে স্ট্রংরুম ভাঙ্গার কাজ শুরু হয় কিন্তু অবশেষে আরও বড় বিপদ দেখা দিল। ওদিকে খবর পাওয়া যায় যশোর থেকে মিলিটারী আসতেছে। স্ট্রংরুমের সবদিকেই মোটা লোহার রডের নেট। তাই সবাই হ্যাকস ব্লেড যোগাড় করার সিদ্ধান্ত নেয় এবং কয়েকটা হ্যাকস ব্লেড পাওয়া যায় এবং রড কেটে স্ট্রংরুমের ভিতর ঢোকা সম্ভব হয়।[৩৯০] অবশেষে পাওয়া যায় সেই কাঙ্খিত টাকা যেটা দেশ মাতৃকার কল্যাণে ব্যয়িত হবে। টাকা বের করে প্রথম পুরো এক জীপ টাকা সুবেদার আয়ুব নিয়ে চলে গেলেন ভোমরায়, দ্বিতীয় জীপ ভর্তি টাকা নিয়ে গেলেন এম.এন.এ

---

[৩৮১] স.ম. বাবর আলী 'প্রাগুক্ত' পৃষ্ঠা- ১৮৬। আরও দেখবেন, মীর মুস্তাক আহমেদ রবি, চেতনায় একাত্তর, জোনাকী প্রকাশনী, পৃষ্ঠা-৫৫।
[৩৮২] ঐ।
[৩৮৩] ঐ।
[৩৮৪] ঐ।
[৩৮৫] মীর মুস্তাক আহমেদ রবি, 'প্রাগুক্ত' পৃষ্ঠা-৫৬।
[৩৮৬] মীর মুস্তাক আহমেদ রবি, 'প্রাগুক্ত' পৃষ্ঠা-৫৭।
[৩৮৭] ঐ।
[৩৮৮] স.ম. বাবর আলী 'প্রাগুক্ত' পৃষ্ঠা- ১৮৬।
[৩৮৯] স.ম. বাবর আলী 'প্রাগুক্ত' পৃষ্ঠা- ১৮৬।
[৩৯০] স.ম. বাবর আলী 'প্রাগুক্ত' পৃষ্ঠা- ১৮৬।

Dhaka University Institutional Repository

গফুর এবং পরে ট্রাকে করে ভোমরা কাস্টম অফিসে বাকীরা সবাই এলেন। সিদ্ধান্ত নেওয়া হল ২০ এপ্রিল সকাল বেলা ২টায় ভারতের বসিরহাটের এস.ডি.ও এর নিকট জমা প্রদান করে এম.এন.এ গফুর ও সুবেদার আয়ুব।[৩৯১] অতঃপর রিজার্ভ ব্যাংক অব ইন্ডিয়ার ৮০ জন অফিসার টাকা গুনে ১,৭৫,০০,০০০/- (এক কোটি পঁচাত্তর লক্ষ) টাকা বাংলাদেশ সরকারের নামে জমা করেন।[৩৯২] মোট কথা, সাতক্ষীরার ন্যাশনাল ব্যাংক অপারেশন মুক্তিযোদ্ধাদের এক দুঃসাহসিক অভিযান। আর এ অভিযানের সফলতা মুক্তিযোদ্ধাদের আরও অনুপ্রাণিত করে এবং তাদের মনে অসীম সাহসিকতা ও যুদ্ধ জয়ের তীব্র আকাঙ্খা এনে দেয়। এ গুরুত্বপূর্ণ অভিযান বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধের ইতিহাসে অবিস্মরণীয় হয়ে থাকবে। এই টাকার সাথে আরও সাত লক্ষ টাকা যোগ হয় এবং এক কোটি বিরাশি লক্ষ টাকা দিয়েই নবগঠিত বাংলাদেশ সরকার তার নবযাত্রা শুরু করে।[৩৯৩]

সাতক্ষীরা সদর উপজেলাঃ

৩.১১ ভোমরা আক্রমণ

ভোমরা গ্রামটি বাংলাদেশ ও ভারতের সীমান্তবর্তী একটি গ্রাম। কিন্তু সীমান্তবর্তী গ্রাম হলেও সুনির্দিষ্ট সীমানা ছিল না এবং অবাধে এপার ওপারের লোকজন যাতায়াত করতো। এম.এন.এ গফুর ও সুবেদার আয়ুবের নেতৃত্বে ভোমরা কাস্টমস অফিসকে কেন্দ্র করে শক্তিশালী মুক্তিবাহিনীর ক্যাম্প গড়ে ওঠে।[৩৯৪] ভোমরায় মুক্তিযোদ্ধা ক্যাম্পে সাতক্ষীরার আওয়ামীলীগ, নেতৃবৃন্দ ও ছাত্রলীগ নেতৃবৃন্দ একত্রিত হয়ে স্বাধীনতার পরবর্তী কার্যক্রম পরিচালনা করে।[৩৯৫] মুক্তিযুদ্ধের প্রাথমিক পর্যায়ে ভোমরার ই.পি.আর দের সহায়তায় মুক্তিবাহিনী অস্ত্র প্রশিক্ষণ নেওয়া শুরু করে এবং সাথে সাথে আওয়ামীলীগের নেতা কর্মীরা, ছাত্রলীগের কর্মীরা অস্ত্র প্রশিক্ষণ এবং যুদ্ধবিদ্যা আয়ত্ত করতে থাকে।[৩৯৬] কিন্তু সাতক্ষীরা ট্রেজারী, টাকা সংগ্রহ ও ন্যাশনাল ব্যাংক অপারেশনের পর থেকে ভোমরা ক্যাম্প আরও তাৎপর্যপূর্ণ হয়ে উঠে এবং এই অপারেশনের অধিনায়করা এম.এন.এ গফুর ও সুবেদার আয়ুব সবাই ভোমরা ক্যাম্পে অবস্থান করে।[৩৯৭] ভোমরা ক্যাম্প অষ্টম ও নবম সেক্টর গড়ে উঠার পূর্বে এবং এটি প্রথম ক্যাম্প যেটি মুক্তিযুদ্ধের জন্য কোন সেক্টর গড়ে উঠার পূর্বে এবং আনুষ্ঠানিক ভাবে অন্য কোন ক্যাম্প গড়ে উঠার আগে এটি গড়ে উঠে।[৩৯৮] মুক্তিযুদ্ধে যোগ দিতে ইচ্ছুক ও

[৩৯১] সাক্ষাৎকার, প্রফেসর ড. এম.এ বারী।
[৩৯২] সাক্ষাৎকার, প্রফেসর ড. এম.এ বারী। আরও দেখবেন, স.ম. বাবর আলী 'প্রাগুক্ত' পৃষ্ঠা- ১৮৭, আর দেখবেন- প্রাগুক্ত পৃষ্ঠা- ৫৯।
[৩৯৩] সাক্ষাৎকার, প্রফেসর ড. এম.এ বারী। আরও দেখবেন, স.ম. বাবর আলী 'প্রাগুক্ত' পৃষ্ঠা- ১৮৭, আর দেখবেন- প্রাগুক্ত পৃষ্ঠা- ৫৯।
[৩৯৪] সাক্ষাৎকার, মোঃ গোলাম মোস্তফা, কমান্ডার, কলারোয়া উপজেলা। ০১/০৬/২০১৬ কলারোয়া।
[৩৯৫] স.ম. বাবর আলী, 'প্রাগুক্ত' পৃষ্ঠা- ১৯৭।
[৩৯৬] স.ম. বাবর আলী, 'প্রাগুক্ত' পৃষ্ঠা- ১৯৭।
[৩৯৭] সাক্ষাৎকার, মোঃ আইয়ুব আলী, মুক্তিযোদ্ধা, সহকারী কমান্ডার, কলারোয়া উপজেলা।
[৩৯৮] সাক্ষাৎকার, মোঃ আইয়ুব আলী, মুক্তিযোদ্ধা, সহকারী কমান্ডার, কলারোয়া উপজেলা।

Dhaka University Institutional Repository

যুদ্ধবিদ্যায় পারদর্শিতা অর্জনে আগ্রহী ৩০-৪০ জন যুবক ২৯ এপ্রিল প্যারেড শেষ করে অস্ত্রের প্রশিক্ষণ ক্লাস ও গুলি করার অভিজ্ঞতা অর্জন করে।[৩৯৯] ই.পি.আর এর কয়েকজন প্রশিক্ষক তাদেরকে আন্তরিকভাবে প্রশিক্ষণ প্রদান করে।[৪০০] ২৯ এপ্রিল সকাল ৯টার দিকে মুস্তাফিজ, কামরুল, সালাম, ইউনুস ভাই, স.ম. বাবর আলীসহ অন্যান্যরা রুটিন ওয়ার্ক শেষে ভোমরা পুকুর পাড়ে গোসল করতে যায় এবং অস্ত্র পরিচালনা, প্রশিক্ষণসহ বিভিন্ন বিষয়ে আলাপ আলোচনা করতে থাকে।[৪০১] কিন্তু সকাল ১০টার দিকে আকস্মিকভাবে গুলির আওয়াজ শুরু হয় এবং নতুন অস্ত্র শিক্ষার্থীরা খুব তাড়াতাড়ি ভোমরা থেকে দৌড়ে ভোমরা খালপার হয়ে রাস্তার ওপারে গিয়ে ই.পি.আরদের সাথে মিশে যুদ্ধ শুরু করে।[৪০২] এটি পাকিস্তানী বাহিনীর সাথে অষ্টম ও নবম সেক্টরের মুক্তিযোদ্ধাদের প্রথম মুখোমুখি সংঘর্ষ এবং ই.পি.আর বাহিনী তখন দক্ষতার সাথে গোলাগুলি করতে থাকে।[৪০৩] কিন্তু অত্যন্ত দুঃখের বিষয় পাকিস্তানী সেনারা গাড়ীযোগে ভোমরায় আসে অথচ কেউ তাদেরকে কোন বার্তা দেয়নি।[৪০৪] যুদ্ধটি প্রায় ২ ঘন্টা পর্যন্ত স্থায়ী হয় এবং অবশেষে পাকিস্তানী হানাদার বাহিনী পিছু হটতে বাধ্য হয় এবং তারা ভোমরা ত্যাগ করে আবার সাতক্ষীরায় ফিরে যায়।[৪০৫] এই যুদ্ধ সুবেদার আয়ুবের নেতৃত্বে পরিচালিত হয় এবং ই.পি.আর রাই প্রধান ভূমিকা পালন করে।[৪০৬] এই যুদ্ধে ইফু মিয়া নামক একজন ই.পি.আর সদস্য মারা যান এবং তিনি সরাসরি যুদ্ধে মুক্তিবাহিনীর প্রথম শহীদ।[৪০৭] প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত যুবকেরা তাৎপর্যপূর্ণ ভূমিকা রাখে ই.পি.আর দের সহযোগিতা করার মাধ্যমে এবং তারা যুদ্ধক্ষেত্রে অস্ত্র চালনায় অভিজ্ঞতা অর্জন করে।[৪০৮] কিন্তু অত্যন্ত আশার বিষয় এই যে, ভোমরা ক্যাম্প অক্ষত থাকে এবং তেমন কোন ক্ষতি সাধন হয়নি ভোমরা ক্যাম্পে। তবে এই যুদ্ধ মুক্তিবাহিনীদেরকে সর্বক্ষণিক সতর্ক থাকার শিক্ষা দেয় যাতে যেকোন মূহুর্তে পাকিস্তানী সেনাদেরকে প্রতিহত করা সম্ভব হয়। এই যুদ্ধের পর থেকে প্রশিক্ষণ আরও কড়া হয়ে যায় এবং যেসব ছাত্র যুবক কষ্ট স্বীকার এবং কঠিন নিয়ম শৃঙ্খলা মেনে নিতে অপারগ তারা ক্যাম্প ছেড়ে অন্যত্র চলে যায়।[৪০৯] এদিকে ক্যাপ্টেন সালাহ উদ্দীন ও মেহেরপুরের তরুন এস.ডি.পি ও মাহবুব সহ মেজর আবু ওসমানের নেতৃত্বে কুষ্টিয়া থেকে ই.পি.আর এর এক বাহিনী ইটিন্ডিয়ায় চলে আসে। সাথে আরও থাকেন যশোরের তরুণ ছাত্রনেতা ও যোদ্ধা এ.এফ.এম. মুরাদ।[৪১০] যার ফলে

[৩৯৯] মোসলেম আলী হাজরা, কেঁড়াগাছি, কলারোয়া। ৩০/০৬/২০১৬ কেড়াগাছি।
[৪০০] মোসলেম আলী হাজরা, কেঁড়াগাছি, কলারোয়া।
[৪০১] সাক্ষাৎকার, মোঃ শাহজাহান আলী, কলারোয়া।
[৪০২] মোঃ আবু বকর সিদ্দিক, জেলা ডেপুটি কমান্ডার, সাতক্ষীরা। ৩০/০৬/২০১৬ পলাশপোল, সাতক্ষীরা।
[৪০৩] মোঃ আবু বকর সিদ্দিক, জেলা ডেপুটি কমান্ডার, সাতক্ষীরা।
[৪০৪] মোঃ আবু বকর সিদ্দিক, জেলা ডেপুটি কমান্ডার, সাতক্ষীরা।
[৪০৫] সাক্ষাৎকার, মোঃ আইয়ুব আলী, মুক্তিযোদ্ধা, সহকারী কমান্ডার, কলারোয়া উপজেলা।
[৪০৬] সাক্ষাৎকার, মোঃ আইয়ুব আলী, মুক্তিযোদ্ধা, সহকারী কমান্ডার, কলারোয়া উপজেলা।
[৪০৭] সাক্ষাৎকার, মোঃ আইয়ুব আলী, মুক্তিযোদ্ধা, সহকারী কমান্ডার, কলারোয়া উপজেলা।
[৪০৮] সাক্ষাৎকার, মোঃ আব্দুল মাজেদ, কলারোয়া। ৩০/০৬/২০১৬ কেড়াগাছি।
[৪০৯] সাক্ষাৎকার, মোঃ আব্দুল মাজেদ, কলারোয়া।
[৪১০] সাক্ষাৎকার, শাহাজাহান আলী, কেঁড়াগাছী, কলারোয়া।

Dhaka University Institutional Repository

ক্যাম্পে সবার মধ্যে উৎসাহ বেড়ে যায় সাথে অস্ত্র, জনবল, মনোবল সবই বেড়ে যায়।[৪১১] ২৯ মে পাকিস্তানী হানাদার বাহিনী আবার ভোমরা প্রতিরক্ষা ক্যাম্প আক্রমণ করে যেটি আকস্মিক।[৪১২] তবে যেকোন মূহুর্তে যে ভোমরা ক্যাম্প আবার আক্রমণ করবে মুক্তিযোদ্ধাদের সেটি অজানা নয়। এই যুদ্ধে পাকিস্তানী সেনারা মুক্তিবাহিনীর উপর অতি আধুনিক সমরাস্ত্র, সৈন্য এবং ভারী ভারী সব অস্ত্র নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ে। কিন্তু এতদিনে মুক্তিবাহিনী কঠোর প্রশিক্ষণের মাধ্যমে যুদ্ধ ও অস্ত্র পরিচালনায় পারদর্শী হয়ে উঠে।[৪১৩] এই যুদ্ধেও শক্তিশালী ই.পি.আর বাহিনী অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ এবং উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করে। ক্যাপ্টেন সালাউদ্দীন এস.ডি.পি ও মাহবুবের নেতৃত্বে যুদ্ধ পরিচালিত হয় এবং সুবেদার আয়ুব আলী, সুবেদার শামসুল হক ও সুবেদার আব্দুল জব্বার ও যুদ্ধ পরিচালনায় তাকে সাহায্য করে।[৪১৪] এছাড়া নতুন প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত মুক্তিযোদ্ধারা, প্রায় দুই কোম্পানী ই.পি.আর মুজাহিদ যুদ্ধ পরিচালনায় অংশ নেয়।[৪১৫] প্রায় ১৬/১৭ ঘন্টা যাবৎ যুদ্ধ সংঘটিত হয় এবং প্রথম চার ঘন্টায় পাকিস্তানী হানাদার অত্যন্ত দুৎসাহসিকভাবে মুক্তিবাহিনীর উপর অভিযান চালায়।[৪১৬] এদিকে মুক্তিবাহিনী উচু রাস্তার পেছনে বাঙ্কার ও ট্রেঞ্চে অবস্থান নিয়ে অত্যন্ত দক্ষতা, সাহস এবং নির্ভয়তার সাথে খানসেনাদের সাথে লড়াই চালিয়ে যায়। কিন্তু যখন হানাদার বাহিনী ক্রলিং করে মুক্তিবাহিনীর ক্যাম্পের দিকে অগ্রসর হতে থাকে তখন মুক্তিবাহিনী এলোপাতাড়ি ভাবে গুলিবর্ষণ করতে থাকে। পাকিস্তানী বাহিনীর ক্যাপ্টেন প্রথম গুলিবিদ্ধ হয়ে গুরুতর আহত হয়ে তার বাহিনীকে নির্দেশ দেয় "ইয়ার হামকো গুলি লাগা, তুম সব আগে বাড়ো"।[৪১৭] অর্থাৎ বন্ধুগণ আমার গুলি লেগেছে তোমরা সবাই এগিয়ে যাও। কিন্তু তারপর সে মারা যায় এবং এই যুদ্ধে ২২ এফ.এফ বাহিনীর একজন ক্যাপ্টেনসহ ৩/৪ জন মারা যায়।[৪১৮] এদিকে ক্যাপ্টেন নিহত হওয়ায় মুক্তিবাহিনীর উল্লাস বেড়ে যায় এবং ক্যাপ্টেনের লাশ আনার জন্য কয়েকজন মুক্তিযোদ্ধা অগ্রসর হয়। কিন্তু অত্যন্ত পরিতাপের বিষয় এই পাক ক্যাপ্টেনের লাশ আনতে গিয়ে তিনজন বীর মুক্তিযোদ্ধা শহীদ হন।[৪১৯] লাশ আনতে গিয়ে তিনটি গুরুত্বপূর্ণ জীবন হারিয়ে মুক্তিযোদ্ধারা কিছুটা বিচলিত হয়ে যায় এবং শেষ পযন্ত পাক ক্যাপ্টেনের লাশ আনা হয়। সুবেদার আব্দুল জব্বারের পেটে গুলি লাগে এবং তিনি মারাত্মকভাবে আহত হলেও বেঁচে যান।[৪২০] এদিকে এ যুদ্ধে সুবেদার শামসুল হক বাঙ্কার থেকে মাথা তুলে এল.এম.জি চালাতে গিয়ে হঠাৎ করে পাকিস্তানী বাহিনীর গুলির আঘাতে তিনি প্রাণ ত্যাগ করেন।[৪২১]

---

[৪১১] সাক্ষাৎকার, শাহাজাহান আলী, কেঁড়াগাছী, কলারোয়া।
[৪১২] সাক্ষাৎকার, শাহাজাহান আলী, কেঁড়াগাছী, কলারোয়া। আরও দেখবেন, স.ম. বাবর আলী 'প্রাগুক্ত' পৃষ্ঠা- ১৯৮।
[৪১৩] সাক্ষাৎকার, মোঃ আইয়ুব আলী, মুক্তিযোদ্ধা, সহকারী কমান্ডার, কলারোয়া উপজেলা।
[৪১৪] সাক্ষাৎকার, মোঃ আইয়ুব আলী ।
[৪১৫] সাক্ষাৎকার, মোঃ আইয়ুব আলী ।
[৪১৬] সাক্ষাৎকার, মোঃ আইয়ুব আলী ।
[৪১৭] সাক্ষাৎকার, মোঃ আব্দুল মাজেদ, কলারোয়া।
[৪১৮] সাক্ষাৎকার, মোঃ আব্দুল মাজেদ, কলারোয়া।
[৪১৯] সাক্ষাৎকার, মোঃ আব্দুল মাজেদ, কলারোয়া।
[৪২০] মোঃ গোলাম মোস্তফা।
[৪২১] মোঃ গোলাম মোস্তফা।

Dhaka University Institutional Repository

এই যুদ্ধে পাকিস্তানী সেনারা পরাজিত হয় এবং তাদের অনেক ক্ষয়ক্ষতি হয়। অনেক খানসেনা মারা যায় তবে ঠিক কতজন মারা যায় তার সঠিক হিসাব জানা যায়নি। ধারণা করা হয় প্রায় ২০০ পাকিস্তানী হানাদার নিহত হয়। ভোমরা যুদ্ধে ই.পি.আর বাহিনীর দক্ষতা ও যুদ্ধের কৌশল প্রশংসিত হয় এবং পাকিস্তানী সেনাদের অনেক ক্ষতি হয়। খানসেনাদের মৃতদেহ ট্রাকের মাধ্যমে সাতক্ষীরা থেকে যশোর ক্যান্টনমেন্টে নেয়া হয় এবং ভোমরা থেকে সাতক্ষীরা পর্যন্ত মৃতদের রক্তে রাস্তা ভিজে যায়।[৪২২] ভোমরার মাটিতে পাকহানাদের রক্তের দাগ অনেকদিন স্থায়ী হয়। মুক্তিবাহিনী ও ই.পি.আরদের নিয়ে তৈরিকৃত প্রতিরক্ষা ক্যাম্পটি অনেক শক্তিশালী ছিল বিধায় পাকিস্তানী সেনারা ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতির সম্মুখীন হয়। ভোমরা যুদ্ধে পাকিস্তানী হানাদার বাহিনী বারবার অসীম সাহসিকতা নিয়ে মুক্তিবাহিনীর উপর আক্রমণ চালায় কিন্তু ই.পি.আর ও মুক্তিবাহিনীর অসীম শৌর্যবীর্জ ও রণকৌশলের কাছে খানসেনাদের সব ধরনের অভিযান ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়। ই.পি.আর বাহিনীর সুবেদার হাসান উদ্দীন ফকির, সুবেদার আব্দুল জব্বার, সুবেদার রফিক, সুবেদার আব্দুল ওদুদ, নায়েব সুবেদার কাজী আলী মোস্তফা, জাবিউল লুৎফর রহমান, আব্দুল মান্নান (শহীদ), লুৎফর রহমান (আহত) নান্নু মিয়া, হাবিলদার তরিকুল্লাহ (শহীদ), দুদু মিয়া, মোহাম্মদ আশরাফ উদ্দীন, মোঃ ইউনুস, আব্দুল ওহিদ, মুজিবুর রহমান, হাবিলদার জব্বার, মহিউদ্দীন, সাহে আহমদ, বাচ্চু মিয়া, আব্দুর রাজ্জাকসহ অন্যান্য ই.পি.আরগণ অতীব তাৎপর্যপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন।[৪২৩] মুখোমুখি যুদ্ধে মুক্তিবাহিনীর রণকৌশল দেখে পাকিস্তানী হানাদার বুঝতে পারে, পূর্ব পাকিস্তানের গভর্নর জেনারেল টিক্কা খান বাঙালী জাতিকে এক মাসের মধ্যে চরম শিক্ষা দেবার জন্য যে ব্যবস্থা, মানসিকতা এবং নিরীহ বাঙালী জাতির উপর অত্যাচার, নির্যাতন, হত্যা করার যে পদক্ষেপ নিয়েছে তা অচিরেই ব্যর্থতায় পর্যবসিত হবে। এই যুদ্ধে মুক্তিবাহিনী ৯টি এল.এম.জি, দুই ইঞ্চি মটার, এস.এল.আর ৩০৩ রাইফেল ও গ্রেনেড ব্যবহার করে।[৪২৪] অন্যদিকে পাকিস্তানী হানাদার বাহিনী অটোমেটিক চাইনীজ রাইফেলসহ অন্যান্য আধুনিক অস্ত্র ব্যবহার করে।[৪২৫] তারা এ যুদ্ধে আদিকালের ৩০৩ রাইফেল ব্যবহার করেনি; কিন্তু মুক্তিযুদ্ধের শুরুর দিকে ৩০৩ রাইফেল মুক্তিবাহিনীর সবচেয়ে বড় অস্ত্র হিসেবে বিবেচিত হয়।[৪২৬] ই.পি.আর বাহিনী ছাড়া এ যুদ্ধে অন্যান্য যারা সাহসিকতার সাথে ভোমরা যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেন তারা হলেন- মোড়ল আঃ সালাম, কামরুল ইসলাম খান হাবুল, আব্দুল মোমেন, এনামুল হক, রবিউল, তিনু, কাজল (পরবর্তীতে শহীদ), মুস্তাফিজুর রহমান, এ.এফ.এম মুরাদ, নাজমুল (পরবর্তীতে শহীদ), মাসুদ, নারায়ন (পরবর্তীতে শহীদ), বণমালী, কামরুন্নেছা, শেখ জলিল, রশিদ, মনোরঞ্জন (পরবর্তীতে শহীদ), খায়রুল বাশার, স.ম. বাবর আলীসহ আরও অনেকে।[৩৯২] এছাড়া ভোমরা

[৪২২] মোঃ আব্দুল মাজেদ।
[৪২৩] মোঃ আব্দুল মাজেদ।
[৪২৪] মোঃ শাহজাহান আলী।
[৪২৫] মোঃ শাহজাহান আলী।
[৪২৬] মোঃ শাহজাহান আলী।

Dhaka University Institutional Repository

যুদ্ধে কলারোয়ার মোসলেম উদ্দীন ও আব্দুল গফফারের নেতৃত্বে শাহজাহান আলী আহমদ, এ.জেড নজরুল ইসলাম, আয়ুব আলী, রেজাউল হক, ডাঃ আবু ইব্রাহিম, শামসুর রহমান, আব্দুল মাজেদ প্রমুখ যুদ্ধে অংশ নেয় কিন্তু তাদের মধ্যে আব্দুল মাজেদ খানসেনাদের শেলের আঘাতে আহত হয়।[৪২৭]

সাতক্ষীরা সদর উপজেলা

৩.১২ মুক্তিযোদ্ধাদের সাতক্ষীরা পাওয়ার হাউজে দুঃসাহসিক অভিযান

নভেম্বর মাসের সপ্তাহের কথা, ঘোনা ক্যাম্পে সোনামিয়া, আব্দুল মালেক, আব্দুল্লাহ, গোঁরচন্দ্র, আব্দুল মান্নান, রফিক, হরিপদ, আশরাফ হোসেন অছু, অরুন কুমার, কাছেম আলী ও কামরুজ্জামান বাবু বসে আছে।[৪২৮] প্রতিদিন ও তার বিভিন্ন অভিযানের কর্মসূচী থাকে, কোনদিন তারা পাকিস্তানী হানাদার বাহিনীদের শিবিরে গ্রেনেড হামলা চালায়, কখনও বা পাকিস্তানী সেনাদের ডিউটিরত প্যাট্রল পার্টির উপর হামলা চালায় আবার কোনদিন অত্যাচারী, পিশাচ রাজাকারদের উপর আক্রমণ চালায়।[৪২৯] কিন্তু এদিন তারা কোন কাজে ব্যস্ত নেই ফলে দুঃসাহসিক, দক্ষ, পরিশ্রমী এই মুক্তিবাহিনী "কি করা যায়" এটি নিয়ে আলোচনা করে। মূলত অলস ভাবে বসে থাকাটা তারা কিছুতেই মেনে নিতে পারে না। ঠিক এই সময় তারা দেখে, সাতক্ষীরা নিবাসী অ্যাডভোকেট কালিপদ রায় চৌধুরীর ছেলে মলয় তাদের দিকে আসতে দেখে তারা সবাই তাকে স্বাগত জানায়। কুশল বিনিময়ের পর মলয় জানায়, নবম সেক্টরের অধিনায়ক মেজর জলিল সাতক্ষীরা শহর অভিযানের জন্য তাকে দুটি টাইম বোমা দিয়েছে এবং এটি কিভাবে কাজে লাগানো যায় সেটি আলোচনা করার জন্য সে এসেছে।[৪৩০] টাইম বোমার কথা শুনে মুক্তিযোদ্ধাদের সবাই উৎসাহিত ও পুলকিত হয় এবং তারা সবাই মিলে সিদ্ধান্ত নেয়, এই রাতেই সাতক্ষীরা শহর আক্রমণ করার। কিছু সময় পর মলয় দুটি টাইম বোমা নিয়ে আসে যা দেখতে ২ ব্যান্ডের রেডিও-র মতো এবং প্রত্যেক বোমার ওজন প্রায় ১২ পাউন্ড।[৪৩১] আবার আক্রমনে যেতে হবে এটি ভেবে সবাই উল্লাসিত হয়। রাত প্রায় ৯ টার দিকে মোট ১১ জন মুক্তিযোদ্ধা সাতক্ষীরা শহরে প্রবেশ করে।[৪৩২] কিন্তু দল ছোট করার জন্য শহরে ঢোকার আগেই রফিক, কামরুজ্জামান, বাবু এবং অরুন কুমার পথে থেকে যায়।[৪৩৩] একদিকে শহরের জলমল বৈদ্যুতিক আলো অন্যদিকে পুরাটা শহর মিলিটারী, রাজাকার আর শান্তিবাহিনীর দখলে এবং গোটা শহরের সব মোড়ে মিলিটারীরা তল্লাশী চালায়। এ অবস্থায় মুক্তিবাহিনীরা কি করবে তা বুঝতে পারে না। এদিকে পাকিস্তানী হানাদার বাহিনী একটি

[৪২৭] মোঃ শাহজাহান আলী।
[৪২৮] সাক্ষাৎকার, মোঃ আব্দুল মালেক সোনা, মুক্তিযোদ্ধা, থানাঘাটা, সাতক্ষীরা, আরও দেখবেন- স.ম. বাবর আলী, প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা-২১৪
[৪২৯] সাক্ষাৎকার, মোঃ আব্দুল মালেক সোনা, মুক্তিযোদ্ধা, থানাঘাটা, সাতক্ষীরা। ঐ। ৩০/০৫/২০১৬ থানাঘাটা।
[৪৩০] সাক্ষাৎকার, মোঃ আব্দুল মালেক সোনা, মুক্তিযোদ্ধা, থানাঘাটা, সাতক্ষীরা। ঐ।
[৪৩১] সাক্ষাৎকার, মোঃ আব্দুল মালেক সোনা, মুক্তিযোদ্ধা, থানাঘাটা, সাতক্ষীরা।
[৪৩২] সাক্ষাৎকার, মোঃ আব্দুল মালেক সোনা, মুক্তিযোদ্ধা, থানাঘাটা, সাতক্ষীরা।
[৪৩৩] সাক্ষাৎকার, মোঃ আব্দুল মালেক সোনা, মুক্তিযোদ্ধা, থানাঘাটা, সাতক্ষীরা।

Dhaka University Institutional Repository

শক্তিশালী প্রতিরক্ষা ক্যাম্প স্থাপন করে। তাদের চোখ ফাঁকি দিয়ে মুক্তিবাহিনী খুব সাবধানে সাতক্ষীরা বালিকা বিদ্যালয়ে আসে এবং খালের ব্রিজ পার হয়। কিন্তু হঠাৎ একটা লোককে তাদের দিকে আসতে দেখে তারা একটি সরু গলির মধ্যে ঢুকে পড়ে এবং লোকটি চলে গেলে তারা বেরিয়ে আসে। প্রথমে মুক্তিবাহিনীরা সাতক্ষীরা কোর্ট বিল্ডিং আক্রমণ করার সিদ্ধান্ত নেয়, কিন্তু সাতক্ষীরা কোর্ট পুরো এলাকা জুড়ে বৈদ্যুতিক ঝলমলে আলো এবং নিঃচ্ছিদ্র পাহারার কারণে সিদ্ধান্ত পরিবর্তন করা হয়।[৪৩৪] আবার সিদ্ধান্ত হয়, সাতক্ষীরা ফুড অফিস উড়িয়ে দেবার কিন্তু এটা ততটা গুরুত্বপূর্ণ নয় বলে সবাই মনে করে।[৪৩৫] অবশেষে ঐ দিনের অপারেশনে গ্রুপ কমান্ডার একটা ভাল প্রস্তাব দেয়। তিনি বলেন সাতক্ষীরা শহর আক্রমণের সবচেয়ে বড় অসুবিধা বিদ্যুতের আলো, বিদ্যুতের আলো না থাকলে পাকিস্তানী হানাদারদের উপর আক্রমণ অনেকটা সহজ হবে।[৪৩৬] সুতরাং বৈদ্যুতিক আলোর উৎস সাতক্ষীরা পাওয়ার হাউজ উড়িয়ে দেওয়া যায়। এই সিদ্ধান্তে সবাই সম্মত হয়, কিন্তু এই আক্রমণ অনেক কঠিন কারণ নিঃচ্ছিদ্র পাহারা তার উপর বিদ্যুৎতের ঝলমল আলো। তারপরও মুক্তিসেনারা খুব সাহসিকতার সাথে গলি চোরাপথ পাড়ি দিয়ে শত্রু হায়েনার চোখে ধুলো দিয়ে রাত সাড়ে দশটায় দিকে পাওয়ার হাইজের কাটা তারের বেড়ার কাছে উপস্থিত হয়। বেড়া শক্তিশালী হওয়ার কারণে ঢোকাটা অনেক কঠিন ব্যাপার। এজন্য ঢোকার জায়গা খুজতে থাকে এবং কাতারী (তার কর্তন করার যন্ত্র বিশেষ) দিয়ে কেটে একজনের ঢোকার মত জায়গাটা বড় করা হয়। তারের বেড়ার পাশে প্রশস্ত ও গভীর পাকা ড্রেনে মুক্তিবাহিনী আশ্রয় নেয় এবং অন্যদিকে সোনামিয়া ও আব্দুল্লাহ সেই জায়গা দিয়ে খুব সাবধানে পাওয়ার হাউজের সীমানার মধ্যে প্রবেশ করে।[৪৩৭] মোঃ আব্দুল মালেক (সোনা) এবং আব্দুল্লাহ পাওয়ার হাউজে ঢুকে দেখে, কাটা তারের রোল করা বড় বড় বান্ডিল পড়ে আছে এবং মাথা সমান গাছের জঙ্গল আছে। অন্যদিকে অন্যান্য মুক্তিযোদ্ধারা ড্রেনে বসে এই দুজনের জন্য অপেক্ষা করতে থাকে। হঠাৎ তারা পাওয়ার হাউজ কর্মরত দুজন লোক দেখে এবং খুব সতর্কতার সাথে তারের বান্ডিলের পাশে তারা লেপ্টে পড়ে।[৪৩৮] প্রায় নিঃশ্বাস বন্ধ করে তারা এক সময় ইঞ্জিন রুমে ঢুকে পড়ে, এই ইঞ্জিন রুমটি কাটা তারের বেড়া থেকে ২০০ গজ দুরে এবং শ খানেক ব্যারেল ইঞ্জিন রুমের পাশে রাখা থাকে আর তহার ৫০ গজ দূরে টুলে বসে নিরাপত্তা প্রহরী ঝিমাতে থাকে।[৪৩৯] সোনামিয়া এবং আব্দুল্লাহ দেখে লোহার পাতের উপর মোট ৮টা জেনারেটর সেট রাখা আছে এবং নীচে ফাঁকা দেখতে পায় এবং এটি দেখে তারা দুজন সিদ্ধান্ত নেয় এই ফাঁকা জায়গাতে টাইম বোমা বসানোর।[৪৪০] তারা দ্রুত কাঁতারী দিয়ে ডেটোনেটারের মুখ কেটে মাত্র ৪ মিনিটে বোমা দুটি জায়গা মতো সেট করে ডেটোনেটারে আগুন লাগিয়ে দেয়।[৪৪১] এদিকে কুকুর খুব জোরে চিৎকার করতে

[৪৩৪] সাক্ষাৎকার, মোঃ আব্দুল মালেক সোনা, মুক্তিযোদ্ধা, থানাঘাটা, সাতক্ষীরা।
[৪৩৫] সাক্ষাৎকার, মোঃ আব্দুল মালেক সোনা, মুক্তিযোদ্ধা, থানাঘাটা, সাতক্ষীরা।
[৪৩৬] সাক্ষাৎকার, মোঃ আব্দুল মালেক সোনা, মুক্তিযোদ্ধা, থানাঘাটা, সাতক্ষীরা।
[৪৩৭] সাক্ষাৎকার, মোঃ আব্দুল মালেক সোনা, মুক্তিযোদ্ধা, থানাঘাটা, সাতক্ষীরা।
[৪৩৮] সাক্ষাৎকার, মোঃ আব্দুল মালেক সোনা, মুক্তিযোদ্ধা, থানাঘাটা, সাতক্ষীরা।
[৪৩৯] সাক্ষাৎকার, মোঃ আব্দুল মালেক সোনা, মুক্তিযোদ্ধা, থানাঘাটা, সাতক্ষীরা।
[৪৪০] সাক্ষাৎকার, মোঃ আব্দুল মালেক সোনা, মুক্তিযোদ্ধা, থানাঘাটা, সাতক্ষীরা।
[৪৪১] সাক্ষাৎকার, মোঃ আব্দুল মালেক সোনা, মুক্তিযোদ্ধা, থানাঘাটা, সাতক্ষীরা।

Dhaka University Institutional Repository

থাকে। রাত ১১:২০ মিনিটে বোমা দুটো সেট করে তারা খুব দ্রুত ষ্টেডিয়ামের পাশে আসে এবং স্বস্তিতে নিঃশ্বাস নেয় কারণ মাত্র আধ ঘন্টার মধ্যে বোমা দুটি বিস্ফোরিত হবার কথা।[৪৪২] স্টেডিয়ামের কাছে মুক্তিযোদ্ধা খায়রুল বাশারের বাসা এবং তিনি তখন ক্যাম্পে থাকায় আব্দুল্লাহ সিদ্ধান্ত নেয়, তার বাসায় একটি সংবাদ দেবার জন্য যে খায়রুল ভাই ক্যাম্পে নিরাপদে সুস্থ অবস্থায় আছে।[৪৪৩] আব্দুল্লাহ নিজে খায়রুল ভাইয়ের বাসায় গিয়ে দেখে মিটমিট হারিকেনের আলোয় তার ছোট ভাই আফজাল বই পড়ছে।[৪৪৪] কিন্তু আস্তে করে তাকে ডাকতেই সে প্রচন্ড ভয় পেয়ে বই, টেবিল হারিকেন সব উল্টে ফেলে দেয়। আব্দুল্লাহ খুব দ্রুত জানায় সে মুক্তিযোদ্ধা এবং খায়রুল ভাই ক্যাম্পে ভাল আছে এবং সুস্থ অবস্থায় আছে। এরপর সে দ্রুত সেখান থেকে বেরিয়ে পড়ে। এদিকে ঘড়িতে তখন রাত ১১:৪০ মিনিট এবং আর মাত্র ১০ মিনিটের মধ্যে বোমা দুটি বিস্ফোরিত হওয়ার কথা।[৪৪৫] খুব সতর্কতার সাথে তারা সাতক্ষীরা শহর পার হতে থাকে কিন্তু কিছু রাজাকার হঠাৎ লাঠি হাতে তাদেরকে "হল্ট" বলে থামিয়ে দেয়।[৪৪৬] সোনামিয়া তখন কৌশল অবলম্বন করে রাজাকারদের বুঝিয়ে দেয়। এদিকে ঠিক যখন রাত ১১:৫০ মিনিট তখন বোমা দুটি আকাশ বাতাস কাঁপিয়ে বিস্ফোরিত হয় এবং ফলে পুরো সাতক্ষীরা শহর কেঁপে ওঠে।[৪৪৭] একের পর এক ডিজেল ব্যারেলে আগুন লেগে তার লেলিহার শিখায় রক্তবর্ণ ধারণ করে পুরো পাওয়ার হাউজ এলাকায় এবং অনেক দুর থেকে সেটা দৃষ্টি গোচর হয়। তখন মিলিটারী ও রাজাকার ক্যাম্প থেকে অনবরত গুলি চালাতে থাকে।[৪৪৮] রাত যখন ১২টা তখন মুক্তিযোদ্ধারা তোজাম্মেল হোসেন এর বাড়ি গিয়ে পান্তা ভাত খায়।[৪৪৯] গোলাগুলি থামার পর মুক্তিযোদ্ধারা রজব আলী ও মোক্তার সরদার প্রমুখের বাড়ি আশ্রয় নেয়।[৪৫০] পরদিন মুক্তিযোদ্ধারা জানতে পারে তাদের সেট করা বোমা বিস্ফোরিত হয়ে পাওয়ার হাউজের এমন ক্ষতি হয়েছে যে, আগামী ২-১ মাসের মধ্যে তা ঠিক করা সম্ভব নয়।[৪৫১] এ খবর শুনে মুক্তিযোদ্ধারা উল্লাসিত হয় এং নতুন উদ্যেমে তারা বিভিন্ন অভিযানে ঝাঁপিয়ে পড়ে। কিন্তু দুঃখের বিষয় এ ঘটনায় জড়িত থাকার সন্দেহে, পাওয়া হাউজের হেড ক্লার্ক ও কিছু কর্মচারীকে মিলিটারীরা পিটিয়ে মেরে ফেলে দেয়।[৪৫২] নিরীহ কর্মচারীদের এই নির্মম নিষ্ঠুর হত্যায় মুক্তিযোদ্ধারা অত্যন্ত ব্যথিত হয়।

[৪৪২] সাক্ষাৎকার, মোঃ আব্দুল মালেক সোনা, মুক্তিযোদ্ধা, থানাঘাটা, সাতক্ষীরা।
[৪৪৩] সাক্ষাৎকার, মোঃ আব্দুল মালেক সোনা, মুক্তিযোদ্ধা, থানাঘাটা, সাতক্ষীরা।
[৪৪৪] সাক্ষাৎকার, মোঃ আব্দুল মালেক সোনা, মুক্তিযোদ্ধা, থানাঘাটা, সাতক্ষীরা।
[৪৪৫] সাক্ষাৎকার, মোঃ আব্দুল মালেক সোনা, মুক্তিযোদ্ধা, থানাঘাটা, সাতক্ষীরা।
[৪৪৬] সাক্ষাৎকার, মোঃ আব্দুল মালেক সোনা, মুক্তিযোদ্ধা, থানাঘাটা, সাতক্ষীরা।
[৪৪৭] সাক্ষাৎকার, মোঃ আব্দুল মালেক সোনা, মুক্তিযোদ্ধা, থানাঘাটা, সাতক্ষীরা।
[৪৪৮] সাক্ষাৎকার, মোঃ আব্দুল মালেক সোনা, মুক্তিযোদ্ধা, থানাঘাটা, সাতক্ষীরা।
[৪৪৯] সাক্ষাৎকার, মোঃ আব্দুল মালেক সোনা, মুক্তিযোদ্ধা, থানাঘাটা, সাতক্ষীরা।
[৪৫০] সাক্ষাৎকার, মোঃ আব্দুল মালেক সোনা, মুক্তিযোদ্ধা, থানাঘাটা, সাতক্ষীরা।
[৪৫১] সাক্ষাৎকার, মোঃ আব্দুল মালেক সোনা, মুক্তিযোদ্ধা, থানাঘাটা, সাতক্ষীরা। আরও দেখবেন- স.ম. বাবর আলী, প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা-২১৫
[৪৫২] সাক্ষাৎকার, মোঃ আব্দুল মালেক সোনা, মুক্তিযোদ্ধা, থানাঘাটা, সাতক্ষীরা। আরও দেখবেন- স.ম. বাবর আলী, প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা-২১৫

Dhaka University Institutional Repository

সাতক্ষীরা সদর উপজেলা

৩.১৩ মাধবকাটি অভিযান

মাধবকাটি, সাতক্ষীরা সদর উপজেলার অদুরে অবস্থিত একটি ছোট গ্রাম। এখানে একটি খেলার মাঠ, বাজার, শ্মশান ঘাট ও পশ্চিম পাশে খাল আছে। ১৯৭১ সালে মুক্তিযুদ্ধের সময় মাধবকাটি বাজারে রাজাকারদের একটি ক্যাম্প গড়ে ওঠে, এই ক্যাম্পের কমান্ডার জহুরুল হক ওরফে টিক্কা খান। এই ক্যাম্পের এক দূর্ধর্ষ রাজাকার আতিয়ার রহমান এর নেতৃত্বে রাজাকাররা স্থানীয় আকড়া খোলা বাজার ও মাধবকাটি বাজারে গিয়ে সাধারণ মানুষের উপর অত্যাচার, নির্যাতন করতো, জিনিসপত্র লুট, গরু-ছাগল ধরা এবং বিক্রেতাদের কাছে থেকে জোর পূর্বক জিনিসপত্র কেড়ে নিতে থাকে।[৪৫৩] এদের অত্যাচারে সাধারণ মানুষের জীবন অতিষ্ঠ হয়ে পড়ে। রাজাকারদের অত্যাচার ও জুলুমের খবর মুক্তিযোদ্ধাদের কাছে পৌছে যায় এবং মধ্যভাগে পরিকল্পনা অনুসারে ই,পি,আর সুবেদার দুদু মিয়া ও কমান্ডার হাসান-উজ-জামান এর যৌথ নেতৃেত্বে মুক্তিবাহিনী মাধবকাটি বাজারে রাজাকার ক্যাম্পে অভিযান চালায়।[৪৫৪] মুক্তিযোদ্ধাদের দুর্বার আক্রমণে রাজাকাররা পরাজিত হয় এবং তাদের ক্যাম্প ছেড়ে পাশ্ববর্তী গ্রামগুলোতে লুকিয়ে পড়ে। কিন্তু অত্যন্ত পরিতাপের বিখয় মাধবকাটির যুদ্ধে কমান্ডার হাসান-উজ-জামান, দুদু মিয়া ও দুলাল চন্দ্র মারাত্মক আহত হয়।[৪৫৫] এ যুদ্ধের পর থেকে এ ক্যাম্পের রাজাকারদের অত্যাচার কমে যায়।

সাতক্ষীরা সদর উপজেলা

৩.১৪ বৈকারীতে মুক্তিযুদ্ধ

সাতক্ষীরা থেকে প্রায় ১৪ মাইল দুরবর্তী একটি স্থান বৈকারী এবং ১৯৭১ সালে মুক্তিযুদ্ধের সময় পাকিস্তানী হানাদার বাহিনী এখানে একটি ক্যাম্প স্থাপন করে। এটি হিন্দুদের পরিত্যক্ত একটি ১০ কক্ষ বিশিষ্ট দ্বিতল বাড়ি এবং এখান থেকে বেশ কিছু দুরে ভারতের কৈজুড়ি নামক স্থানে মুক্তিবাহিনী ক্যাম্প স্থাপন করে।[৪৫৬] এই ক্যাম্পের নেতৃত্বে ক্যাপ্টেন মাহবুব একদিন বেলা ২:৩০ মিনিটে তিনি উপস্থিত মুক্তিযোদ্ধাদেরকে একটি খুব গুরুত্বপূর্ণ অভিযানে যাবার জন্য সবাইকে প্রস্তুত হতে বলেন। অপারেশনের জন্য একটি জায়গা নির্ধারণ করা হয় এবং জায়গাটি ভারত দিয়ে তিনদিক থেকে ঘেরা।[৪৫৭] মুক্তিযোদ্ধা পাকিস্তানী সেনাদেরকে বিভ্রান্ত করার

[৪৫৩] সাক্ষাৎকার, মোঃ গোলাম মোস্তফা। ১৭/০৫/২০১৬ থানাঘাটা। আরও দেখবেন- মোঃ আবুল হোসেন, প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা-২১৩
[৪৫৪] সাক্ষাৎকার, মোঃ গোলাম মোস্তফা। আরও দেখবেন- মোঃ আবুল হোসেন, প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা-২১৩
[৪৫৫] মোঃ হাসানুজ্জামান- থানাঘাটা, সাতক্ষীরা।
[৪৫৬] সাক্ষাৎকার, মোঃ আইয়ুব আলী বিশ্বাস, মুক্তিযোদ্ধা, বোয়ালিয়া, কলারোয়া। ১৫/০৪/২০১৬ বৈকারী।
[৪৫৭] সাক্ষাৎকার, আব্দুল জব্বার, মুক্তিযোদ্ধা, বৈদ্যপুর, কলারোয়া। ১৫/০৪/২০১৬ বৈকারী।

Dhaka University Institutional Repository

জন্য বৈকারী ক্যাম্প থেকে ১০০০ গজ দুরে বাংলাদেশের পতাকা উত্তোলন করে।[৪৫৮] বাংলাদেশের পতাকা দেখলেই পাকিস্তানী হানাদার বাহিনীর মাথা গরম হয়ে যায় এবং দ্বিগ্বিদিক জ্ঞান হারিয়ে ফেলে। তাই বকের ঠোঁটের মতো স্থানের দুধারে মুক্তিযোদ্ধা এল.এম.জি নিয়ে চুপিচুপি অপেক্ষা করতে থাকে কারণ একটা সময় খানসেনারা বাংলাদেশের পতাকা নামাতে অগ্রসর হবে।ক্যাপ্টেন মাহবুব নিশ্চিত ভাবে জানতেন, বৈকারী মুক্তিযোদ্ধাদের ফাঁদে পাকিস্তানী হানাদার বাহিনী অতি সহজেই পরাস্ত হবে। কারণ পাকিস্তানী হানাদার বাহিনী তাদের জাতীয় পতাকাকে মন প্রাণ দিয়ে ভালবাসে। ঠিক তেমনি বাংলাদেশের জাতীয় পতাকাকে প্রচন্ড ঘৃণা করতো। জাতীয় পতাকা একটি দেশের স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্বের প্রতীক এবং সে পতাকার সম্মান রক্ষা করা সেনাবাহিনীর প্রধান দায়িত্ব। সুতরাং যেকোন দেশের জাতীয় পতাকাকে সে দেশের সেনাবাহিনী সর্বোচ্চ সম্মান প্রদর্শন করবে এটাই স্বাভাবিক। তাই যেখানে নিজের দেশের পতাকা উড়ানোর কথা, সেখানে অন্য দেশের পতাকা উড়ানো দেখলে দ্বিগ্বিদিক শূন্য হয়ে যাবে এটা অস্বাভাবিক কিছু নয় কারণ সেক্ষেত্রে দেশের স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্ব প্রশ্নের সম্মুখিন হয়। এজন্য পাকিস্তানী হানাদার বাহিনী বাংলাদেশের জাতীয় পতাকাকে কখনও গ্রহন করতে পারে না। ক্যাপ্টেন মাহবুব পরিকল্পনা করেন পাকসেনাবাহিনী এই দূর্বলতম স্থানে আঘাত এনে কিভাবে তাদেরকে ফাঁদে ফেলার রণকৌশল অবলম্বর করা যায়।[৪৫৯] সুবেদার তবারক উল্লাহ কাথুন্ডা ও ঘোনার নিকটে বৈকারী রাস্তার এন্টি ট্যাংকমাইন মাটিতে পুতে রাখে যাতে পাকিস্তানী হানাদার বাহিনী অপারেশন স্পটে এসে আর পেছনে ফিরে যেতে না পারে।[৪৬০] খানসেনাদের ফাঁদে ফেলানোর জন্য মুক্তিযোদ্ধাদের এই পরিকল্পনাটা অতি গোপনীয় ভাবে করা হয়। এদিকে বাংলাদেশের জাতীয় পতাকা উড়াতে দেখে পাকিস্তানী সেনাদের রক্ত গরম হয়ে যায় এবং তারা সবাই পতাকা নামানোর জন্য অপারেশন স্পটে যায়। মক্তিযোদ্ধারা এতক্ষণ এল.এম.জি নিয়ে পাকিস্তানী সেনাদের জন্য অপেক্ষা করতে থাকে।[৪৬১] পাকিস্তানী সেনারা আসার পর এল.এম.জি গুলো একসাথে গর্জে ওঠে, যার ফলে পাকিস্তানী সেনারা পাল্টা আক্রমণ করার সুযোগ পায় না। এল.এম.জি গুলিতে ৭ জন পাকিস্তানী সেনার শরীর ক্ষতবিক্ষত হয়ে বিশাল এক রক্তপিন্ডে পরিণত হয় এবং ঘটনাস্থলে ৭ জন খানসেনা নিহত হয়।[৪৬২] বাকী পাকিস্তানী সেনারা আতংকিত হয়ে বৈকারীতে ফিরে যায়, কিন্তু রাস্তায় মাটিতে পুঁতে রাখা ট্যাংক বিধ্বংসী মাইন গর্জে ওঠে।[৪৬৩] ধ্বংস হয়ে যায় পাকিস্তানী সেনাদের দুটো কনভয় এবং ২৫-৩০ জন খানসেনা নিহত হয়।[৪৬৪] খানসেনারা এই যুদ্ধে বিরাট ভাবে পরাস্ত হয় এবং একজন খান সেনারও জীবন বাঁচেনি এবং তাদের যুদ্ধ করার সাধ চিরতরে

[৪৫৮] সাক্ষাৎকার, আব্দুল জব্বার, মুক্তিযোদ্ধা, বৈদ্যপুর, কলারোয়া।
[৪৫৯] সাক্ষাৎকার, আব্দুল জব্বার, মুক্তিযোদ্ধা, বৈদ্যপুর, কলারোয়া।
[৪৬০] সাক্ষাৎকার, মোঃ গোলাম মোস্তফা, মুক্তিযোদ্ধা উপজেলা কমান্ডার, কলারোয়া। ১৭/০৫/২০১৬ কলারোয়া।
[৪৬১] সাক্ষাৎকার, মোঃ গোলাম মোস্তফা, মুক্তিযোদ্ধা উপজেলা কমান্ডার, কলারোয়া।
[৪৬২] সাক্ষাৎকার, মোঃ গোলাম মোস্তফা, মুক্তিযোদ্ধা উপজেলা কমান্ডার, কলারোয়া।
[৪৬৩] সাক্ষাৎকার, মোঃ আবু বকর সিদ্দিক, জেলা ডেপুটি কমান্ডার, সাতক্ষীরা।
[৪৬৪] সাক্ষাৎকার, মোঃ আবু বকর সিদ্দিক, জেলা ডেপুটি কমান্ডার, সাতক্ষীরা।

Dhaka University Institutional Repository

মিটে যায়।[৪৬৫] পাকিস্তান রক্ষা করার জন্য তারা সুদুর পশ্চিম পাকিস্তান থেকে এদেশে এসে প্রাণ হারায় কিন্তু তাদের মৃত্যুর খবর আত্মীয় স্বজন, বন্ধু-বান্ধব বা সেনা ইউনিটে পৌছে দেবার জন্য কেউ নেই।[৪৬৬] মুক্তিযোদ্ধারা আস্তে আস্তে পাকিস্তানী হানাদার বাহিনীর বৈকারী ক্যাম্পে অর্থাৎ দ্বিতল বাড়িতে প্রবেশ করে এবং কেউ লুকিয়ে মুক্তিবাহিনীর উপর আক্রমণ করছে কিনা এটা খুঁজে দেখে।[৪৬৭] নীচতলার সব কয়টা রুম ভালভাবে তল্লাশি করার পর তারা দোতলায় চলে যায় এবং দোতলায় তারা এক ভয়ংকর দৃশ্য দেখতে পায়। খানসেনারা নারকীয়ভাবে একটা লোককে জবাই করে তার মাথাটা এক স্থানে ফেলে রেখেছে এবং তার দেহটা অন্য স্থানে ফেলে রেখেছে।[৪৬৮] বাড়িতে খোঁজাখুজির পর মুক্তিবাহিনী পাকিস্তানী বাহিনীর অনেক অস্ত্র, গোলাবারুদ এবং খাদ্য সামগ্রী, পোশাক পরিচ্ছদ পায়।[৪৬৯] ঘুরে ফিরে সবকিছু গুছিয়ে নিয়ে মুক্তিযোদ্ধারা বাইরে বেরিয়ে আসে। এমন সময় এই এলাকার একটা লোক এসে তাদের জানায় খানসেনারা এই ক্যাম্পে তিনজনকে বন্দী করে রাখে, তাদের দুইজন জানালার শিক বাকিয়ে পালিয়ে যেতে সক্ষম হয় কিন্তু তৃতীয় জনকে খানসেনারা জবাই করে হত্যা করে।[৪৭০] এই যুদ্ধটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ কারণ এই যুদ্ধে পাকিস্তানী সেনারা তাদের অস্ত্র, গোলাবারুদ, খাবার, বস্ত্র, এমনকি বাড়িটি হারিয়ে ফেলে।[৪৭১] এই দুঃসাহসিক অভিযানে মোট ১০০ জন মুক্তিযোদ্ধা অংশ নেয়।[৪৭২] যুদ্ধের প্রাথমিক পর্যায়ে পাকিস্তানী হানাদার বাহিনী আধুনিক অস্ত্র ও সামরিক কৌশলে সুজ্জিত থাকলেও মুক্তিযোদ্ধাদের রণকৌশলে তারা পরাজিত হয়। খানসেনারাও তাদের নিরাপত্তার জন্য বৈকারী ক্যাম্পের আশে পাশে এ.পি মাইল (এন্টি পার্সোনাল মাইল) পুতে রাখে কিন্তু মুক্তিবাহিনীরা এটা জানত না।[৪৭৩] আবার যাতে পাকিস্তানীসেনা বা রাজাকাররা বৈকারীতে হিন্দুদের পরিত্যক্ত বাড়িতে ক্যাম্প করতে না পারে সেজন্য মুক্তিযোদ্ধারা ৭৫ পাউন্ড এক্সপোসিভ দিয়ে গোটা ভবনকে উড়িয়ে দেয়।[৪৭৪] মিলিটারীদের ফাঁদে ফেলে তাদের উপর দূর্জয় অভিযান মুক্তিযোদ্ধাদের আরও অনুপ্রাণিত করে।

[৪৬৫] সাক্ষাৎকার, মোঃ আবু বকর সিদ্দিক, জেলা ডেপুটি কমান্ডার, সাতক্ষীরা।
[৪৬৬] সাক্ষাৎকার, মোঃ আইয়ুব আলী বিশ্বাস, মুক্তিযোদ্ধা, বোয়ালিয়া, কলারোয়া।
[৪৬৭] সাক্ষাৎকার, আব্দুল জব্বার, মুক্তিযোদ্ধা, বৈদ্যপুর, কলারোয়া।
[৪৬৮] সাক্ষাৎকার, আব্দুল জব্বার, মুক্তিযোদ্ধা, বৈদ্যপুর, কলারোয়া।
[৪৬৯] সাক্ষাৎকার, আব্দুল জব্বার, মুক্তিযোদ্ধা, বৈদ্যপুর, কলারোয়া।
[৪৭০] সাক্ষাৎকার, আব্দুল জব্বার, মুক্তিযোদ্ধা, বৈদ্যপুর, কলারোয়া।
[৪৭১] সাক্ষাৎকার, মোঃ আবু বকর সিদ্দিক, জেলা ডেপুটি কমান্ডার, সাতক্ষীরা।
[৪৭২] সাক্ষাৎকার, মোঃ আবু বকর সিদ্দিক, জেলা ডেপুটি কমান্ডার, সাতক্ষীরা। ৩০/০৫/২০১৬ পলাশপোল।
[৪৭৩] সাক্ষাৎকার, মোঃ আবু বকর সিদ্দিক, জেলা ডেপুটি কমান্ডার, সাতক্ষীরা।
[৪৭৪] সাক্ষাৎকার, মোঃ আইয়ুব আলী বিশ্বাস, মুক্তিযোদ্ধা, বোয়ালিয়া, কলারোয়া।

Dhaka University Institutional Repository

সাতক্ষীরা সদর উপজেলা

৩.১৫ কদমতলা ব্রিজ আক্রমণ

কদমতলা ব্রিজ সাতক্ষীরা রোডে অবস্থিত এবং সাতক্ষীরা শহর থেকে মাত্র ৩ কিলোমিটার উত্তরে ১০০ ফুট লম্বা একটি ব্রিজ।[৪৭৫] এই ব্রিজটি খুব গুরুত্বপূর্ণ কারণ পাকিস্তানী সেনারা নাভারণ থেকে সাতক্ষীরা, দেবহাটা, কালীগঞ্জ ও শ্যামনগরে চলাচল করে এবং তাদের খাদ্য এবং অস্ত্র শস্ত্র পরিবহনের জন্য এই পথ ব্যবহার করে।[৪৭৬] সুতরাং পাকিস্তানী সেনাদের চলাচল বন্ধ করে দেবার জন্য মুক্তিযোদ্ধারা কদমতলা ব্রিজ ধ্বংস করার পরিকল্পনা করে, তাহলে মুক্তিবাহিনী সহজে সাতক্ষীরা এলাকা পাকিস্তানী হানাদার মুক্ত করতে পারবে। সময়টা কার্তিক মাস হওয়ায় চারিদিকে কাচাপাকা ধানের সমারোহ। তাছাড়া মুক্তিযোদ্ধারা পাকিস্তানী হানাদারদের যাতায়াত বন্ধ করার জন্য কিছুদিন আগে আলীপুর ইউনিয়নের ভাড়ুখালি ব্রিজ এবং কুল পোতা ব্রিজ উড়িয়ে দিয়েছে।[৪৭৭] ক্যাপ্টেন মাহবুবের নেতৃত্বে প্রায় ৪০ জন মুক্তিযোদ্ধা দুইটি রকেট লাঞ্চার, ৪টা এল.এম.জি ২ ইঞ্চি মর্টার, বাকী সব এস.এল.আর, এস.এম.জি এবং পর্যাপ্ত পরিমান বিস্ফোরকসহ রাত ১১-৩০ মিনিটের দিকে ঘোনা ক্যাম্প থেকে পদব্রজে রওনা হয়।[৪৭৮] কদমতলা থেকে ৩ মাইল দুরে বাবুলিয়া গ্রামে এসে ক্যাপ্টেনের নির্দেশে সবাই বিশ্রাম নেয় কিন্তু চারিদিক চাঁদের আলোয় ঝলমল করায় সবাই চাঁদ ডোবার জন্য অপেক্ষা করে।[৪৭৯] সোনামিয়া, আব্দুল্লাহ, রফিক, মান্নান ও ইপিআর মাওলা স্থানীয় এবং এলাকা ভালভাবে চিনত।[৪৮০] ফলে গোটা বাহিনীকে ৬টি দলে বিভক্ত করা হয় এবং সোনামিয়া ও আব্দুল্লাহর দলকে আক্রমণকারী দল করা হয়।[৪৮১] আর অন্য ৫টি দল অতিরিক্ত প্রোটেকশন দিয়ে সোনামিয়া ও আব্দুল্লাহর দলকে ব্রিজ উড়িয়ে দিতে এবং সেখান থেকে নিরাপদে ফিরে আসতে সাহায্য করবে।[৪৮২] সিদ্ধান্ত হয়, ইপিআর মাওলা রকেট লাঞ্চার চালিয়ে আক্রমণ শুরু করবে। সেনামিয়া ও আব্দুল্লাহর নেতৃত্বে মুক্তিযোদ্ধারা খুব সাবধানে ও ধীরে ধীরে এগিয়ে চলে। এদিকে চাঁদ ডুবে যাওয়ায় চারিদিকেটা অন্ধকার ঢাকা। কিন্তু সমস্যা হল, এই গুরুত্বপূর্ণ ব্রিজটি পাহারা দেবার জন্য ব্রিজের দুপাশে পাকিস্তানী হানাদার ও রাজাকার শত্রু বাঙ্কার গড়ে তুলেছে।[৪৮৩] তারপরও দুঃসাহসী মুক্তিযোদ্ধারা নিজেদের জীবনকে তুচ্ছ করে মাতৃভূমিকে মুক্ত করার জন্য সব ধরনের ভয়ভীতি, বিপদ আপদকে পিছনে ফেলে সামনের দিকে এগিয়ে যায় খানসেনাদেরকে আক্রমণ করার জন্য। রাত যখন ২:৩০ মিনিট তারা ঠিক ব্রিজের একেবারে উপরে ওঠে এবং তাড়াতাড়ি

---

[৪৭৫] সাক্ষাৎকার, আব্দুল মালেক সোনা, লাবসা। ৩০/০৫/২০১৬ থানাঘাটা।
[৪৭৬] সাক্ষাৎকার, আব্দুল মালেক সোনা, লাবসা। আরও দেখুন- স.ম. বাবর আলী 'প্রাগুক্ত' পৃষ্ঠা-২৫৪।
[৪৭৭] সাক্ষাৎকার, আব্দুল মালেক সোনা, লাবসা। আরও দেখুন- স.ম. বাবর আলী 'প্রাগুক্ত' পৃষ্ঠা-২৫৪।
[৪৭৮] সাক্ষাৎকার, আব্দুল মালেক সোনা, লাবসা। আরও দেখুন- স.ম. বাবর আলী 'প্রাগুক্ত' পৃষ্ঠা-২৫৪।
[৪৭৯] সাক্ষাৎকার, আব্দুল মালেক সোনা, লাবসা। আরও দেখবেন- মীর মুস্তাক আহমেদ রবি, *"চেতনায় একাত্তর"*।
[৪৮০] সাক্ষাৎকার, আব্দুল মালেক সোনা, লাবসা।
[৪৮১] সাক্ষাৎকার, আব্দুল মালেক সোনা, লাবসা।
[৪৮২] সাক্ষাৎকার, আব্দুল মালেক সোনা, লাবসা।
[৪৮৩] সাক্ষাৎকার, আব্দুল মালেক সোনা, লাবসা।

ক্রলিং করে পিছনের দিকে চলে আসে। হঠাৎ পিছানোর সময় গুলির শব্দ শুনতে পায় কারণ মিলিটারী এবং রাজাকারদের চোখ এড়িয়ে যেতে পারে না।[৪৮৪] তারপর শুরু হয় মিলিটারী ও রাজাকারদের অনবরত গুলি বর্ষণ। কিন্তু ইতোমধ্যে মুক্তিযোদ্ধারা রাস্তা থেকে ৩-৪ ফুট নীচে এসে নিরাপদ জায়গায় অবস্থান নেয়।[৪৮৫] সোনামিয়া রকেট লাঞ্চারধারী ইপিআর মাওলাকে রকেট লাঞ্চার বসানোর জন্য একটা সুবিধাজনক জায়গা করে দিয়ে তাকে রকেট লাঞ্চার চালানোর নির্দেশ দেয়।[৪৮৬] কিন্তু দুঃখের বিষয় প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় রকেট লাঞ্চার ফায়ার হয় না। এদিকে খানসেনা ও রাজাকার বাহিনী বাকে বাকে বৃষ্টির মতো গুলি চালিয়ে যেতে থাকে।[৪৮৭] মাটি থেকে একটু মাথা উপরে উঠালেই জীবন শেষ হয়ে যাবে। শেষ পর্যন্ত ৪র্থ রকেট ফায়ার হলো এবং পূর্ব পরিকল্পনা অনুযায়ী ৫টি দলের মুক্তিযোদ্ধারা গুলি বর্ষণ করা শুরু করলো কিন্তু সবচেয়ে বড় বিপদের কারণ খানসেনাও রাজাকার বাহিনী সোনামিয়া ও আব্দুল্লাহকে লক্ষ্য করেই গুলি চালিয়ে যেতে থাকে।[৪৮৮] বিপদ আরও ঘনিয়ে আসতে দেখে, সোনামিয়া পাশের পুকুরে সবাইকে নামার নির্দেশ দেয় কিন্তু এই পুকুরকে লক্ষ্য করে পাকসেনা, রাজাকার ও তাদের নিজস্ব কভারিং গ্রুপ সবাই একসাথে যৌথভাবে আক্রমণ আরও তীব্র গতিতে চালিয়ে যেতে থাকে।[৪৮৯] সোনামিয়া ও আব্দুল্লাহর অসীম সাহসিকতা ও নির্ভুল কৌশলকে আশ্রয় করে বুকে হেঁটে অনেক কষ্ট করে মুক্তিযোদ্ধারা খাল বিল পার হয়ে নিরাপদ এলাকায় ফিরে আসে এবং নিঃশ্বাস নেয়।[৪৯০] কিন্তু মুক্তিযোদ্ধারা তখন পুরোপুরি বিবস্ত্র, কেবলমাত্র অস্ত্র আর গোলাবারুদ ছাড়া আর কিছু নাই।[৪৯১] তারপর পাশের একটি বাড়ি থেকে তারা পরিধেয় কাপড় সংগ্রহ করে। কদমতলী ব্রিজ ধ্বংসের অভিযান ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়।

আশাশুনি উপজেলা

৩.১৬ গোয়ালডাঙ্গা আক্রমণ

হেতালবুনিয়া নামক গ্রামে মুক্তিযোদ্ধাদের সদর দপ্তর অবস্থিত। এটি আশাশুনি উপজেলার বড়দল ইউনিয়নের অন্তর্গত এবং ক্যাম্পের নাম কাজলনগর ক্যাম্প, টাউন শ্রীপুরের যুদ্ধের সময় অমর শহীদ কাজলের

[৪৮৪] সাক্ষাৎকার, আব্দুল মালেক সোনা, লাবসা।
[৪৮৫] সাক্ষাৎকার, আব্দুল মালেক সোনা, লাবসা।
[৪৮৬] সাক্ষাৎকার, আব্দুল মালেক সোনা, লাবসা।
[৪৮৭] সাক্ষাৎকার, আব্দুল মালেক সোনা, লাবসা।
[৪৮৮] সাক্ষাৎকার, আব্দুল মালেক সোনা, লাবসা।
[৪৮৯] সাক্ষাৎকার, আব্দুল মালেক সোনা, লাবসা।
[৪৯০] সাক্ষাৎকার, আব্দুল মালেক সোনা, লাবসা।
[৪৯১] সাক্ষাৎকার, আব্দুল মালেক সোনা, লাবসা।

নামানুসারে এই ক্যাম্পের নামকরণ করা হয় কাজল ক্যাম্প।[৪৯২] কাজল ক্যাম্পের চারিদিকের প্রায় প্রতিটি গ্রামে মুক্তিযুদ্ধের প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত বেশ কিছু অনিয়মিত মুক্তিযোদ্ধা ও স্বেচ্ছাসেবক আছে।[৪৯৩] এই মুক্তিযোদ্ধারা সর্বক্ষণ রাজাকারদের আগমন, চলাচল কোন প্রকার আক্রমণের আভাস পেলেই ক্যাম্পের মুক্তিবাহিনীকে খবর দেবার দায়িত্বে প্রস্তুত থাকে। সেদিন মুক্তিযোদ্ধা আবুল কালাম আজাদ বাকাঁয়, রফিক অন্য জায়গায় গেছেন, রহমতউল্লাহ দাদু, লেঃ আরেফিনসহ অন্যান্য সবাই দুরে অপারেশনে গেছেন।[৪৯৪] মুজিবর রহমান ও গাউস চাঁদখালি হাইস্কুলে খুব শীঘ্র রাজাকার ক্যাম্প হবে কিনা সে বিষয়ে প্রকৃত খবর আনার জন্য যায়।[৪৯৫] সকালে নাস্তার পর মনোরঞ্জন ২৫/৩০ জন ছেলেকে রাইফেল ট্রেনিং দিতে থাকেন।[৪৯৬] ইতোমধ্যে তারা রাইফেল ফায়ারিং শিখেছে। ঐ দিনে ক্যাম্পে শুধুমাত্র প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত মুক্তিযোদ্ধা বলতে মনোরঞ্জন এবং স.ম. বাবর আলী উপস্থিত আছেন। মুক্তিযোদ্ধা স.ম. বাবর আলী তখন অস্ত্রাগারে বসে খুব মনোযোগ সহকারে সেক্টরের জন্য একটা জরুরী রিপোর্ট তৈরীতে ব্যস্ত ঠিক এমন সময় তালের ডোঙ্গায় দু জন লোক ক্যাম্পে আসে এবং সেন্ট্রি তখন লোক দুজনকে বাবর আলীর কাছে আনে।[৪৯৭] এ দুজন লোকই এই ক্যাম্পের মুক্তিযোদ্ধাদের বিশ্বস্ত গোয়েন্দা এবং তারা নাস্তা খেতে খেতে অতি ব্যস্ত হয়ে একটি খুব গুরুত্বপূর্ণ খবর জানাতে লাগলেন। তারা জানায়, আজ বেলা ১০ টায় চাপড়ার পুরো রাজাকার বাহিনী বড়দল বাজারের সব লুট করবে এবং আগুন লাগিয়ে দিবে।[৪৯৮] কারণ রাজাকারদের অভিযোগ, তারা মুক্তিযোদ্ধাদের খাবারের যোগান দেয়। বড়দলের সিদ্দিক সানা মুক্তিবাহিনীর খাবার যোগান দেবার দায়িত্বে ছিলেন এবং তিনি রাতদিন ধরে মুক্তিযোদ্ধাদের খাবারের সবধরনের ব্যবস্থা করতেন।[৪৯৯] এমনকি বড়দল বাজারের ব্যবসায়ীরা যেকোন প্রয়োজনে মুক্তিযোদ্ধাদের সব ধরনের সাহায্য সহযোগিতা করে। এজন্য সিদ্দিক সানাকে মুক্তিযোদ্ধারা খাদ্যমন্ত্রী বলে ডাকে। সিদ্দিক সানার সাথে পাইকগাছা উপজেলার (বর্তমানে কয়রা) হরিনগর (হড্ডে) গ্রামের হায়দার আলী সানা ও খাদ্য মন্ত্রী হিসেবে পরিচিত হন। খাদ্য যোগানের সাথে সাথে তারা মুক্তিযোদ্ধাদের জন্য বালিশ কাঁথাবস্ত্র যোগাড় করে দেয়। মূলত সিদ্দিক সানা মুক্তিযোদ্ধাদের সাথে থাকে, পাশে বসে সবার জন্য দোয়া করতে থাকে এবং কখনও কখনও ঝুঁকিপূর্ণ দায়িত্ব পালন করতে পিছুপা হন না।[৫০০] স.ম. বাবর আলী চিন্তিত হয়ে পড়েন, কিভাবে রাজাকারদেরকে প্রতিহত করা যায়, কারণ তখন মনোরঞ্জন ছাড়া ক্যাম্পে তেমন কেউ নেই। ঐ দিন ১৭ সেপ্টেম্বর, স.ম. বাবর আলী মনোরঞ্জনকে ডেকে দুজনে মিলে এ বিষয়ে

[৪৯২] সাক্ষাৎকার, মোঃ আব্দুল হান্নান, মুক্তিযোদ্ধা, আশাশুনি। ৩০/১২/২০১৫ আশাশুনি।
[৪৯৩] সাক্ষাৎকার, মোঃ আব্দুল হান্নান, মুক্তিযোদ্ধা, আশাশুনি।
[৪৯৪] সাক্ষাৎকার, মোঃ আব্দুল হান্নান, মুক্তিযোদ্ধা, আশাশুনি।
[৪৯৫] মোশাররফ হোসেন মণ্ড, মুক্তিযোদ্ধা কমান্ডার, সাতক্ষীরা, জেলা মুক্তিযোদ্ধা কমান্ড।
[৪৯৬] সাক্ষাৎকার, মোঃ আব্দুল গফুর, বধুহাটা, আশাশুনি। ৩০/১২/২০১৫ আশাশুনি।
[৪৯৭] সাক্ষাৎকার, মোঃ আব্দুল গফুর, বধুহাটা, আশাশুনি।
[৪৯৮] সাক্ষাৎকার, মোশাররফ হোসেন মণ্ড। ৩০/১২/২০১৫ আশাশুনি।
[৪৯৯] সাক্ষাৎকার, মোশাররফ হোসেন মণ্ড।
[৫০০] সাক্ষাৎকার, মোঃ আব্দুল হান্নান, মুক্তিযোদ্ধা, আশাশুনি।

আলাপ আলোচনা করেন। স.ম. বাবর আলী আশাশুনি স্কুলে পড়াকালীন সময়ে তার ছাত্র জীবনের একটি স্মৃতিময় বছর এ এলাকায় কাটিয়েছেন, এজন্য গোয়ালডাঙ্গা বাজারসহ ফকরাবাদ পুরো এলাকাটা তার নখদর্পনে। গোয়ালডাঙ্গা বাজারের শেষ প্রান্তে ও ফকরাবাদ গ্রামের সীমান্তে একটি বড় খান এবং সুইচ গেট আছে, একদিকে বড় খাল, একদিকে নদী, অন্যদিকে ধান ক্ষেত রাজাকারদেরকে আক্রমণ করার জন্য রাইফেল নিয়ে এখানে বসার পরিকল্পনা দেওয়া হয়।[৫০১] এ পরিকল্পনা অনুযায়ী স.ম. বাবর আলী, মনোরঞ্জন সহ মোট ২৫ জন দুটো নৌকায় করে দ্রুত রওনা হয় এবং ৫/৭ জনকে ক্যাম্পের দায়িত্বে রেখে যায়। তালের ডোঙ্গায় যেতে যেতে স.ম. বাবর আলী ও মনোরঞ্জন আলাপ আলোচনা করতে থাকে। বেলা প্রায় যখন ১২টা বাজে তখন তারা সুইচগেটে পৌছায় এবং প্রায় ২০০ রাজাকার বাহিনীর লোক বড়দল বাজারের দিকে পদব্রজে চলে গেছে।[৫০২] নৌকায় বসে পরিকল্পনা অনুসারে স.ম. বাবর আলী পূর্বদিকে এবং মনোরঞ্জন পশ্চিম দিকে রেকী করতে চলে যায়।[৫০৩] তারা দেখতে পায় তারা দেখতে পায় ৫ জন রাজাকার এই গুরুত্বপূর্ণ স্থানে পাহারার দায়িত্বে রয়েছে এবং মনোরঞ্জন রেকী করতে গিয়ে অর্তকিতে রাজাকারদের ধরে ফেলার পরিকল্পনা করেন।[৫০৪] পাঁচজন মুক্তিযোদ্ধা ঐ পাঁচজনকে ধরার জন্য খালের মধ্য দিয়ে এগিয়ে দেখে রাজাকাররা একটা তালগাছের গায়ে রাইফেল পাঁচটা রেখে একটু দুরে গল্পে মেতে গেছে।[৫০৫] মুক্তিযোদ্ধারা এই সুযোগে এক লাফ দিয়ে রাইফেলগুলো কব্জা করে তাদের সবাইকে হ্যান্ডস আপ করালেন। ঘটনাটা এত আকস্মিক হল যে, রাজাকাররা এতটুকু নড়াচড়া করার সময় পেল না এবং মনোরঞ্জন ও আরও দুজন মিলে তাদেরকে বেধে ফেলে।[৫০৬] মুক্তিযোদ্ধারা সুইচ গেটের কাছে এসে দেখতে পায়, তাদের সুবিধার জন্য অনেক ইট পেতে রাখা আছে এবং এটির মাধ্যমে তারা দ্রুত আড়াল তৈরী করে। স.ম. বাবর আলী পরিকল্পনা করেন যে, তিনি ১০ জনকে নিয়ে রাজাকারদের মোকাবেলা করবেন এবং মনোরঞ্জন বাকী ১৫ জন মুক্তিযোদ্ধাদেরকে নিয়ে চাপড়া এলাকার দিক থেকে রাজাকাররা যাতে আক্রমণ করতে না পারে তার ব্যবস্থা নিবেন অর্থাৎ পিছনের দিকটা তিনি সামলাবেন।[৫০৭] বড়দল থেকে রাজাকারদের ফেরার কথা আরও পর থাকলেও পাঁচ মিনিটের মাথায় তারা ফিরে আসতে থাকে।[৫০৮] সিদ্ধান্ত নেওয়া হয় স.ম. বাবর আলী আগে গুলি করা শুরু করবেন, তারপর সবাই ফায়ার করবে এবং বাবর আলী একা ফায়ার চালিয়ে যাবেন।[৫০৯] শত্রু নিঃশ্বেস করার এটাঁই উপযুক্ত সময়

[৫০১] সাক্ষাৎকার, মোঃ আব্দুল হান্নান, মুক্তিযোদ্ধা, আশাশুনি।
[৫০২] সাক্ষাৎকার, মোঃ আব্দুল হান্নান, মুক্তিযোদ্ধা, আশাশুনি।
[৫০৩] সাক্ষাৎকার, মোশাররফ হোসেন মশু।
[৫০৪] সাক্ষাৎকার, মোশাররফ হোসেন মশু।
[৫০৫] সাক্ষাৎকার, মোশাররফ হোসেন মশু।
[৫০৬] সাক্ষাৎকার, মোঃ আব্দুল গফুর, বধুহাটা, আশাশুনি।
[৫০৭] সাক্ষাৎকার, মোঃ আব্দুল গফুর, বধুহাটা, আশাশুনি।
[৫০৮] সাক্ষাৎকার, মোঃ আব্দুল হান্নান, মুক্তিযোদ্ধা, আশাশুনি।
[৫০৯] সাক্ষাৎকার, মোঃ আব্দুল হান্নান, মুক্তিযোদ্ধা, আশাশুনি।

এবং স.ম. বাবর আলী আক্রমণে গোটা কয়েক রাজাকার গুলি খেয়ে ওখানেই নিহত হয়।[৫১০] রাজাকাররা একেবারে হতবাক হয়ে যায় এবং ফায়ার করার কোন সুযোগ পায় না কারণ মুক্তিবাহিনীর পেতে রাখা ফাঁদ তারা বুঝতে পারিনি ফলে তারা বোকার মত রাস্তা দিয়ে হেঁটে যেতে থাকে।[৫১১] সুতরাং যুদ্ধের সার্বিক অবস্থা মুক্তিযোদ্ধাদের অনুকূলে চলে আসে।[৫১২] রাজাকাররা বিশৃঙ্খলা হয়ে এদিক ওদিক ছুটতে থাকে এবং তাদের সাথে কয়েকজন বিহারীও ছিল বিহারীদের নেতা আহসান খুব সাহসী এবং অদম্য সে দ্রুত ক্রলিং করে ৩/৪ জনসহ গুলি করতে করতে অগ্রসর হতে থাকে।[৫১৩] তার ক্রলিং প্রশংসার যোগ্য এবং গতি অনেক বেশি হবার কারণে স.ম. বাবর আলীর কয়েকটি নিশানা ব্যর্থ হয়। এদিকে তার এস.এল.আর খারাপ হয়ে যায়, তাড়াতাড়ি পাশের থেকে আর একটি নিয়ে ফায়ারিং শুরু করে এবং গুলিটা আহসান বিহারীর মাথায় লাগে এবং সাথে সাথে সে মৃত্যুবরণ করে।[৫১৪] যার ফলে রাজাকাররা আর সামনে এগোনোর সাহস হারিয়ে ফেলে এবং পালিয়ে যায়।[৫১৫] মুক্তিযোদ্ধারা ব্যাপক হারে নদীতে গোলাবর্ষণ করতে থাকে, এদিকে স.ম. বাবর আলী সামনে ডাইনে বায়ে বেশ কিছু গুলি করে যুদ্ধে জয়ের সংকেত দিয়ে সবাইকে কাছে আসার নির্দেশ দেয়।[৫১৬] কেবলমাত্র পশ্চিম দিকের প্রতিরক্ষা থাকে। কিন্তু অত্যন্ত পরিতাপের বিষয় এই যে, স.ম. বাবর আলী সহ সব মুক্তিযোদ্ধারা যখন বিজয়ের আনন্দে উদ্ভাসিত তখন তারা ৩০/৪০ গজ দুরে স.ম. বাবর আলীর ঘনিষ্ট যুদ্ধসঙ্গী মনোরঞ্জনের মৃতদেহ দেখতে পায়।[৫১৭] স.ম. বাবর আলী খুব দ্রুত গিয়ে মনোরঞ্জনের মাথা কোলে তুলে নেয় এবং চোখের জলে সবাই শোকার্ত হয়ে পড়ে। স.ম. বাবর আলী অন্য মুক্তিযোদ্ধাদের মনোরঞ্জনের এখানে আসার কারণ জিজ্ঞাসা করায় জানতে পারে নিজের জীবনের বিনিময়ে বন্ধুর জীবন বাঁচতে এখানে আসে। কারণ যুদ্ধ শুরু স.ম. বাবর আলীর সাথে কোন অভিজ্ঞ যোদ্ধা না থাকায় তাকে সাহায্য করার জন্য মনোরঞ্জন এখানে আসে।[৫১৮] তারপর স.ম. বাবর আলী, মনোরঞ্জনের মৃতদেহ কাজলনগর ক্যাম্পে নেয়ার নির্দেশ দিয়ে শত্রুর খোজে বের হন। আহসান বিহারীসহ ১৫/১৬টা রাজাকারের লাশ ছড়িয়ে ছিটিয়ে পড়ে আছে এবং তাদের অস্ত্র গুলো সাথে রয়েছে।[৫১৯] এ যুদ্ধে গ্রামবাসীরা সহযোগিতার হাত নিয়ে এগিয়ে আসে এবং তারা সবাই মিলে নদীর চরের কাটাবন, হরগোজা ও কেওড়াবন থেকে কয়েকজন রাজাকার ধরে আনে এবং সাথে ৪৫টা মতো অস্ত্র পেয়ে যায় মুক্তিযোদ্ধারা।[৫২০] স.ম. বাবর আলী রাজাকারদের দ্বারা ঘেরাও হয়ে গেছে শুনে

[৫১০] সাক্ষাৎকার, মোঃ আব্দুল হান্নান, মুক্তিযোদ্ধা, আশাশুনি।
[৫১১] সাক্ষাৎকার, মুক্তিযোদ্ধা মোঃ শফিকুল ইসলাম, আশাশুনি।
[৫১২] সাক্ষাৎকার, মুক্তিযোদ্ধা মোঃ শফিকুল ইসলাম, আশাশুনি।
[৫১৩] সাক্ষাৎকার, মোঃ আহাদ আলী, আশাশুনি, সাতক্ষীরা। ৩০/১২/২০১৫ আশাশুনি।
[৫১৪] সাক্ষাৎকার, মোঃ আহাদ আলী, আশাশুনি, সাতক্ষীরা।
[৫১৫] সাক্ষাৎকার, মোঃ আহাদ আলী, আশাশুনি, সাতক্ষীরা।
[৫১৬] সাক্ষাৎকার, মোঃ আব্দুল হান্নান, মুক্তিযোদ্ধা, আশাশুনি।
[৫১৭] সাক্ষাৎকার, মোঃ আব্দুল হান্নান, মুক্তিযোদ্ধা, আশাশুনি।
[৫১৮] সাক্ষাৎকার, মোশাররফ হোসেন মণ্ডু।
[৫১৯] সাক্ষাৎকার, মোশাররফ হোসেন মণ্ডু।
[৫২০] সাক্ষাৎকার, মোশাররফ হোসেন মণ্ডু।

গাউস ও মুজিবর চাদখালির শাহপাড়া থেকে খবর পেয়ে দ্রুত চলে আসে। তারা কয়েকজন তেঁতুলিয়া পার দিয়ে ছুটতে ছুটতে চলে আসে। তারপর ঘটনা স্থলে এসে জানতে পারে স.ম. বাবর আলীর নেতৃত্বে মুক্তিযোদ্ধারা জয়ী হয়েছে।[৫২১] তারাও তখন গ্রামবাসীদের সাহায্যে কয়েকজন রাজাকার ধরে এবং তাদের কাছ থেকে রাইফেল উদ্ধার করে, নতুন মুক্তিযোদ্ধারা অস্ত্র পেয়ে খুব আনন্দিত হয়।[৫২২] গ্রামবাসীরা ক্ষুধার্ত মুক্তিযোদ্ধাদেরকে গুড় ও চিড়ে দিয়ে পেটপুরে খেতে দেয়।[৫২৩] এতো বড় সম্মুখ যুদ্ধে বিজয় মুক্তিযোদ্ধাদেরকে আরও অনুপ্রাণিত করে কিন্তু মনোরঞ্জনের মতো দুঃসাহসিক মুক্তিযোদ্ধাকে হারিয়ে সবাই মর্মাহত হয়। তাকে সাময়িক কায়দায় সম্মান জানিয়ে ক্যাম্পের ও গ্রামবাসীদের সহযোগিতায় তার মৃতদেহ পূর্ণ মর্যাদায় দাহ করে মুক্তিযোদ্ধারা সবাই কাজলনগরে ফিরে আসে।[৫২৪] এই সম্মুখ যুদ্ধে যারা মুক্তিযোদ্ধা স.ম. বাবর আলী সাথে যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেন তারা হলেন আশাশুনির মান্নান, মনিরুজ্জামান, শামীম আর মামুন এই মুক্তিযোদ্ধাদের সবার পূর্বের কিছুটা অভিজ্ঞতা আছে।[৫২৫] অন্যদিকে শিক্ষানবীশ মুক্তিযোদ্ধাদের মধ্যে আব্দুর রব, আঃ খালেক, আজিয়ার রহমান, শ্যাম, হাবিবুর রহমান, শহীদুল ইসলাম, আব্দুল কুদ্দুসসহ অন্যান্য মুক্তিযোদ্ধারা অংশগ্রহণ করেন।[৫২৬]

আশাশুনি উপজেলা

৩.১৭ কেয়ারগাতি গানবোটের সাথে যুদ্ধ

কেয়ারগাতি গ্রামটা আশাশুনি উপজেলার বড়দল ইউনিয়নের মরিচ্চাপ নদীর তীরে অবস্থিত এবং আশাশুনি উপজেলা থেকে ৪/৫ কিলোমিটার উত্তর পূর্ব দিকে এবং বড়দল বাজার থেকে ৮/৯ কিলোমিটার পশ্চিমে অবস্থিত। কেয়ারগাতির অপর পাড়েই চাপড়া গ্রাম। সাতক্ষীরার দক্ষিণ অঞ্চলে পাক নৌবাহিনীর সাথে মুক্তিযোদ্ধাদের যে কয়টা সংঘর্ষ ঘটে তার মধ্যে কেয়ারগাতি গানবোট যুদ্ধ উল্লেখযোগ্য। কেয়ারগাতি ও চাপড়া এই দুটি গ্রামেই রাজাকাররা শক্তিশালী ঘাঁটি গড়ে তোলে।[৫২৭] কিন্তু মুক্তিবাহিনী কেয়ারগাতি মকবুল চেয়ারম্যানের বাড়ির রাজাকার ঘাঁটি উৎখাত করার পর কেয়ারগাতি গ্রামে মুক্তিবাহিনী শক্তিশালী প্রতিরক্ষা ক্যাম্প গড়ে তোলে।[৫২৮] অপর দিকে নদীর অপর পাড়ে রাজাকার মিলিশিয়াদের শক্তিশালী ক্যাম্প অবস্থিত।[৫২৯] আশাশুনি ক্যাম্পে পুলিশ ছাড়া রাজাকাররাও থাকে এবং সাতক্ষীরা থেকে মিলিটারী এসে প্রায়ই

[৫২১] সাক্ষাৎকার, মুক্তিযোদ্ধা মোঃ শফিকুল ইসলাম, আশাশুনি। ৩০/১২/২০১৫ আশাশুনি।
[৫২২] সাক্ষাৎকার, মুক্তিযোদ্ধা মোঃ শফিকুল ইসলাম, আশাশুনি।
[৫২৩] সাক্ষাৎকার, মুক্তিযোদ্ধা মোঃ আহাদ আলী, আশাশুনি।
[৫২৪] সাক্ষাৎকার, মুক্তিযোদ্ধা মোঃ শফিকুল ইসলাম, আশাশুনি।
[৫২৫] সাক্ষাৎকার, মুক্তিযোদ্ধা মোঃ শফিকুল ইসলাম, আশাশুনি।
[৫২৬] সাক্ষাৎকার, মুক্তিযোদ্ধা মোঃ শফিকুল ইসলাম, আশাশুনি।
[৫২৭] সাক্ষাৎকার, মুক্তিযোদ্ধা মোঃ আব্দুল হান্নান। ৩০/১২/২০১৫ আশাশুনি।
[৫২৮] সাক্ষাৎকার, প্রফেসর এম.এ বারী।
[৫২৯] সাক্ষাৎকার, মোঃ অহেদ আলী, মুক্তিযোদ্ধা, আরার, আশাশুনি। ৩০/১২/২০১৫ আশাশুনি।

চাপড়ার রাজাকার মিলিশিয়া ক্যাম্পে অবস্থান করে ।[৫৩০] যার ফলে কেয়ারগাতি মুক্তিযোদ্ধাদের সাথে রাজাকার মিলিশিয়াদের প্রতিদিন প্রায় ২-৩ বার আক্রমণ পাল্টা আক্রমণ হয় ।[৫৩১] কেয়ারগাতি অঞ্চলের বিশিষ্ট মুক্তিযোদ্ধা আজিজ সানার (বড়ভাই) সহযোগিতা এবং উৎসাহে মুক্তিযোদ্ধারা কেয়ারগাতিতে খেজুরগাছ, কলাগাছ, নারকেল গাছ, মাটি ইত্যাদি দিয়ে ৮/১০টা শক্ত বাঙ্কার তৈরী করে এবং গোটা পঁচিশেক ট্রেঞ্চ তৈরী করে খুব শক্তিশালী প্রতিরক্ষা ব্যুহ রচনা করে ।[৫৩২] এসব বাঙ্কার ও ট্রেঞ্চ তৈরীতে কেয়ারগাতি এলাকাবাসী মুক্তিযোদ্ধাদেরকে অনেক সহযোগিতা করে। মুক্তিযোদ্ধাদের সর্বদা সতর্ক অবস্থায় থাকতে হয় কারণ সাতক্ষীরা শহর থেকে মাত্র আধা ঘন্টায় পাকিস্তানী হানাদার বাহিনী চাপড়ায় চলে আসে এবং পাকিস্তানী সেনারা যেদিন চাপড়ায় অবস্থান করে সেদিন রাজাকারদের শক্তি অনেকগুণ বেড়ে যায় এবং তারা অনেক রাত পর্যন্ত গোলাগুলি করে। কেয়ারগাতির দক্ষিণ পশ্চিমে ২/৩ কিলোমিটারের মধ্যে খোলপেটুয়া নদী এবং পূর্বদিকে ৪/৫ কিলোমিটার দূরে কপোতাক্ষ ও মরিচ্চাপের মোহনা ।[৫৩৩] এই জায়গায় মুক্তিযোদ্ধাদের অবস্থান খুব বিপদজ্জনক কারণ যেকোন মুহুর্তে এই দুই দিক থেকে গানবোট আসতে পারে এবং পশ্চিম পাড়ে চাপড়ায় রয়েছে রাজাকারদের শক্তিশালী প্রতিরক্ষা ব্যুহ ।[৫৩৪] এখানকার কয়েকটা বড় গাছে মুক্তিযোদ্ধাদের ও,পি বা অবজারভেশন পোস্ট রাখা আছে। কয়েকজন মুক্তিযোদ্ধা সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত পালাক্রমে এই গাছে উঠে সেন্ট্রি দেয় । ১৫ আগষ্ট আশাশুনি উপজেলা ঘাটে অসময় দুটো লঞ্চ আসায় মনিরুজ্জামান ও মান্নানকে দুটো গ্রেনেড দিয়ে আশাশুনি উপজেলার উপার পাঠানো হয় খবর আনার জন্য । মনিরুজ্জামান এবং মান্নান দুজনের বয়স বেশি নয় এবং তারা ঐ এলাকায় স্থানীয় হওয়ায় কেউ তাদেরকে সন্দেহ করবে না ।[৫৩৫] তারিখটা ১৬ আগষ্ট, মুক্তিযোদ্ধারা সকালের নাস্তা খেয়ে বাঙ্কারে বসে আছে। ঠিক এমন সময় আজিজ সানা এসে খবর দেয়, খোলপেটুয়া নদী দিয়ে দুখানা গানবোট তাদের দিকে আসছে এবং গানবোটের মাথায় টানানো পাকিস্তানি পতাকা স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে ।[৫৩৬] আধা মাইল দুরে অবস্থিত প্রতিরক্ষা লাইনে সকলকে গানবোট আসার খবর দেয়া হয় এবং সকল গ্রুপকে নির্দেশ প্রদান করে তারা যেন গানবোটে কিছু গুলি করে খুব তাড়াতাড়ি সুবিধা মতো পিছু হটে কাজলনগর ক্যাম্পে চলে যায় কারণ রাতে এই এলাকার ছেলেরা ও গ্রামবাসীরা ছাড়া আর কেউ থাকবে না ।[৫৩৭] স.ম. বাবর আলী সবাইকে খবর পাঠিয়ে গাছে উঠেন পর্যবেক্ষণের জন্য সর্বদক্ষিণে পশ্চিমে কমান্ডার রেজাউল করিম ও তাঁর দল ।[৫৩৮] তাঁর কাছে এল.এম.জি আছে একটা তারপর প্রতাপনগরের মতিয়ার রহমানের দল এরপর গাজী রফিকুল ইসলাম এবং সর্বশেষে আবুল কালাম আজাদের দল, রফিক,

---

[৫৩০] সাক্ষাৎকার, মোঃ অহেদ আলী, মুক্তিযোদ্ধা, আরার, আশাশুনি ।
[৫৩১] সাক্ষাৎকার, মোশাররফ হোসেন মশু, কমান্ডার, সাতক্ষীরা জেলা মুক্তিযোদ্ধা কমান্ড । ৩০/১২/২০১৫ আশাশুনি ।
[৫৩২] সাক্ষাৎকার, মোশাররফ হোসেন মশু, কমান্ডার, সাতক্ষীরা জেলা মুক্তিযোদ্ধা কমান্ড ।
[৫৩৩] সাক্ষাৎকার, মোশাররফ হোসেন মশু, কমান্ডার, সাতক্ষীরা জেলা মুক্তিযোদ্ধা কমান্ড ।
[৫৩৪] সাক্ষাৎকার, মোশাররফ হোসেন মশু, কমান্ডার, সাতক্ষীরা জেলা মুক্তিযোদ্ধা কমান্ড ।
[৫৩৫] সাক্ষাৎকার, মোঃ আব্দুল হান্নান, কমান্ডার, আশাশুনি উপজেলা কমান্ড ।
[৫৩৬] সাক্ষাৎকার, মোঃ আব্দুল হান্নান, কমান্ডার, আশাশুনি উপজেলা কমান্ড ।
[৫৩৭] সাক্ষাৎকার, মোঃ আব্দুল হান্নান, কমান্ডার, আশাশুনি উপজেলা কমান্ড । আরও দেখবেন- কমান্ডো মোঃ খলিলুর রহমান, প্রাগুক্ত পৃষ্ঠা-১৩৩
[৫৩৮] সাক্ষাৎকার, মোঃ আব্দুল হান্নান, কমান্ডার, আশাশুনি উপজেলা কমান্ড ।

কালাম, মতিয়ার, রেজাউল সবাই অভিজ্ঞ অধিনায়ক।[৫৩৯] স.ম. বাবর আলী সবাইকে নির্দেশ দেন যে, ১০/১৫ মিনিট গুলি করে আমরা সবাই পিছু হটে যাব।[৫৪০] খুব তাড়াতাড়ি গানবোট মুক্তিযোদ্ধাদের প্রতিরক্ষা ক্যাম্পের কাছাকাছি চলে আসে। তখন রেজাউলের নেতৃত্বে মুক্তিবাহিনী সর্বপ্রথম এল.এম.জি ফায়ার করে।[৫৪১] সাথে সাথে পাক নৌবাহিনী বিরতিহীন ভাবে গুলি করা শুরু করে। দুই গানবোট এবং দুই লঞ্চ তীরে আসার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করতে যাকে, অন্যদিকে মুক্তিবাহিনী জীবনবাজি রেখে তাদেরকে প্রতিহত করারজন্য লড়াই চালিয়ে যেতে থাকে।[৫৪২] গানবোট কিছুদুর সামনে আসতে গিয়ে মুক্তিবাহিনীর গুলি খেয়ে গানবোটের পিছনে গিয়ে আশ্রয় নেয়। এদিকে আধা ঘন্টা পার হয়ে যাবার পরও, পিছু হটার কোন লক্ষণ নেই।[৫৪৩] ইতোমধ্যে স.ম. বাবর আলী প্রতি বাঙ্কার ও ট্রেঞ্চে দ্রুত খবর পাঠাতে থাকেন। যুদ্ধ তাড়াতাড়ি প্রত্যাহার করে বিলের মধ্য দিয়ে কাজলনগর যাবার জন্য কিন্তু কোন মুক্তিযোদ্ধাই পাক নৌবাহিনীকে সামনে এগুতে দেবার পক্ষপাতী নয়। পাকিস্তানী সেনারা যাতে গানবোট তীরে ভীড়াতে না পারে সেজন্য কালাম ও রফিকের নেতৃত্বে মুক্তিবাহিনী প্রাণপণ গুলি চালিয়ে যেতে থাকে।[৫৪৪] খরিয়টির অশোক রায়ের এল.এম.জি গানবোটকে লক্ষ্য করে অবিরাম গুলিবর্ষণ করতে থাকে আশোক কালামের প্রিয় এল.এম.জি ম্যান যিনি খুব সহজেই এল.এম.জি ও আধামন ওজনের অস্ত্রশস্ত্র গোলাগুলি নিয়ে অনায়াসে চলাফেরা করতেন।[৫৪৫] ভয় হল পাক নৌবাহিনী যদি একবার গানবোট তীরে নামাতে পারে তাহলে মুক্তিযোদ্ধাদের কপালে অনেক বিপদ।[৫৪৬] এজন্য কালাম, রফিক একবারেই শংকিত না হয়ে খুব বিচক্ষনতার সাথে শত্রুদের মোকাবেলা করে যেতে থাকে। যার ফলে মুক্তিযোদ্ধাদের দূর্বার আক্রমণে পাকিস্তানী হানাদার বাহিনী গানবোট বার বার নামাতে এসেও ব্যর্থ হয়ে ফিরে যেতে থাকে।[৫৪৭] যদিও রাজাকারদের লঞ্চ সামনেই আসতে পারছে না, তবুও যেকোন মুহুর্তে বড় ধরনের বিপদ ঘটে যেতে পারে। এ জন্য স.ম. বাবর আলী প্রত্যাহারের জন্য সবাইকে কড়া ভাষায় নির্দেশ দেন। দক্ষিণ দিকের রেজাউল ও উত্তর দিকের কালামের বাহিনী অবশেষে যুদ্ধ প্রত্যাহার করে।[৫৪৮] মুক্তিযোদ্ধারা ধানক্ষেতের মধ্যদিয়ে কেয়ারগাতি গ্রাম পার হয়ে বিলের মধ্যে আসে এবং তারপর খালবিল পার হয়ে কাজলনগর আসে।[৫৪৯] এক একটা মুক্তিবাহিনী এক একটা জায়গায় সুবিধা মতো আশ্রয় নেওয়ায় সকলের সাথে একসাথে যোগাযোগ হয় না। কিন্তু সবচেয়ে দুঃসংবাদ হল, স.ম. বাবর আলী যখন বেলা ৩টার দিকে কাজলনগর ক্যাম্পে পৌছান তখন আজিজ সানা এর মাধ্যমে জানতে পারেন, খানসেনারা কেয়ারগাতি নেমে

[৫৩৯] সাক্ষাৎকার, মুক্তিযোদ্ধা মোঃ অহেদ আলী।
[৫৪০] সাক্ষাৎকার, মুক্তিযোদ্ধা মোঃ অহেদ আলী।
[৫৪১] সাক্ষাৎকার, মুক্তিযোদ্ধা মোঃ অহেদ আলী।
[৫৪২] সাক্ষাৎকার, মুক্তিযোদ্ধা মোঃ অহেদ আলী।
[৫৪৩] সাক্ষাৎকার, মোশাররফ হোসেন মশু, কমান্ডার, সাতক্ষীরা জেলা মুক্তিযোদ্ধা কমান্ড।
[৫৪৪] সাক্ষাৎকার, মোশাররফ হোসেন মশু, কমান্ডার, সাতক্ষীরা জেলা মুক্তিযোদ্ধা কমান্ড।
[৫৪৫] সাক্ষাৎকার, মোশাররফ হোসেন মশু, কমান্ডার, সাতক্ষীরা জেলা মুক্তিযোদ্ধা কমান্ড।
[৫৪৬] সাক্ষাৎকার, মুক্তিযোদ্ধা মোঃ আব্দুল গফুর, বুধহাটা, আশাশুনি।
[৫৪৭] সাক্ষাৎকার, মুক্তিযোদ্ধা মোঃ আব্দুল গফুর, বুধহাটা, আশাশুনি।
[৫৪৮] সাক্ষাৎকার, মুক্তিযোদ্ধা মোঃ আব্দুল গফুর, বুধহাটা, আশাশুনি।
[৫৪৯] সাক্ষাৎকার, মুক্তিযোদ্ধা মোঃ আব্দুল গফুর, বুধহাটা, আশাশুনি।

তাদের ঘর-বাড়ি সহ ঐ গ্রামের অনেক বাড়ি-ঘরে আগুন লাগিয়ে দিয়েছে।[৫৫০] আরও একটি খারাপ সংবাদ হল- হাবিব, কুদ্দুস ও শহীদকে পাকিস্তানী সেনারা বাঙ্কার থেকে অস্ত্রসহ ধরে নিয়ে গেছে।[৫৫১] খবরটি শুনে মুক্তিযোদ্ধারা মর্মাহত হয়ে পড়ে কারণ পাকিস্তানী হানাদাররা এই তিনজনকে চরম নির্যাতন করে হত্যা করবে এবং তাদের মুখের করুন ছবি মুক্তিযোদ্ধাদের চোখের সামনে বার বার ভেসে উঠতে থাকে।[৫৫২] এই যুদ্ধে যে সব মুক্তিযোদ্ধা শহীদ হন শহীদ আব্দুর রহমান (কেয়ারগাতি), শহীদ রফিকুল ইসলাম (কেয়ারগাতি), শহীদ মোঃ আমিনুদ্দিন (জামালনগর), শহীদ মোজাম্মেল হক (জামালনগর), শহীদ আবুল হোসেন (কুন্দুড়িয়া)।[৫৫৩] হাবিব, কুদ্দুস ও শহীদের জন্য মুক্তিযোদ্ধারা অনেক চিন্তিত হয়ে পড়ে।[৫৫৪] এই যুদ্ধে যেসব মুক্তিযোদ্ধারা অংশ নেয় তারা হলেন আব্দুর রহমান, জামাত আলী, আবু বকর সিদ্দিক, মহিউদ্দীন সানা, আজহারুল ইসলাম, শামসুর রহমান, হাবিবুর রহমান, রফিকুল, আব্দুল কাদের, মোনাজাত, আব্দুল মজিদ, সিরাজুল ইসলাম, খোকন, মোঃ আব্দুল হান্নান, মোঃ মোশারফ হোসেন মশু, এম.এ বারীসহ আরও অনেকে।[৫৫৫] পাক নৌবাহিনীর সাথে রেজাউল, রফিক ও কালামের রণকৌশল ও দৃঢ়তা মুক্তিবাহিনীর অহংকার ও গর্বের। কারণ পাকিস্তানী হানাদার বাহিনীর উপর অনবরত ভাবে গুলিবর্ষণ না করলে যেকোন একদিক থেকে সহজে পাকিস্তানী হানাদারদের নামতে পারলে অনেক মুক্তিযোদ্ধা প্রাণ হারাত।[৫৫৬] সবচেয়ে আনন্দের বিষয় এই যে, স্বাধীনতা যুদ্ধের পর খুলনা জেলখানা থেকে হাবিব, শহীদ ও কুদ্দুস স্বশরীরে বেরিয়ে এসে সবাইকে চমকে দেয়।[৫৫৭] তাদেরকে আবার ফিরে পেয়ে সবাই আনন্দে আপ্লুত হয়ে পড়ে কারণ তাদেরকে ফিরে পাবার ভাবনা কেউ স্বপ্নেও কল্পনা করতে পারেনি। যার ফলে মুক্তিযোদ্ধারা সবাই আল্লাহর দরবারে লাখো কোটি শুকরিয়া জানায়। তারা রাজাকারদের হাত থেকে ফিরে আসতে পেরেছে তার কারণ তাদের গায়ে রাজাকারদের শার্ট পরা থাকায় রাজাকার পরিচয় দিয়ে মিলিটারীদের সম্পূর্ণটাই বিভ্রান্তিতে ফেলে দেয়।[৫৫৮] মকবুল চেয়ারম্যানের বাড়ি অভিযানের সময় কয়েকটা রাজাকাররের পোশাক পায় এবং তখন পোশাকের অনেক ঘাটতি থাকায় তারা ঐ শার্ট ব্যবহার করে। তাদেরকে গানবোটে করে খুলনায় নিয়ে যায় এবং রাজাকাররা চাপড়ায় থেকে যাওয়ায় কেউ তাদেরকে চিহ্নিত করতে পারিনি।[৫৫৯] যার ফলে মিলিটারীরা তাদেরকে খুলনা জেলখানায় পাঠিয়ে দেয়।[৫৬০] ফলে ভাগ্যক্রমে তারা রক্ষা পেয়ে যায়।

[৫৫০] সাক্ষাৎকার, মুক্তিযোদ্ধা মোঃ আব্দুল হান্নান।
[৫৫১] সাক্ষাৎকার, মুক্তিযোদ্ধা মোঃ আব্দুল হান্নান।
[৫৫২] সাক্ষাৎকার, মুক্তিযোদ্ধা মোঃ আব্দুল হান্নান।
[৫৫৩] সাক্ষাৎকার, মুক্তিযোদ্ধা মোঃ অহেদ আলী।
[৫৫৪] সাক্ষাৎকার, মুক্তিযোদ্ধা মোঃ অহেদ আলী।
[৫৫৫] সাক্ষাৎকার, মুক্তিযোদ্ধা মোঃ আব্দুল গফুর, বুধহাটা, আশাশুনি।
[৫৫৬] সাক্ষাৎকার, মুক্তিযোদ্ধা মোঃ আব্দুল গফুর, বুধহাটা, আশাশুনি।
[৫৫৭] সাক্ষাৎকার, মুক্তিযোদ্ধা মোঃ আব্দুল গফুর, বুধহাটা, আশাশুনি।
[৫৫৮] সাক্ষাৎকার, মোশাররফ হোসেন মশু, কমান্ডার, সাতক্ষীরা জেলা মুক্তিযোদ্ধা কমান্ড।
[৫৫৯] সাক্ষাৎকার, মোশাররফ হোসেন মশু, কমান্ডার, সাতক্ষীরা জেলা মুক্তিযোদ্ধা কমান্ড।
[৫৬০] সাক্ষাৎকার, মোশাররফ হোসেন মশু, কমান্ডার, সাতক্ষীরা জেলা মুক্তিযোদ্ধা কমান্ড।

আশাশুনি উপজেলা

৩.১৮ চাপড়া রাজাকার ঘাঁটি দখল

চাপড়া সাতক্ষীরা জেলার আশাশুনি উপজেলার অন্তর্গত একটি গ্রাম যার দক্ষিণ দিকে মরিচ্চাপ নদী, উত্তর দিকে বেতনা নদী ও পূর্ব দিকে মরিচ্চাপ নদী এবং পশ্চিমে সাতক্ষীরা আশাশুনির মেইন রোড। চাপড়া গ্রামে যুদ্ধের শুরু থেকে রাজাকাররা শক্তিশালী ঘাঁটি গড়ে তোলে এবং এটি স্বাধীনতা বিরোধীদের সবচেয়ে বড় আস্থানা।[৫৬১] কারণ চাপড়া গ্রামে শান্তি কমিটির নেতৃত্বে প্রায় সব লোকজনই রাজাকার বাহিনীতে যোগদান করে এবং শরণার্থীদের জিনিসপত্র লুটপাট করে।[৫৬২] গ্রামের প্রতিটি বাড়ি থেকে রাজাকার বাহিনীতে যোগদান বাধ্যতামূলক এবং সর্বাত্মকভাবে পাকিস্তানী হানাদার বাহিনীকে সাহায্য সহযোগিতা করতে থাকে।[৫৬৩] অন্য দিকে সাতক্ষীরা মহকুমা সদর থেকে রাজাকাররা নিয়মিতভাবে অস্ত্রশস্ত্রসহ আনুসঙ্গিক সাহায্য সহযোগিতা লাভ করে এবং যেকোন বড় ধরনের সমস্যায় সাতক্ষীরা শহর থেকে পূর্ণ সাহায্য পায়।[৫৬৪] চাপড়া গ্রামের পূর্বদিকে মরিচ্চাপ নদী এবং অপর পাড়ে কেয়ারগাতি গ্রাম মুক্তিবাহিনীর শক্তিশালি ঘাঁটি গড়ে তোলে ফলে প্রায় প্রতিরাতেই উভয়বাহিনীর মধ্যে গুলি বর্ষণ চলত।[৫৬৫] মাঝে মাঝে নৌবাহিনীর প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত সাতারু দল মরিচ্চাপ নদী পার হয়ে রাজাকারদের ক্যাম্প ও ব্যাঙ্কারে গ্রেনেড নিক্ষেপ করে।[৫৬৬] কিন্তু রাজাকার বাহিনী মুক্তিযোদ্ধাদের গ্রেনেড হামলা প্রতিহত করার জন্য অনেক চেষ্টা ও পরিকল্পনা করেও ব্যর্থ হয়। চাপড়ার রাজাকার বাহিনীর সঙ্গে অনেকবার মুক্তিবাহিনীর যুদ্ধ হয় তবে তার মধ্যে ১৬ কার্তিক ১৩৭৮ সালের রোজ শনিবারের যুদ্ধ উল্লেখযোগ্য।[৫৬৭] এই যুদ্ধের দলনেতা হলেন গাজী মোঃ রহমত উল্লাহ দাদু বীর প্রতীক (দাদু), খিজির, রফিক একত্রে বসে যুদ্ধে প্রস্তুতির পরিকল্পনা করেন।[৫৬৮] কিন্তু গ্রামের প্রায় প্রতিটি বাড়ি থেকে রাজাকার বাহিনীতে যোগদান করায় রাতের বেলায় সব রাজাকাররা এক ভবনে বা এক বাড়িতে থাকে না।[৫৬৯] রাজাকার বাহিনী ৫/৭ জন দলে ভাগ হয়ে পুরা গ্রামে ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকে।[৫৭০] এজন্য মূল পরিকল্পনা অনুসারে মুক্তিযোদ্ধারা মোট ৪টি গ্রুপে ভাগ হয়ে যায়। সিদ্ধান্ত নেওয়া হয় গাজী রফিকুল ইসলাম এক দল নিয়ে চাপড়া গ্রামের পশ্চিমে জেলা বোর্ডের পাকা রাস্তার উপর একটি কালভার্ট উড়িয়ে দিবে এবং পশ্চিম দিবে এবং পশ্চিম দিক থেকে আক্রমণ পরিচালনা করতে থাকবে। যদি সাতক্ষীরা শহর থেকে পাকিস্তানী হানাদার বাহিনী রাজাকারদের সাহায্য করার জন্য আসে তবে তাদেরকে রোধ এবং ধ্বংস করবে। সবচেয়ে জটিল ও

---

[৫৬১] সাক্ষাৎকার, মোঃ আব্দুল হনান্ন, উপজেলা কমান্ডার, আশাশুনি মুক্তিযোদ্ধা কমান্ড। ৩০/১২/২০১৫ আশাশুনি।
[৫৬২] সাক্ষাৎকার, মোঃ আব্দুল হনান্ন, উপজেলা কমান্ডার, আশাশুনি মুক্তিযোদ্ধা কমান্ড।
[৫৬৩] সাক্ষাৎকার, মোঃ আব্দুল হনান্ন, উপজেলা কমান্ডার, আশাশুনি মুক্তিযোদ্ধা কমান্ড। আরও দেখবেন- কমান্ডো মোঃ খলিলুর রহমান- 'প্রাগুক্ত' পৃষ্ঠা- ১৬১
[৫৬৪] সাক্ষাৎকার, মোঃ আব্দুল হনান্ন, উপজেলা কমান্ডার, আশাশুনি মুক্তিযোদ্ধা কমান্ড।
[৫৬৫] সাক্ষাৎকার, মোশাররফ হোসেন মশু, কমান্ডার, সাতক্ষীরা জেলা মুক্তিযোদ্ধা কমান্ড।
[৫৬৬] সাক্ষাৎকার, মোশাররফ হোসেন মশু, কমান্ডার, সাতক্ষীরা জেলা মুক্তিযোদ্ধা কমান্ড।
[৫৬৭] সাক্ষাৎকার, মোশাররফ হোসেন মশু, কমান্ডার, সাতক্ষীরা জেলা মুক্তিযোদ্ধা কমান্ড।
[৫৬৮] সাক্ষাৎকার, মুক্তিযোদ্ধা মোঃ অহেদ আলী, আরার, আশাশুনি।
[৫৬৯] সাক্ষাৎকার, মুক্তিযোদ্ধা মোঃ অহেদ আলী, আরার, আশাশুনি।
[৫৭০] সাক্ষাৎকার, মুক্তিযোদ্ধা মোঃ অহেদ আলী, আরার, আশাশুনি।

ভয়াবহ কাজটির দায়িত্ব দেওয়া হয় রফিকের উপর।[৫৭১] দ্বিতীয় দলটি আলম সাহেবের নেতৃত্বে সাতার কেটে মরিচ্চাপ নদী পার হয়ে বাঙ্কার ও ট্রেঞ্চের মধ্যে গ্রেনেড ফেলবে। খিজির আলীর নেতৃত্বে তৃতীয় দলটি দক্ষিণ দিক থেকে আক্রমণ শুরু করে উভয় দিকে অগ্রসর হতে থাকায় এবং রহমত উল্লাহ দাদুর নেতৃত্বে চতুর্থ দলটি বেতনা নদী পার হয়ে উত্তর দিক থেকে চাপড়ায় রাজাকার ক্যাম্প আক্রমণ করবে।[৫৭২] এই দলে স.ম. বাবর আলী অংশগ্রহণ করেন এবং এক পর্যায়ে খিজির আলীর নেতৃত্বাধীন দলে মিশে যাবার সিদ্ধান্ত হয়।[৫৭৩] চাপড়া গ্রাম আক্রমণের পরিকল্পনা অনুযায়ী রফিক সবার আগে রওনা হবে যেহেতু তার দায়িত্ব এবং পথের দুরত্ব অনেক বেশী। অন্যান্য মুক্তিযোদ্ধারা তাদের নেতৃত্বাধীন মক্তিবাহিনী নিয়ে যে যার সুবিধাজনক অবস্থানে যাবে।[৫৭৪] গাজী রফিক কালভার্টের স্লাব ও বিস্ফোরক লাগিয়ে আগুন জ্বালিয়ে সবাইকে যুদ্ধ শুরু করার সংকেত প্রদান করবে। মক্তিযোদ্ধাদের প্রতিটি অভিযানের একটা কোড ওয়ার্ড বা সাংকেতিক শব্দ ব্যবহার করে এবং ঐ দিনের অভিযানের সাংকেতিক শব্দ ফুল নির্বাচন করা হয়।[৫৭৫] রাতে সবাই খাবার খেয়ে পরিকল্পনা অনুযায়ী রওনা হয় এবং সবার দলকে প্রয়োজনীয় নির্দেশ প্রদান করা হয়। গন্তব্য স্থলে পৌছানোর পর সবাই গভীর আগ্রহে জেলা বোর্ডের রাস্তা অর্থাৎ আশাশুনি সাতক্ষীরা রাস্তার দিকে চেয়ে রফিকের আগুন জ্বালিয়ে যুদ্ধের শুরুর সংকেত পাওয়ার জন্য অপেক্ষা করতে থাকে।[৫৭৬] অবশেষে মুক্তিযোদ্ধারা দূরে আগুনের শিখা দেখে যুদ্ধ আরম্ভ করে।[৫৭৭] এদিকে আলম সাহেবের নেতৃত্বে মুক্তিবাহিনী গ্রেনেড বিস্ফোরন করে।[৫৭৮] রফিকের নেতৃত্বে মুক্তিবাহিনী আশাশুনি সাতক্ষীরা পাকা রাস্তা দিয়ে অগ্রসর হয়, খিজির আলীর নেতৃত্বে মুক্তিযোদ্ধারা দক্ষিণ দিক থেকে যুদ্ধ করতে করতে উত্তর দিকে যেতে থাকে এবং রহমত উল্লাহ ও স.ম. বাবর আলী উত্তর দিক থেকে আক্রমণ করতে করতে দক্ষিণ দিকে অগ্রসর হয়।[৫৭৯] মুক্তিযোদ্ধাদের এ আকস্মিক আক্রমনে রাজাকাররা দিক শূন্য হয়ে তাদের বাড়ি-ঘর ছেড়ে এদিক ওদিক পালিয়ে আশ্রয় নেয়।[৫৮০] মুক্তিযোদ্ধারা এই সুযোগে শান্তি কমিটির নেতাদের বাড়ি-ঘর ও রাজাকারদের ক্যাম্প পুড়িয়ে দেয় যেটা অনেক দূর থেকে সবাই দেখতে পায়। কিন্তু সারা রাত ধরে চাপড়া গ্রাম তল্লাশী করা হয় রাজাকারদের ধরার জন্য কিন্তু কোন রাজাকারদের সন্ধান পাওয়া যায় না কারণ যে যার মত জীবন বাঁচাতে পাশের ধান ক্ষেতে ও বন জঙ্গলে গিয়ে লুকিয়ে পড়ে।[৫৮১] মুক্তিযোদ্ধারা রাজাকারদের ধরতে না পেরে তাদের আশ্রয়দানকারীদের সতর্ক করে দেয়। তারপর ভোর হলে সব মুক্তিযোদ্ধারা মরিচ্চাপ নদী পার হয়ে কেয়ারগাতিতে ফিরে আসে এবং তাদের সব পরিশ্রম ব্যর্থ হলেও রাজাকারদের আস্থানা পুড়িয়ে দেওয়ায় তারা

[৫৭১] সাক্ষাৎকার, মুক্তিযোদ্ধা মোঃ অহেদ আলী, আরার, আশাশুনি।
[৫৭২] সাক্ষাৎকার, মুক্তিযোদ্ধা মোঃ অহেদ আলী, আরার, আশাশুনি।
[৫৭৩] সাক্ষাৎকার, মুক্তিযোদ্ধা মোঃ অহেদ আলী, আরার, আশাশুনি।
[৫৭৪] সাক্ষাৎকার, মুক্তিযোদ্ধা মোঃ আব্দুল হান্নান।
[৫৭৫] সাক্ষাৎকার, মুক্তিযোদ্ধা মোঃ আব্দুল হান্নান।
[৫৭৬] সাক্ষাৎকার, মুক্তিযোদ্ধা মোঃ আব্দুল হান্নান।
[৫৭৭] সাক্ষাৎকার, মোশাররফ হোসেন মশু, কমান্ডার, সাতক্ষীরা জেলা মুক্তিযোদ্ধা কমান্ড।
[৫৭৮] সাক্ষাৎকার, মোশাররফ হোসেন মশু, কমান্ডার, সাতক্ষীরা জেলা মুক্তিযোদ্ধা কমান্ড।
[৫৭৯] সাক্ষাৎকার, মোশাররফ হোসেন মশু, কমান্ডার, সাতক্ষীরা জেলা মুক্তিযোদ্ধা কমান্ড।
[৫৮০] সাক্ষাৎকার, মুক্তিযোদ্ধা মোঃ আব্দুল হান্নান।
[৫৮১] সাক্ষাৎকার, মুক্তিযোদ্ধা মোঃ আব্দুল হান্নান।

অনেকটা সংকিত হবে। মাদরা স্কুলে সব মুক্তিযোদ্ধা চিড়া-মুড়ি ও গুড় দিয়ে নাস্তা করার পর বিশ্রাম করে।[৫৮২] ওদিকে রহমত উল্লাহ, খিজির আলী, আলম সাহেব, রফিক ও স.ম. বাবর আলী রাজাকারদের পুরাপুরি ভাবে উৎখাত করার পরিকল্পনা করে কারণ যেকোন সময় সাতক্ষীরা থেকে পাকিস্তানী হানাদার এসে মুক্তিযোদ্ধাদের উপর অভিযান চালাবে।[৫৮৩] সুতরাং মুক্তিযোদ্ধারা সবাই মিলে ঐ রাতেই আবার রাজাকারদের উপর আক্রমণ চালানোর পরিকল্পনা করে। কারণ যেহেতু গত রাতে রাজাকারদের উপর আক্রমণ হয়েছে সুতরাং আজ রাতে আক্রমণ হতে পারে এটা ভাবতে পারবে না। মুক্তিযোদ্ধারা রাজাকার ক্যাম্প হামলা করে ব্যাপক গোলা বর্ষণ শুরু করে।[৫৮৪] রাজাকাররাও পাল্টা বিচ্ছিন্ন ভাবে গুলি করতে থাকে, তবে মুক্তিযোদ্ধাদের আকস্মিক গ্রেনেড হামলায় কয়েকজন মারা যায় এবং কয়েকজন আহত হয়। সারা গ্রাম খুঁজে মাত্র ৪/৫ জন রাজাকারকে অস্ত্রসহ ধরা সম্ভব হয়।[৫৮৫] মুক্তিযোদ্ধাদের আক্রমণে চাপড়ার রাজাকারদের ক্যাম্প ক্ষতিগ্রস্থ হলেও শান্তি কমিটির নেতাদের ধরা সম্ভব হয়নি এবং তাদেরকে পুরোপুরি উচ্ছেদ করা সম্ভব হয়নি।[৫৮৬] চাপড়া গ্রামের দ্বিতীয় দিনের অভিযান সফল না হলেও এ আক্রমণের কারণে অনেক রাজাকার সাতক্ষীরায় গিয়ে অস্ত্র ফেরত দেয় এবং তাদের পিতা-মাতা ও আত্মীয় স্বজনের পরামর্শ ও চাপে রাজাকারগিরি ছেড়ে দেয়।[৫৮৭] অবশেষে সব মুক্তিযোদ্ধারা ঘাঁটিতে ফিরে আসে কিন্তু রফিক ও তার নেতৃত্বে মুক্তিবাহিনী ক্যাম্পে ফিরতে দেরি করে কারণ ক্যাম্পে ফেরার সময় ধান ক্ষেতের মধ্যদিয়ে আসার সময় রাজাকাররা রফিকের নেতৃত্বে মুক্তিবাহিনীর উপর গোলাবর্ষণ শুরু করলে রফিক এবং তার বাহিনী রাস্তার আড়ালে থেকে রাজাকারদের উদ্দেশ্যে ব্যাপক গোলাবর্ষণ করে নৌকা পার হয়ে ক্যাম্পে ফিরে আসে।[৫৮৮] চাপড়া যুদ্ধে অংশগ্রহণকারী মুক্তিযোদ্ধারা হলেন সা.মে. কমান্ডার মেজর (অবঃ) সামসুল আরেফিন, খিজির আলী (বীর বিক্রম), স.ম. বাবর আলী, কামরুজ্জামান টুকু, বদিউল আলম (বীর উত্তম), শেখ আঃ কাইয়ুম, আলী আশরাফ, মোঃ আব্দুল হান্নান, অহেদ আলী, মোশাররফ হোসেন মশু, গফুর মাষ্টার। এছাড়াও যুদ্ধে অংশগ্রহণকারী নৌ কমান্ডার হলেন আঃ গফুর, আলী আশরাফ, আলফাজ উদ্দীন, জি.এম.এ. রহিম, আঃ গফফার, ড. মাহফুজ, আঃ জলিল, আকরাম হোসেন, এনামুল হক, খলিল উল্লাহ সহ ২০ জন নৌ কমান্ডার এবং স্থলবাহিনীর মুক্তিযোদ্ধা ৭০-৮০ জন।[৫৮৯]

[৫৮২] সাক্ষাৎকার, মুক্তিযোদ্ধা মোঃ আব্দুল হান্নান।
[৫৮৩] সাক্ষাৎকার, মুক্তিযোদ্ধা মোঃ অহেদ আলী, আরার, আশাশুনি।
[৫৮৪] সাক্ষাৎকার, মুক্তিযোদ্ধা মোঃ অহেদ আলী, আরার, আশাশুনি।
[৫৮৫] সাক্ষাৎকার, মুক্তিযোদ্ধা মোঃ অহেদ আলী, আরার, আশাশুনি।
[৫৮৬] সাক্ষাৎকার, মুক্তিযোদ্ধা মোঃ অহেদ আলী, আরার, আশাশুনি।
[৫৮৭] সাক্ষাৎকার, মুক্তিযোদ্ধা মোঃ অহেদ আলী, আরার, আশাশুনি।
[৫৮৮] সাক্ষাৎকার, মুক্তিযোদ্ধা মোঃ অহেদ আলী, আরার, আশাশুনি।
[৫৮৯] সাক্ষাৎকার, মুক্তিযোদ্ধা মোঃ অহেদ আলী, আরার, আশাশুনি।

আশাশুনি উপজেলা

৩.১৯ কেয়ারগাতি রাজাকার ঘাঁটির উচ্ছেদ অভিযান

কেয়ারগাতি বড়দল ইউনিয়নের অন্তর্গত একটি গ্রাম যেটি আশাশুনি উপজেলা ও বড়দল বাজারের মধ্যবর্তী স্থানে মরিচ্চাপ নদীর তীরে অবস্থিত। আশরাফ উদ্দীন মকবুল নামক এক অত্যাচারী বড়দল ইউনিয়নের চেয়ারম্যান যিনি মুসলিম লীগের নেতা এখানে বাস করতো।[৫৯০] মকবুলের দোতলা বাড়িকে কেন্দ্র করে রাজাকারদের ক্যাম্প গড়ে ওঠে এবং এই ক্যাম্প থেকে রাজাকাররা সাধারণ মানুষের উপর অত্যাচার নির্যাতন চালাতে থাকে।[৫৯১] এখানকার নদী পথ ভারতে যাবার একমাত্র পথ হিসেবে ব্যবহৃত হয় সেজন্য বাগেরহাট, রামপাল, মোড়লগঞ্জ, দাকোপ, বটিয়াঘাটা, পাইকগাছা, আশাশুনি উপজেলা সহ আরও অন্যান্য এলাকার শরণার্থীরা নিরাপদ আশ্রয়ের জন্য ভারতে যাবার জন্য এই নদী পথ ব্যবহার করে।[৫৯২] কিন্তু মকবুল ও রাজাকার বাহিনী শরণার্থীদের নৌ থামিয়ে তাদের সর্বস্ব কেড়ে নেয় এবং শান্তি কমিটির লুটেরা রাজাকাররা নৌকা যোগে ভারতে যেতে থাকা এই সাধারণ মানুষের উপর অত্যাচার, নির্যাতন করে, এমনকি সুন্দরী মেয়েদের অপমান করে।[৫৯৩] মোট কথা কেয়ারগাতি এই মোহনা দিয়ে যাবার সময় শরণার্থীরা তাদের টাকা পয়সা, অলংকার, কাপড়-চোপড় সবই রাজাকারদের দিয়ে দেয়। রাজাকাররা এই বাড়িকে চেকপোস্ট হিসেবে ব্যবহার করে এবং এটিই অত্যাচার অনাচারের কেন্দ্রবিন্দুতে পরিণত হয়। এখানকার স্থানীয় মানুষেরা এদের অত্যাচারের হাত থেকে রক্ষা পাবার জন্য গোপনে মুক্তিযোদ্ধা ক্যাম্পে খবর দেয় এবং মুক্তিযোদ্ধারা রাজাকার ক্যাম্প আক্রমণ করার পরিকল্পনা করে।[৫৯৪] আব্দুল আজিজ সানা নামক একজন মুক্তিযোদ্ধা এই গ্রামের বাসিন্দা হবার কারণে রাজাকারদের খোজ খবর আনার জন্য তাকে পাঠানো হয়।[৫৯৫] শ্রাবণ মাসের এক বর্ষার রাতে স.ম. বাবর আলী সহ ২০/২২ জনের একটা মুক্তিবাহিনী খোলপেটুয়া নদী পার হয়ে কেয়ারগাতি পাড়ে ৩/৪ মাইল দুরে জেলেখালী গ্রামের একটি পরিত্যক্ত হিন্দু বাড়িতে আশ্রয় গ্রহণ করে এবং আজিজ সানা যাকে মুক্তিযোদ্ধারা বড় ভাই নামে ডাকত তিনি খাবার এনে দিলে মুক্তিযোদ্ধারা খাবার খেয়ে এখানে বিশ্রাম নেয়ার পরিকল্পনা করে। পরের দিন রাতে রাজাকার ক্যাম্প আক্রমণ করে পরিকল্পনা করায় যার ফলে এই পরিত্যক্ত বাড়িতেই মুক্তিযোদ্ধারা সারারাত সারাদিন অবস্থান করে।[৫৯৬] পাশের জমিতে কৃষকরা জমি চাষ করলেও তাদেরকে মুক্তিযোদ্ধা হিসেবে চিনতে পারে না। পরের দিন রাতে অভিযান শুরু করে এবং রাজাকার ক্যাম্পের

[৫৯০] সাক্ষাৎকার, মুক্তিযোদ্ধা মোঃ অহেদ আলী, আরার, আশাশুনি। ৩০/১২/২০১৫ আশাশুনি।
[৫৯১] সাক্ষাৎকার, মুক্তিযোদ্ধা মোঃ অহেদ আলী, আরার, আশাশুনি।
[৫৯২] সাক্ষাৎকার, মুক্তিযোদ্ধা মোঃ অহেদ আলী, আরার, আশাশুনি।
[৫৯৩] সাক্ষাৎকার, মোঃ আব্দুল হান্নান, উপজেলা মুক্তিযোদ্ধা কমান্ডার, আশাশুনি।
[৫৯৪] সাক্ষাৎকার, মোঃ আব্দুল হান্নান, উপজেলা মুক্তিযোদ্ধা কমান্ডার, আশাশুনি।
[৫৯৫] সাক্ষাৎকার, মোঃ আব্দুল হান্নান, উপজেলা মুক্তিযোদ্ধা কমান্ডার, আশাশুনি।
[৫৯৬] সাক্ষাৎকার, মোশাররফ হোসেন মশু, কমান্ডার, সাতক্ষীরা জেলা মুক্তিযোদ্ধা কমান্ড।

এক চতুর্থাংশ মাইল দূরত্বের মধ্যে একটি বাড়িতে আশ্রয় নিয়ে তারা খাবার গ্রহণ করে।[৫৯৭] কিন্তু মুক্তিযোদ্ধাদের আগমনের খবর জানাজানি হওয়ায় তাদেরকে দেখার জন্য মহিলা, পুরুষ, ছেলে-মেয়ে সবাই দেখতে আসে এবং অনেকে মুক্তিযোদ্ধাদের অস্ত্রশস্ত্র হাত দিয়ে ধরে দেখে। অনেকে তাদের সফলতার জন্য আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করে কিন্তু এই সময় হয়তো রাজাকারদের চর বা আত্মীয় স্বজনের কেউ রাজাকার ক্যাম্পে মুক্তিবাহিনীর আগমনের খবর দেয়।[৫৯৮] রাজাকার বাহিনী ক্যাম্পে ছেড়ে অন্যত্র পালিয়ে যায়, যার ফলে মুক্তিযোদ্ধা ক্যাম্পে আক্রমণ করেও কোন রাজাকারকে ধরতে পারেনা। রাজাকারদের না পেয়ে পরবর্তীতে যাতে তারা আবার ঐ বাড়ি পুনরায় দখল করে ঘাঁটি করতে না পারে সেজন্য মুক্তিযোদ্ধারা ঐ বাড়ি পুড়িয়ে দেয়।[৫৯৯] ঐ দিন হরিঢালীর লতিফ সৌভাগ্যক্রমে বেঁচে যায় কারণ লতিফ কোন সংকেত প্রদান না করেও হঠাৎ বাড়ি থেকে বেরিয়ে যেতে থাকে এবং গাজী রফিক তাকে রাজাকার মনে করে তাকে উদ্দেশ্য করে গুলি করে কিন্তু গুলির নিশানা ব্যর্থ হয়ে তার কানের কাছ দিয়ে চলে যায় এবং লতিফ বেঁচে যায়।[৬০০] বাড়িতে শরণার্থীদের পিতলকাসা, কাপড় চোপড়, হিন্দুদের পূঁজার সামগ্রী লুটপাটের জিনিসপত্রে ভরা এবং অনেক খোজাখুঁজির পর কাউকে না পেয়ে মুক্তিযোদ্ধারা আগুন লাগিয়ে দেয় এবং বাড়ির একজন পুড়ে মারা যায় এবং এক মহিলা তার স্বামীকে আগুনের মধ্যে থেকে বের করে।[৬০১] অবশেষে কেয়ারগাতির মকবুল চেয়ারম্যানের বাড়ির রাজাকার ঘাঁটির পতন ঘটে এবং এই গুরুত্বপূর্ণ স্থান দখলের পর মুক্তিবাহিনী এই এলাকায় একটি শক্তিশালী প্রতিরক্ষা ঘাঁটি গড়ে তোলে। এই অভিযানে যেসব মুক্তিযোদ্ধারা অংশ নেন তাঁরা হলেন, স.ম. বাবর আলী, আবুল কালাম আজাদ, গাজী রফিক, আবু বকর, আশাশুনির মনিরুজ্জামান মনি, মান্নান, লক্ষীখোলার আরশাদ, মোঃ আব্দুল গফুর, মোশাররফ হোসেন মশু, আব্দুল হান্নান, অহেদ আলী, খলিলুর রহমান প্রমুখ।[৬০২]

আশাশুনি উপজেলা

৩.২০ আশাশুনি উপজেলা অভিযান ও পল্টুন ধ্বংস

সাতক্ষীরা মহকুরা জেলার অন্তর্গত আশাশুনি উপজেলা জেলা সদর থেকে ৩৫ কিলোমিটার দক্ষিণে অবস্থিত। একদিকে ভারত সীমান্ত, দেবহাটা ও কালীগঞ্জ উপজেলা এবং পূর্বদিকে খুলনা জেলার পাইকগাছা উপজেলার অবস্থান। আশাশুনি উপজেলা থেকে জেলা সদরের যোগাযোগ ব্যবস্থা ভাল হওয়ায় পাকিস্তানী হানাদার বাহিনী

[৫৯৭] সাক্ষাৎকার, মোশাররফ হোসেন মশু, কমান্ডার, সাতক্ষীরা জেলা মুক্তিযোদ্ধা কমান্ড।
[৫৯৮] সাক্ষাৎকার, মোশাররফ হোসেন মশু, কমান্ডার, সাতক্ষীরা জেলা মুক্তিযোদ্ধা কমান্ড।
[৫৯৯] সাক্ষাৎকার, মুক্তিযোদ্ধা মোঃ আব্দুল গফুর।
[৬০০] সাক্ষাৎকার, মুক্তিযোদ্ধা মোঃ আব্দুল গফুর।
[৬০১] সাক্ষাৎকার, মুক্তিযোদ্ধা মোঃ আব্দুল গফুর।
[৬০২] সাক্ষাৎকার, মুক্তিযোদ্ধা মোঃ আব্দুল গফুর।

আশাশুনি উপজেলা এবং এর পাশ্ববর্তী নদীর বিপরীত তীরে চাপড়া গ্রামে শক্তিশালী ঘাঁটি গড়ে তোলে।[৬০৩] সীমান্তের কাছাকাছি হওয়ায় উভয় পক্ষের কাছে সামরিকদিক থেকে এটি গুরুত্বপূর্ণ স্থান এবং এখানে রাজাকার পাকিস্তানী হানাদার ও পুলিশ বাহিনী সবসময় অবস্থান করে। এই ক্যাম্পটাকে আরও শক্তিশালী ও অপ্রতিরোধ্য করার জন্য ৫৫ ফিল্ড রেজিমেন্ট নিয়োগ করা হয়।[৬০৪] সাথে ২১ জন পাঞ্জাবী সেনা সাতক্ষীরা ও কলারোয়ায় অবস্থান করে। এছাড়াও প্রচুর সংখ্যক রাজাকার যোগদান করেন।[৬০৫] দক্ষিণাঞ্চলের উপজেলাগুলি এবং পার্শ্ববর্তী সুন্দরবনকে নিজেদের নিয়ন্ত্রণে রাখার জন্য দু পক্ষের মধ্যে প্রায়ই যুদ্ধ সংঘটিত হয়।[৬০৬] সুন্দরবনের ভিতর দিকে বয়ে চলা নদী পথে সারাদেশ মুক্তিযোদ্ধাদের জন্য যুদ্ধাস্ত্র পাঠানো হতো কিন্তু পাক নৌ কমান্ডাররা এই গানবোট গুলো আক্রমণ করে ধ্বংস করে দিত।[৬০৭] নদীপথে আশাশুনি থেকে সাতক্ষীরার যোগাযোগ ব্যবস্থা ভাল থাকায় পাকিস্তানী হানাদার বাহিনী আশাশুনি উপজেলা অত্যাচারের কেন্দ্র বিন্দুতে পরিণত করে। এই জন্য সাবমেরিন গাজী মোঃ রহমত উল্লাহ মুক্তিযোদ্ধা নেতাদের সাথে পরামর্শ করে আশাশুনি উপজেলা এবং নদীর তীরে চাপড়ায় স্বাধীনতা বিরোধী অভিযান ও মতিয়ারের বাড়িতে অবস্থানরত রাজাকার, মিলিশিয়া ও পুলিশদের উচিত শিক্ষা দেয়ার পরিকল্পনা করে।[৬০৮] পরিকল্পনা শুরুতে আশাশুনি উপজেলা আক্রমণের সিদ্ধান্ত নেয়। মংলা এবং চালনার নদীবন্দরে পাকিস্তানী সেনাদের জাহাজ ডুবির ফলে খানসেনারা নিরাপত্তা বৃদ্ধি করতে সচেষ্ট হয়, ফলে নদীতে যানবাহন চলাচল নিয়ন্ত্রণ করে স্থানীয়ভাবে অনেক গুলো ব্যক্তি মালিকানাধীন বৃহৎ লঞ্চ রিকুইজিশন করে সেগুলোকে খুলনা শিপইয়ার্ড থেকে কিছু রুপান্তর করে ৫ মি.মি. কামান ও হেভি মেশিনগান বসিয়ে গানবোট এ রুপান্তর করে নিরাপত্তা রক্ষার কাজে লাগায়। যার ফলে নৌ কমান্ডাদের কৈলাসগঞ্জ থেকে তাদের আশ্রয়স্থল সরিয়ে সুন্দরবনের ভিতরে আনা হয়।[৬০৯] এ জন্য সেনাশক্তি বৃদ্ধির জন্য সাব মেরিনার এবং নৌ প্রশিক্ষণ ঘাঁটির অন্যতম সংগঠক গাজী মোঃ রহমত উল্লাহর নেতৃত্বে ৩০ জন নৌ কমান্ডারসহ একটি মুক্তিবাহিনী মংলা এলাকায় পাঠানো হয়।[৬১০] সময়টা প্রায় অক্টোবরের মাঝামাঝি যার ফলে যোদ্ধাদের শক্তি অনেক গুণ বেড়ে যায় এবং গড়ে ওঠে বৃহৎ মুক্তিযোদ্ধা সংগঠক গাজী রহমত উল্লাহর নেতৃত্বে যুদ্ধ করার পরিকল্পনা করেন।[৬১১] যার ফলে সাতক্ষীরা ও খুলনার দক্ষিণাঞ্চলে শত্রুঘাঁটি একের পর এক মুক্ত হতে থাকে। এই সময়ে আশাশুনি পাকিস্তানী বাহিনী এবং রাজাকারদের অত্যাচারের

[৬০৩] সাক্ষাৎকার, মুক্তিযোদ্ধা মোঃ শাহারুজ্জামান, ইউনিয়ন কমান্ডার, আশাশুনি। ২৩/১২/২০১৫ আশাশুনি, সাতক্ষীরা।
[৬০৪] সাক্ষাৎকার, মুক্তিযোদ্ধা মোঃ শাহারুজ্জামান, ইউনিয়ন কমান্ডার, আশাশুনি।
[৬০৫] সাক্ষাৎকার, মুক্তিযোদ্ধা বীরেন্দ্রনাথ সরকার, শ্রীউলা, আশাশুনি। ২৩/১২/২০১৫ আশাশুনি, সাতক্ষীরা।
[৬০৬] সাক্ষাৎকার, মুক্তিযোদ্ধা বীরেন্দ্রনাথ সরকার, শ্রীউলা, আশাশুনি।
[৬০৭] সাক্ষাৎকার, মুক্তিযোদ্ধা বীরেন্দ্রনাথ সরকার, শ্রীউলা, আশাশুনি।
[৬০৮] সাক্ষাৎকার, মুক্তিযোদ্ধা মোঃ গোলাম কুদ্দুস, পাইকপাড়া, আশাশুনি।
[৬০৯] সাক্ষাৎকার, মুক্তিযোদ্ধা মোঃ গোলাম কুদ্দুস, পাইকপাড়া, আশাশুনি।
[৬১০] সাক্ষাৎকার, মুক্তিযোদ্ধা মোঃ গোলাম কুদ্দুস, পাইকপাড়া, আশাশুনি।
[৬১১] সাক্ষাৎকার, মুক্তিযোদ্ধা এ.কে.এম শামসুল হুদা, আশাশুনি। ২৩/১২/২০১৫ আশাশুনি, সাতক্ষীরা।

মাত্রা অনেক গুণ বেড়ে যায়।[৬১২] ফলে মুক্তিবাহিনী আশাশুনি উপজেলা থেকে রাজাকারদের উৎখাতের পরিকল্পনা করে, কারণ আশাশুনি থেকে খান সেনাদের বিতাড়িত করা সম্ভব হলে সাতক্ষীরা জেলার দক্ষিণাঞ্চল মুক্ত হবে এবং সাথে সাথে মংলা বন্দর সহ অন্যান্য বন্দর গুলোতে নৌ কমান্ডারদের অভিযান চালানো অনেক সহজ হবে।[৬১৩] পরিকল্পনা অনুসারে মুক্তিযোদ্ধা ও নৌ কমান্ডো বাহিনী আশাশুনি উপজেলা দখলের জন্য ৬ অক্টোবর রাতে আক্রমণ চালায়।[৬১৪] কিন্তু পাকিস্তানী হানাদার বাহিনী নিরাপত্তা রক্ষার জন্য পাশের বিভিন্ন বাড়ির ছাদে প্রতিরক্ষা ব্যুহ তৈরি করে রাখায় মুক্তিবাহিনীর প্রায় ১১ জন মুক্তিযোদ্ধা মারাত্মকভাবে আহত হয়।[৬১৫] এই দিনের জীবনপণ যুদ্ধে যারা অংশগ্রহণ করেন তারা হলেন মেজর সামছুল আরেফিন, গাজী মোঃ রহমত উল্লাহ, খিজির আলী, কামরুজ্জামান টুকু, আবুল হোসেন গাজী, মোঃ অহেদ আলী, মোঃ গোলাম কুদ্দুস, মোঃ শাহারুজ্জামান, স.ম. বাবর আলী ও শেখ আঃ কাইয়ুম।[৬১৬] প্রথম দিনের যুদ্ধে উপজেলা দখল করা সম্ভব না হলেও পরের দিন মুক্তিযোদ্ধারা আবার নতুন উদ্যামে পরিকল্পিত ভাবে আশাশুনি উপজেলায় অভিযান চালায়।[৬১৭] এই দিন নৌ কমান্ডার জীবনের ঝুঁকি নিয়ে অপর পারে উপজেলার ঘাঁটে ভাসমান ফেরী পল্টুনে ৩-৪ টি মাইন বিস্ফোরন ঘটায় বিকট শব্দ হয় এবং ফেরি ঘাঁট ধবংস হয়ে যায়।[৬১৮] এক একটি লোহার পাত ছিটকে অনেক দুরে উঁড়ে চলে যায় এবং নদীর পানি পাহাড়ের মতো উঁচু হয়ে ৩০-৪০ ফুট পর্যন্ত উপরে উঠে পড়ে।[৬১৯] এই অবস্থা দেখে পাকিস্তানী সেনারা ও রাজাকাররা আতংকিত হয়ে এদিক ওদিক পালিয়ে যেতে থাকে।[৬২০] মুক্তিবাহিনীরা ৪টি দলে বিভক্ত হয়ে আশাশুনি উপজেলা আক্রমণ করে এবং উপজেলার ভিতর যেসব রাজকার, পাকিস্তানী হানাদার ছিল তারা দিক শূন্য হয়ে এদিক ওদিক ছুটতে থাকে।[৬২১] এই যুদ্ধে ১১ জন পাকিস্তানী সেনা এবং ৪০ জন রাজাকার নিহত হয়। কমান্ডো জি.এম.এ গফফারের নেতৃত্বে ১০-১২ জনের একটি দল আশাশুনি সাতক্ষীরা সড়কের মাঝে ছোট একটি ব্রিজ এক্সপ্লোসিভ দিয়ে উড়িয়ে দিয়ে সেখানে কার্ট অফ পার্টির দায়িত্ব পালন করেন।[৬২২] মুক্তিবাহিনীর সদস্য খিজির আলী শত্রু বাহিনীর সম্মুখে দুটি এল.এম.জি কাধে চেপে গুলি ছুঁড়তে ছুঁড়তে উপজেলায় গিয়ে ওঠেন।[৬২৩] রাজাকার এবং পাকিস্তানী হানাদার ভীত সংকিত হয়ে অস্ত্র রেখেই পালিয়ে যায়। যার ফলে আশাশুনি উপজেলা মুক্তিযোদ্ধাদের পুরোপুরি দখলে চলে আসে এবং ভারতীয় সেনাবাহিনীর বিগ্রেডিয়ার

---

[৬১২] সাক্ষাৎকার, মুক্তিযোদ্ধা আবুল হোসেন গাজী, গোকুলনগর।
[৬১৩] সাক্ষাৎকার, মুক্তিযোদ্ধা আবুল হোসেন গাজী, গোকুলনগর।
[৬১৪] সাক্ষাৎকার, মুক্তিযোদ্ধা আবুল হোসেন গাজী, গোকুলনগর।
[৬১৫] সাক্ষাৎকার, মুক্তিযোদ্ধা মোঃ অহেদ আলী, আরার, আশাশুনি। ২৩/১২/২০১৫, আশাশুনি, সাতক্ষীরা।
[৬১৬] সাক্ষাৎকার, মুক্তিযোদ্ধা মোঃ অহেদ আলী, আরার, আশাশুনি।
[৬১৭] সাক্ষাৎকার, মুক্তিযোদ্ধা মোঃ অহেদ আলী, আরার, আশাশুনি।
[৬১৮] সাক্ষাৎকার, মুক্তিযোদ্ধা মোঃ গোলাম কুদ্দুস, পাইকপাড়া, আশাশুনি।
[৬১৯] সাক্ষাৎকার, মুক্তিযোদ্ধা মোঃ গোলাম কুদ্দুস, পাইকপাড়া, আশাশুনি।
[৬২০] সাক্ষাৎকার, মুক্তিযোদ্ধা মোঃ গোলাম কুদ্দুস, পাইকপাড়া, আশাশুনি।
[৬২১] সাক্ষাৎকার, মুক্তিযোদ্ধা আবুল হোসেন গাজী, গোকুলনগর।
[৬২২] সাক্ষাৎকার, মুক্তিযোদ্ধা আবুল হোসেন গাজী, গোকুলনগর।
[৬২৩] সাক্ষাৎকার, মুক্তিযোদ্ধা আবুল হোসেন গাজী, গোকুলনগর।

মালিক এই সফলতার জন্য রহমত উল্লাহকে অভিনন্দন জানান।[৬২৪] কিন্তু পরের দিন পাকিস্তানী বাহিনী হেলিকপ্টার নিয়ে এই এলাকায় মুক্তিযোদ্ধাদের খোজ শুরু করে এবং হেলিকপ্টার থেকে নিরীহ গ্রামবাসীর উপর গুলিবর্ষণ করতে থাকে।[৬২৫] যার ফলে মুক্তিযোদ্ধারা সুন্দরবনে গিয়ে আশ্রয় নেয়।[৬২৬] আশাশুনি উপজেলার পতন হলে মুক্তিযোদ্ধারা হানাদার বাহিনীর বাঙ্কার থেকে ১২ জন বাঙালী যুবতীকে উদ্ধার করে।[৬২৭] এই যুদ্ধে যারা জীবন বাজী রেখে যুদ্ধ করেন তারা হলেন- সাবমেরিনার গাজী রহমত উল্লাহ, মেজর সামছুল আরেফিন, খিজির আলী, স.ম. বাবর আলী, কামরুজ্জামান টুকু, শেখ কাইয়ুম, কমান্ডো বজলুর রহমান, আব্দুস সাত্তার, জহুরুল হক, কামরুল হুদা, শাহাদত হোসেন, রমেন্দ্রনাথ, মহেন্দ্র, আঃ কাদের, আবুল হোসেন, সৈয়দ আকরাম, খলিল উল্লাহ, আলফাজ উদ্দীন, সুবোধ বিশ্বাস, আঃ হক, জি.এম আঃ রহিম, মাহফুজুর হক, জি.এম.এ গফফার, বিশ্বনাথ পালিত, আঃ গফুর, সুশীল কুমার, সুবোধ কুমার, দিলীপ কুমার রায়, শফিক, জবেদ আলী, আশরাফ, প্রফুল-কুমার সহ ৪০-৫০ জন নৌ কমান্ডার এবং ২০ জন স্থলবাহিনীর গেরিলা মুক্তিযোদ্ধা।[৬২৮]

দেবহাটা উপজেলা

৩.২১ টাউন শ্রীপুরের অভিযান

টাউন শ্রীপুর গ্রাম সাতক্ষীরা মহকুমার দেবহাটা উপজেলার ইছামতি নদীর তীরে অবস্থিত এবং গ্রামের পশ্চিমদিক থেকে বয়েচলা নদীটি বাংলাদেশ ও ভারত দুটি দেশের রাষ্ট্রীয় সীমানা নির্দেশ করে।[৬২৯] টাউন শ্রীপুরের নদীর অপর পাড়ে ভারতের টাকী গ্রাম যেখানে মুক্তিযোদ্ধা কমান্ডার শাহজান মাস্টারের নেতৃত্বে একটি শক্তিশালী মুক্তিবাহিনী গড়ে উঠে।[৬৩০] শাহজান মাস্টার একজন স্কুল শিক্ষক এবং তার বাড়ি দেবহাটা উপজেলার টাউন শ্রীপুর গ্রামে। কিন্তু খান সেনাদের অত্যাচারে টাউন শ্রীপুর গ্রামের সাধারণ মানুষজন অতিষ্ট হয়ে নবম সেক্টর কমান্ডার জলিল ও শাহজান সাহেবের নিকট এসে অভিযোগ করায় এক রাতে পাকিস্তানী হানাদার ক্যাম্পে আক্রমণ করার পরিকল্পনা করা হয়।[৬৩১] টাকী ক্যাম্পে অনেক আলাপ আলোচনার পর ক্যাপ্টেন শাহজান মাস্টারকে অধিনায়ক করা হয় কারণ তিনি অনেক সাহসী ও কৌশলী যোদ্ধা, তাছাড়া তার বাড়ি এই অঞ্চলে হওয়ায় এ অঞ্চলের রাস্তা ঘাট, সবই তার অনেক পরিচিত। পাকিস্তানী বাহিনীর বাঙ্কার রাতে

[৬২৪] সাক্ষাৎকার, মুক্তিযোদ্ধা মোঃ শাহারুজ্জামান, ইউনিয়ন কমান্ডার, আশাশুনি।
[৬২৫] সাক্ষাৎকার, মুক্তিযোদ্ধা মোঃ শাহারুজ্জামান, ইউনিয়ন কমান্ডার, আশাশুনি।
[৬২৬] সাক্ষাৎকার, মুক্তিযোদ্ধা মোঃ শাহারুজ্জামান, ইউনিয়ন কমান্ডার, আশাশুনি।
[৬২৭] সাক্ষাৎকার, মুক্তিযোদ্ধা মোঃ শাহারুজ্জামান, ইউনিয়ন কমান্ডার, আশাশুনি।
[৬২৮] সাক্ষাৎকার, মুক্তিযোদ্ধা মোঃ শাহারুজ্জামান, ইউনিয়ন কমান্ডার, আশাশুনি।
[৬২৯] সাক্ষাৎকার, মোঃ আব্দুর রউফ, দেবহাটা উপজেলা, সহকারী কমান্ডার। ২৯/১২/২০১৫ দক্ষিণ পারুলিয়া।
[৬৩০] সাক্ষাৎকার, মোঃ আব্দুর রউফ, দেবহাটা উপজেলা, সহকারী কমান্ডার।
[৬৩১] সাক্ষাৎকার, মোঃ আব্দুর রউফ, দেবহাটা উপজেলা, সহকারী কমান্ডার।

গ্রেনেড নিক্ষেপ স্টেনগান এবং এল.এম.জি কিছু ব্রাশ ফায়ার করার পরিকল্পনা করা হয়।[৬৩২] ৬ জুন রাতে মুক্তিযোদ্ধারা তিনটি দলে বিভক্ত হয়ে একসাথে ইছামতি নদী পার হয় এবং সিদ্ধান্ত নেওয়া হয় একদল পারুলিয়া ব্রিজ উড়িয়ে দেবে, একদল কোন একটা দিয়ে বাংলাদেশের অভ্যন্তরে প্রবেশ করবে এবং আর একটি বাহিনী ঝটিকা ক্যাম্প আক্রমণ করবে।[৬৩৩] মুক্তিযোদ্ধারা মোট ৩৫ জন এবং নৌকায় ইছামতি নদী পার হয়ে বাংলাদেশে প্রবেশ করে তিনটি দল যে যার গন্তব্যস্থলে রওনা হয়।[৬৩৪] মুক্তিযোদ্ধাদেরকে নিরাপদ স্থানে রেখে কমান্ডার শাহজান সাহেব ও স.ম. বাবর আলী পাকিস্তানী সেনাদের বাঙ্কারে খুব সাবধানে খবরা খবর আনতে যায়।[৬৩৫] কিন্তু বাঙ্কারে একবারেই নিরবতা দেখে তারা আরও কিছুদুর এগিয়ে বাঙ্কারের ভিতরে চলে যায় কিন্তু কাউকে খুজে পায় না। মুক্তিযোদ্ধারা ১টি এল.এম.জি, এস.এল.আর, এস.এম.জি এবং ডজন দুয়েক গ্রেনেড সাথে করে আনে।[৬৩৬] স.ম. বাবর আলী ও মাস্টার শাহজান সাহেব দুজন আলাপ আলোচনা করে নিকটে একটি বাড়ির এক লোককে ঘুম থেকে ডেকে মিলিটারীর অবস্থানের কথা জানতে চাইলে সে জানায় পাকিস্তানী সেনারা সন্ধ্যার পূর্বেই এই এলাকা ছেড়ে চলে যায় এবং দূরে একটি দোতলা বাড়িতে থাকে অথবা সাতক্ষীরা চলে যায়। সব খবরাখবর আনার পর সব মুক্তিযোদ্ধারা একটি পরিত্যাক্ত বাড়িতে আশ্রয় নেয় কিন্তু শাহজান মাস্টার নবম সেক্টর কমান্ডার মেজর জলিল এর নির্দেশের জন্য তার কাছে রওনা হন। রাত দুটার দিকে ফিরে মাস্টার শাহজান পরের দিন খানসেনাদের উপর অনেক বিপদের আশংকা থেকে, তাছাড়া মুক্তিযোদ্ধাদের কাছে তেমন আধুনিক অস্ত্র, সামরিক প্রস্তুতি ও সরঞ্জমাদিও নেই। তাছাড়া ইছামতি নদী মুক্তিযোদ্ধাদের একটা বড় বিপত্তির কারণ। মুক্তিযোদ্ধারা ইছামতির তীরবর্তী আহমদ মিস্ত্রির বাড়ির ৩৫ জনের ৩টি দলে বিভক্ত হয়ে একজন ইঞ্জিনিয়ার সহ এল.এম.জি নিয়ে ১০/১১ জনের একটি দল পূর্বদিকের একটা ঘরে ১২/১৩ জনের একটা দল নিয়ে শাহজান সাহেব খুব নিকটে একটা ঘরে এবং মুক্তিযোদ্ধাদের নিয়ে স.ম. বাবর আলী মাঝখানের একটা ঘরে অবস্থান করে।[৬৩৭] সিদ্ধান্ত নেওয়া হয় রাতে মুক্তিযোদ্ধারা এখানে বিশ্রাম নিয়ে সকালে নাস্তা করার পর একটা সুবিধাজনক সময়ে আক্রমণ করবে। কিন্তু মাস্টার শাহজান বাহিনীর নূর মোহাম্মদ নামে একটি ছেলে ঐ রাতেই নিকটে তার বাড়িতে যায় এবং কোন কারণে মুক্তিবাহিনীর আগমন ও পরিকল্পনার কথা মিলিটারীর কাছে ফাঁস করে দেওয়ায় পাকিস্তানী সেনারা মুক্তিবাহিনীর উপর আক্রমণের পরিকল্পনা করে।[৬৩৮] ঘর গুলো গোলপাতার ছাউনি এবং কুঞ্চির বেড়ার উপর আধা ইঞ্চি পুরো মাটির প্রলেপ দেওয়ায় খুব বেশি নিরাপদ নয়, ওদিকে সকাল বেলা সবার জন্য নারকেল দিয়ে ফেনাভাতের আয়োজন করা

---

[৬৩২] সাক্ষাৎকার, মোঃ আব্দুর রউফ, দেবহাটা উপজেলা, সহকারী কমান্ডার।
[৬৩৩] সাক্ষাৎকার, শেখ গোলাম হোসেন, দক্ষিণ পারুলিয়া, দেবহাটা। ২৯/১২/২০১৫ দক্ষিণ পারুলিয়া।
[৬৩৪] সাক্ষাৎকার, শেখ গোলাম হোসেন, দক্ষিণ পারুলিয়া, দেবহাটা।
[৬৩৫] মীর মুস্তাক আহমেদ রবি, 'চেতনায় একাত্তর' জোনাকী প্রখাশনী, ঢাকা, পৃষ্ঠা- ৭৬।
[৬৩৬] মীর মুস্তাক আহমেদ রবি, 'প্রাগুক্ত' পৃষ্ঠা- ৭৭।
[৬৩৭] মীর মুস্তাক আহমেদ রবি, 'প্রাগুক্ত' পৃষ্ঠা- ৭৮।
[৬৩৮] মীর মুস্তাক আহমেদ রবি, 'প্রাগুক্ত' পৃষ্ঠা- ৭৯।

হয়েছে। স.ম. বাবর আলী এবং মাস্টার শাহজান পাকিস্তানী সেনাদের উপর আক্রমণের পরিকল্পনা করার সময় দুজন পাকিস্তানী সেনাকে পূর্বদিকের বাগানের ভিতরদিয়ে আসতে দেখে তখন তারা বুঝতে পারে পাকিস্তানী সেনাদের দ্বারা আক্রান্ত এবং মাস্টার বীর বিক্রমের যুদ্ধ করে বের হবার নির্দেশ দেয়।[৬৩৯] খুব তাড়াতাড়ি স.ম. বাবর আলী ও মাস্টার শাহজান ঘরে গিয়ে সকলকে জানিয়ে যুদ্ধে প্রস্তুতি নিতে বলে এবং সবাই গভীর ঘুমে আচ্ছন্ন থাকায় মিলিটারীর আগমনের কথা শুনে চমকে উঠে জীবনপণ যুদ্ধ করার জন্য অস্ত্র হাতে তুলে নেয়।[৬৪০] মুক্তিবাহিনী কোন ঘরে আছে পাকিস্তানী সেনারা সেটা বুঝতে না পেরে উঠানে দাড়িয়ে তদারকি করার সময় ইঞ্জিনিয়ারের ঘর থেকে পাকিস্তানী সেনার উপর গুলি বর্ষণ করায় সে লাফ দিয়ে মাটিতে পড়ে অস্ত্র নিয়ে গুলি করা শুরু করে।[৬৪১] যুদ্ধ করতে করতে জীবন বাজি রেখে পাকিস্তানী সেনাদের মেরে খুব দ্রুত ঘর থেকে বের হবার পরিকল্পনা করা হয়। স.ম. বাবর আলী ছাড়া সবাই গুলি করতে করতে বের হয়, কিন্তু তিনি ঢেঁকি ঘরের উচু দেয়ালের আড়াল একটি রাইফেল নিয়ে সবকিছু অবলোকন করে খুব দ্রুত ঝোপঝাড়ের মধ্যে দিয়ে পানিতোলা ড্রেনের মধ্যে ঢুকে পড়ে কারণ ওদিকে খানসেনারা বৃষ্টির মতো গুলি চালিয়ে যেতে থাকে।[৬৪২] এতটুকু দেরি করা মানে বড় বিপত্তির মুখোমুখি হওয়া। এদিকে পিঠটা কাটায় ফুটে রক্তাক্ত হলেও সেদিকে দৃষ্টি না দিয়ে খুব তাড়াতাড়ি নালার মধ্য দিয়ে এগিয়ে যেতে থাকে। কিছুদুর আগানোর পর মাত্র হাত দশেক দুরে গাছের আড়ালে লুকিয়ে থাকা পাকিস্তানী সেনাকে গুলি করায় সে মাটিতে লুটিয়ে পড়ে।[৬৪৩] এত সামনের থেকে খানসেনাকে গুলি করে স.ম. বাবর আলী ভীষন আনন্দিত কিন্তু বিশ পঁচিশ হাত সামনের দিকে এগিয়ে দক্ষিণ পশ্চিম দিকে মুখ করে রাইফেল উচিয়ে শুয়ে পড়ে থাকা দুজন পাকিস্তানী সেনাকে দেখতে পেয়ে তৎক্ষণাৎ গুলি করা শুরু করলেন।[৬৪৪] কারণ যেকোন মুহুর্তে তারা দেখা মাত্রই তাকে গুলি করবে। এই অবস্থায় একজন খানসেনা গুলি খেয়ে মরল আর একজন আন্দাজে গড়াতে গড়াতে আড়ালে চলে যায়।[৬৪৫] পাকিস্তানী সেনাদের গোলা আর মুক্তিযোদ্ধাদের রাইফেল, এল.এম.জি, গ্রেনেডের শব্দে পুরো এলাকা প্রকম্পিত, ভারতের পাড়ে ইছামতি নদীর তীরে দাঁড়িয়ে হাজার হাজার লোক এই সম্মুখ যুদ্ধ অবলোকন করতে থাকে।[৬৪৬] মুখার্জি দা এবং খায়রুল বাসার দুটো রাইফেল দিয়ে কভারিং ফায়ার দেবার চেষ্টা করতে থাকে।[৬৪৭] উভয় পক্ষ এক রক্তক্ষয়ী যুদ্ধে নিমগ্ন, এদিকে টাকী থেকে মুক্তিযোদ্ধাদের সাহায্য করার জন্য ভারী কামানের গোলা নিক্ষেপ করতে থাকে। কিন্তু পাকিস্তানী হানাদার এবং মুক্তিযোদ্ধারা যুদ্ধ

[৬৩৯] সাক্ষাৎকার, মুক্তিযোদ্ধা মোঃ আব্দুল করিম, সখীপুর।
[৬৪০] সাক্ষাৎকার, মুক্তিযোদ্ধা এ্যাডভোকেট ইউনুচ আলী, সাতক্ষীরা।
[৬৪১] সাক্ষাৎকার, মুক্তিযোদ্ধা এ্যাডভোকেট ইউনুচ আলী, সাতক্ষীরা।
[৬৪২] সাক্ষাৎকার, মুক্তিযোদ্ধা মোঃ আব্দুর রউফ।
[৬৪৩] সাক্ষাৎকার, মুক্তিযোদ্ধা মোঃ আব্দুর রউফ।
[৬৪৪] সাক্ষাৎকার, মুক্তিযোদ্ধা এ্যাডভোকেট ইউনুচ আলী, সাতক্ষীরা।
[৬৪৫] সাক্ষাৎকার, মুক্তিযোদ্ধা মোঃ গোলাম হোসেন।
[৬৪৬] সাক্ষাৎকার, মুক্তিযোদ্ধা মোঃ গোলাম হোসেন।
[৬৪৭] সাক্ষাৎকার, মুক্তিযোদ্ধা মোঃ গোলাম হোসেন।

করতে করতে এমন ভাবে মিশে গেছে যে ভারী কামানের গর্জন সৃষ্টি করা ছাড়া আর কোন সাহায্যই আসে না। গুলাগুলির আওয়াজ অবিরাম ভাবে চলতে থাকে এবং মুক্তিযোদ্ধাদের কে কোথায় তাও জানতে পারার কোন সুযোগ নেই।[৬৪৮] গুলির আওয়াজ ইছামতি নদী পার হয়ে ভারতে প্রতিধ্বনি শোনা যায় এবং ঐ অবস্থায় স.ম. বাবর আলী ড্রেন দিয়ে চলতে চলতে খালে এসে পড়ে এবং ১০০ গজ দুরের ওয়াপদার সুইচ গেটের মধ্যে দিয়ে নিরাপদে আশ্রয় নেয়।[৬৪৯] স.ম. বাবার আলীর রাইফেলের গুলি ফুরিয়ে যায় ঘর থেকে বের হওয়ার সময় ভুল করে স্টেনগান রেখে রাইফেল নিয়ে আসায় বিপদের সম্মুখীন হতে হয়।[৬৫০] যুদ্ধ থামার কোন অবস্থা না দেখে স.ম. বাবর আলী সাঁতরিয়ে ইছামতি নদী পার হবার সিদ্ধান্ত নিয়ে নদীতে ঝাপ দেয়। সাঁতরিয়ে নদীর দুই তৃতীয়াংশ পার হবার পর টাকীর পার থেকে একটা নৌকা এসে তাকে তুলে নিয়ে নদীর তীরে পৌছে দেয়।[৬৫১] কিন্তু স.ম. বাবর আলী ওপারে যুদ্ধে যাবার জন্য ব্যস্ত হয়ে যায় এবং শুধু বলতে থাকে আমরা সবাই ঘেরাও হয়ে গেছি, আমার রাইফেলে গুলি ছিল না গুলি দাও, আমি ওপারে যাব।[৬৫২] একই কথা দ্রুত এবং বার বার বলায় সহযোদ্ধা খায়রুল বাশার তার মাথা বিকৃত হয়ে গেছে মনে করে তাকে মলয় কুমার রায় ভুতোদার একটা ঘরে নিয়ে আটকিয়ে রাখে এবং জলমগ্ন থাকায় তাকে কাপড় দিয়ে জড়িয়ে ধরে রাখে।[৬৫৩] কিন্তু স.ম. বাবর আলী বন্ধু ও সহযোদ্ধাদের জন্য উদ্বিগ্ন হয়ে উঠে এবং জানালায় দিয়ে জানালা দূর্বল দেখে সজোরে লাথি মেরে ভেঙ্গে ফেলে, লোকজন তাকে যেন না ধরে রাখতে পারে সে জন্য খুব দ্রুত বেরিয়ে যায়। কিছুদুর যাবার পর সাতক্ষীরার কামরুজ্জামান ও বিলুকে পেয়ে তারা একত্রে তিনজনে ৩টি রাইফেল নিয়ে একটা ভারতীয় নৌকা করে দ্রুত ইছামতি নদী পাড়ি দিয়ে ওপারে পৌছায়।[৬৫৪] যুদ্ধের ক্ষীপ্রতা ততক্ষনে থেমে গেছে এবং তীরে এসে গুলি খেয়ে নদীতে পড়ে থাকা হাবলুকে দেখে তাকে নৌকায় বিলুর নিকটে রেখে কামরুজ্জামান ও স.ম. বাবর আলী একে একে সহ মুক্তিযোদ্ধাদের নামধরে ডাকতে থাকে।[৬৫৫] তাড়াতাড়ি ঘরে গিয়ে তারা তাদের অস্ত্র গ্রেনেড সবই ঠিক আছে দেখে অন্যান্য মুক্তিযোদ্ধাদের সাথে এগুলো গুছিয়ে নিয়ে অন্য একটি ঘরে নারায়নের মৃত দেহ দেখতে পায়।[৬৫৬] ঘর থেকে বেরিয়ে স.ম. বাবর আলী অন্যান্য মুক্তিযোদ্ধাদের খুজতে গিয়ে প্রায় ২৩টা খানসেনাদের লাশ উঠানের এখানে সেখানে পড়ে থাকতে দেখতে পায়।[৬৫৭] ঠিক এমন সময় ৩-৪ পাকিস্তানী হানাদার তাদের সঙ্গিদের খোজে এখানে আসতে দেখে স.ম. বাবর আলী হ্যান্ডস আপ বলে সজোরে চিৎকার করে এবং দুই তিনজন মিলে একসাথে গুলি করায় তারা

[৬৪৮] সাক্ষাৎকার, মুক্তিযোদ্ধা মোঃ আব্দুল করিম।
[৬৪৯] সাক্ষাৎকার, মুক্তিযোদ্ধা মোঃ আব্দুল করিম।
[৬৫০] সাক্ষাৎকার, মুক্তিযোদ্ধা মোঃ আব্দুল করিম।
[৬৫১] সাক্ষাৎকার, মুক্তিযোদ্ধা মোঃ আব্দুর রউফ।
[৬৫২] সাক্ষাৎকার, মুক্তিযোদ্ধা মোঃ আব্দুর রউফ।
[৬৫৩] সাক্ষাৎকার, মুক্তিযোদ্ধা মোঃ আব্দুর রউফ।
[৬৫৪] সাক্ষাৎকার, মুক্তিযোদ্ধা মোঃ গোলাম হোসেন।
[৬৫৫] সাক্ষাৎকার, মুক্তিযোদ্ধা মোঃ গোলাম হোসেন।
[৬৫৬] সাক্ষাৎকার, মুক্তিযোদ্ধা মোঃ গোলাম হোসেন।
[৬৫৭] স.ম. বাবর আলী, 'প্রাগুক্ত' পৃষ্ঠা- ২০৫।

উর্ধ্বশ্বাসে পালিয়ে যায়।[৬৫৮] আহত রশীদ, হাবলুকে নিয়ে খায়রুল বাশার বসিরহাটের বদলতলা হাসপাতালে নিয়ে যায় এবং নারায়নের লাশসহ মাস্টার শাহজান, শেখ জলিল, স.ম. বাবর আলী এবং অন্যান্য মুক্তিযোদ্ধারা টাকীতে ফিরে আসে।[৬৫৯] ইতোমধ্যে মেজর জলিল এসে উপস্থিত হন, কিন্তু কাজল ও নাজমুলের লাশের কোন খোজ মেলে না, তাছাড়া তখনও কয়েকজন মুক্তিযোদ্ধা নিখোজ থাকায় সর্বত্র শোকের ছায়া বিরাজ করতে থাকে। সাতক্ষীরার দুই যুবক শামসুদ্দোহা কাজল এবং নামজুলের চেহারা খুব সুদর্শন ছিল এবং তারা দেশ মাতৃকার জন্য নিজেদের বুকের তাজা রক্ত দিয়ে দেশের চূড়ান্ত বিজয় ছিনিয়ে এনেছে।[৬৬০] তাদের স্মৃতি কখনও ভুলার নয়। এই যুদ্ধে যোদ্ধাদের হারিয়ে মাস্টার শাহজান অনেক মুষড়ে পড়েন। নারায়ন এই যুদ্ধের অন্যতম শহীদ, যে পাইকগাছা উপজেলার হরিঢালী ইউনিয়নের উলু ডাঙ্গা রহিমপুর গ্রামের ছেলে, তাকে মুখে আগুন দিয়ে ইছামতি নদীতে ভাসিয়ে দেওয়া হয়।[৬৬১] নামজুলের লাশ ইছামতি নদীর জোয়ারের পানিতে ভেসে আসলেও শামসুদ্দোহা কাজলের আর কোন খোঁজ পাওয়া যায়নি।[৬৬২] কামরুজ্জামান, কামরুল ইসলাম খান, এনামুল হক সহ আরও কয়েক জন মিলে নাজমুলের লাশ তুলে টাউনশ্রীপুর জমিদার বাড়ির পাশে যথাযোগ্য মর্যাদায় দাফন করা হয়।[৬৬৩] এই যুদ্ধে একজন মুজাহিদ সহ ৭ জন মুক্তিযোদ্ধা শহীদ হন এবং একজন নিখোজ হন।[৬৬৪] মাস্টার শাহজান স্যারের নির্দেশ অনুযায়ী দুর্জয় সাহসিকতার সাথে যুদ্ধ করতে করতে বের হওয়ায় অনেক মুক্তিযোদ্ধার প্রাণ বেঁচে যায় তা না হলে আরও অনেক জীবনের ক্ষতি হতো।[৬৬৫] স্বাধীনতার এ মহান সৈনিক নাজমুল টাউনশ্রীপুর নদীর নিথর পরিবেশে ইছামতি নদীর তীরে চির নিদ্রায় শুয়ে আছেন।[৬৬৬]

দেবহাটা উপজেলা

৩.২২ ভাতশালা অভিযান

ইছামতি নদীর তীরে অবস্থিত ভাতশালা সাতক্ষীরা দেবহাটা উপজেলার একটি গ্রাম এবং ইছামতি নদী ভারত ও বাংলাদেশের রাষ্ট্রীয় সীমানা নির্দেশ করে কুল কুল রবে বয়ে চলে। ভাতশালার মুক্তিযুদ্ধের নীরব দর্শক ইছামতি নদী, ঠিক তেমনি লাখ লাখ শরণার্থীদের দুঃখ বেদনার সাক্ষী এই নদী। শাখরা কোমরপুর

[৬৫৮] স.ম. বাবর আলী, 'প্রাগুক্ত' পৃষ্ঠা- ২০৫।
[৬৫৯] স.ম. বাবর আলী, 'প্রাগুক্ত' পৃষ্ঠা- ২০৫।
[৬৬০] স.ম. বাবর আলী, 'প্রাগুক্ত' পৃষ্ঠা- ২০৫।
[৬৬১] মীর মুস্তাক আহমেদ রবি, 'প্রাগুক্ত' পৃষ্ঠা- ৮০।
[৬৬২] মীর মুস্তাক আহমেদ রবি, 'প্রাগুক্ত' পৃষ্ঠা- ৮০।
[৬৬৩] সাক্ষাৎকার, মুক্তিযোদ্ধা এ্যাডভোকেট ইউনুচ আলী, সাতক্ষীরা।
[৬৬৪] সাক্ষাৎকার, মুক্তিযোদ্ধা এ্যাডভোকেট ইউনুচ আলী, সাতক্ষীরা।
[৬৬৫] সাক্ষাৎকার, মুক্তিযোদ্ধা এ্যাডভোকেট ইউনুচ আলী, সাতক্ষীরা।
[৬৬৬] সাক্ষাৎকার, মুক্তিযোদ্ধা এ্যাডভোকেট ইউনুচ আলী, সাতক্ষীরা।

ইপিআরদের একটি বিওপি (বর্ডার অবজারভেশন পোস্ট) বা পর্যবেক্ষণ বসিয়ে থাকতো কিন্তু পরবর্তীকালে কমান্ডার খিজির আলীর নেতৃত্বে বিশ্বস্ত ৩০ জন মুক্তিযোদ্ধার একটি দল খানজিরা, শ্রীপুর, বসন্তপুর কয়েকটি বিওপিতে ঝটিকা আক্রমণ চালিয়ে দখল করে এবং অনেক অস্ত্র শস্ত্রও পেয়ে যায়।[৬৬৭] কিন্তু পাকিস্তানী সেনারা আবার সামরিক গুরুত্বপূর্ণ বিওপি দখল করে নেয় এবং রাজাকার পাকিস্তানী সেনাদের অত্যাচারে এই এলাকার সাধারণ লোকজনের জীবন অতিষ্ট হয়ে উঠে।[৬৬৮] তাছাড়া এসব পয়েন্ট দিয়ে মুক্তিযোদ্ধাদের আগমন ও নির্গমনে বড় সমস্যা দেখা দেয়। পাকিস্তানী সেনাদের বিতাড়িত করার জন্য মাস্টার শাহজান শাখরা কোমরপুর পাকিস্তানী সেনাঘাঁটিতে আক্রমণ করার পরিকল্পনা করেন।[৬৬৯] কিন্তু সমস্যা হল উত্তর দিকটা মুক্তিবাহিনীর নিয়ন্ত্রণে থাকলেও পাকিস্তানী হানাদারদের আক্রমণ করে নদী ছাড়া মুক্তিযোদ্ধাদের পিছু হটার আর কোন জায়গা ছিল না। বাস্তব পক্ষে এ যুদ্ধটা মুক্তিযোদ্ধাদের জন্য অনেক অবাস্তব একটি অভিযান। সময়টি তখন ভাদ্র মাস যার ফলে প্রচুর বৃষ্টিপাত হয় এবং এই ক্যাপ্টেন শাহজান মাস্টার তাঁর বাহিনীকে ৩ ভাগে ভাগ করে প্রথম ভাগের দায়িত্ব নিজেই নিলেন। যেটা ইছামতি নদীর পাড়ে ওয়াপদা রাস্তার নীচে অবস্থান করে।[৬৭০] তার সাথে অন্যান্য মুক্তিযোদ্ধা যারা যুদ্ধে অংশ নেন তারা হলেন- আব্দুর রহিম, গোপী, আব্দুল গনি, মোফাজ্জেল, আব্দুল গফফার, গোলজার, ইয়াসিন, জামশেদ, হোসেন আলী গাজী, দীন আলী গাজী, দীন আলী মল্লিক, রুহুল কুস্‌দুস, বজলুর রহমান, বাবর আলী গাজী, আবুল কাশেম এবং কমান্ডার গোলাম বারী গাজী।[৬৭১] ২য় দলে বরিশালের মুক্তিযোদ্ধারা অংশগ্রহণ করেন যারা অসীম সাহসিকতার সাথে যুদ্ধ করে। কারণ বরিশাল নবম সেক্টরের অন্তর্ভূক্ত থাকায় বরিশাল জেলার মুক্তিযোদ্ধারা সীমান্ত এলাকায় অনেক যুদ্ধে জীবনপণ যুদ্ধ করে। তেমনি ভাতশালার যুদ্ধেও বরিশাল জেলার মুক্তিযোদ্ধারা তাদের বীরত্বের সাক্ষী রাখেন। লেঃ মুখার্জীর নেতৃত্বে তৃতীয় দলে একদল বীর মুক্তিযোদ্ধা থাকে যাদেরকে উত্তর প্রান্ত থেকে ফায়ার করে এবং পুরো এলাকা তাদের নিয়ন্ত্রণে রাখার দায়িত্ব দেওয়া হয়।[৬৭২] মুক্তিযোদ্ধারা ঘলঘলিয়া মোজাহার সরদারের দোতলা বাড়ি ও ভাতশালা নীলকুঠির ঘাঁটি গড়ে তোলে, অন্যদিকে পাকিস্তানী হানাদার বাহিনী মুক্তিবাহিনীর ক্যাম্প থেকে ৫০০/৬০০ গজ দুরে উত্তর পাশে সরকারী খাদ্য গুদামে ওয়াপদার রাস্তায় বাঙ্কার বসায়।[৬৭৩] মুক্তিযোদ্ধারা দুটো দুই ইঞ্চি মর্টার, কয়েকটি এল.এম.জি, এস.এল.আর, গ্রেনেড এবং প্রচুর গোলাবরুদ সহ পূর্বের পরিকল্পনা অনুযায়ী তাদের নিজ নিজ অবস্থানে যায়।[৬৭৪] বর্ষণমুখর সন্ধ্যায় শুরু হয় মুক্তিবাহিনীর সাথে পাকিস্তানী সেনাদের তুমুল যুদ্ধ। পাকিস্তানী সেনাদের একটি শক্তিশালী প্রতিরক্ষা ব্যুহ

[৬৬৭] সাক্ষাৎকার, মুক্তিযোদ্ধা মোঃ আব্দুল করিম, গ্রাম- সখীপুর। ২৯/১২/২০১৫ সখীপুর।
[৬৬৮] সাক্ষাৎকার, মুক্তিযোদ্ধা মোঃ আব্দুল করিম, গ্রাম- সখীপুর, আরও দেখবেন- স.ম. বাবর আলী, 'প্রাগুক্ত' পৃষ্ঠা- ২৬৮।
[৬৬৯] সাক্ষাৎকার, মুক্তিযোদ্ধা মোঃ আব্দুল করিম, গ্রাম- সখীপুর।
[৬৭০] সাক্ষাৎকার, মুক্তিযোদ্ধা মোঃ আব্দুস ছাত্তার, সখীপুর।
[৬৭১] সাক্ষাৎকার, মুক্তিযোদ্ধা মোঃ আব্দুস ছাত্তার, সখীপুর।
[৬৭২] সাক্ষাৎকার, মুক্তিযোদ্ধা মোঃ আব্দুস ছাত্তার, সখীপুর।
[৬৭৩] সাক্ষাৎকার, মুক্তিযোদ্ধা শেখ গোলাম হোসেন, গ্রামঃ দক্ষিণ পারুলিয়া। ২৯/১২/২০১৫ ভাতশালা।
[৬৭৪] সাক্ষাৎকার, মুক্তিযোদ্ধা শেখ গোলাম হোসেন, গ্রামঃ দক্ষিণ পারুলিয়া।

শাঁখরা ও কোমরপুর বিওপি থাকায় পিছনে তাদের সরবরাহ লাইন খোলা এবং নিরাপদ।[৬৭৫] অপরদিকে মুক্তিবাহিনীর পিছন দিকে ভারত সীমান্ত নদী ইছামতি থাকায় সরবরাহ বা যোগাযোগ সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন, শুধুমাত্র উত্তরদিকে মুক্তিবাহিনীর নিয়ন্ত্রণে থাকায় এ অঞ্চলে মুক্তিযোদ্ধাদের একমাত্র ভরসা।[৬৭৬] যদিও ভাতশালা শাঁখরা কোমরপুর পাশাপাশি, মূল যুদ্ধ ভাতশালাতে সংঘটিত হওয়ায়, এই যুদ্ধকে ভাতশালা যুদ্ধ বলে অভিহিত করা হয়।[৬৭৭] মুষলধারে একটানা বৃষ্টির কারণে মুক্তিযোদ্ধাদের গোলাবারুদ, রসদভিজে যায়, সকল মুক্তিযোদ্ধারা একসাথে যোগ দিতে পারে না, তাছাড়া খাওয়া দাওয়া ও বিশ্রামের কোন ব্যবস্থা না থাকলেও মুক্তিযোদ্ধারা বীর বিক্রমে যুদ্ধ চালিয়ে যেতে থাকে। যুদ্ধ প্রায় দুইরাত একদিন স্থায়ী হয় এবং বৃষ্টির সাথে পাল্লা দিয়ে খানসেনারা গুলি বর্ষণ করতে থাকে, অপরদিকে মুক্তিযোদ্ধারা অসীম সাহসিকতার সাথে তাদের উপযুক্ত জবাবদিতে থাকে। যার ফলে পাকিস্তানী হানাদার বাহিনী অনুকূলে অবস্থায় থাকার পরও কোন ভাবেই সামনের দিকে অগ্রসর হবার সুযোগ পায় না। কারণ ক্যাপ্টেন শাহজান একজন কৌশলী যোদ্ধা এবং মাস্টারের দক্ষ পরিচালনায় মুক্তিবাহিনীর সকল বাঁধা-বিপত্তি মোকাবিলা করে লড়তে থাকে। যুদ্ধের দিনটা শুক্রবার হবার কারণে, পাকিস্তানী সেনারা মুক্তিবাহিনীকে ঘিরে পরাস্ত করার কৌশল অবলম্বন করে।[৬৭৮] এ জন্য পাকিস্তানী সেনারা মাইকে ঘোষণা দেয়, আজ জুম্মার নামাজের দিন, যুদ্ধ স্থগিত কর। কিন্তু এটা ঘোষণা দিয়ে তারা নিজেরাই একাধারে গুলি চালাতে থাকে।[৬৭৯] ফলে মুক্তিযোদ্ধারা পাকিস্তানী সেনারা চালাকের ফাঁদে না পড়ে জয় বাংলা স্লোগান দিয়ে প্রচন্ড আক্রমণ চালিয়ে যেতে থাকে, প্রতিকূল অবস্থায় যুদ্ধ চালিয়ে যাওয়া কঠিন হয়ে পড়ে।[৬৮০] যুদ্ধের এক পর্যায়ে ১০/১২ জন খানসেনা অতি কৌশলে হামাগুড়ি দিয়ে মুক্তিবাহিনীদের দিকে অগ্রসর হতে থাকে, তখন মুক্তিযোদ্ধারা তাদেরকে দেখে একসাথে তাদের উপর ব্যাপক গোলাবর্ষণ করায় সাথে সাথেই ৫/৬ পাকিস্তানী সেনারা গুলি খেয়ে নিহত হয় এবং আরও কয়েকজন মারাত্মক ভাবে আহত হন।[৬৮১] অন্যদিকে পাকিস্তানী হানাদার বাহিনীর একটি দল বাঁশের সাকো পার হয়ে কুরুলডাঙ্গা গ্রামে এসে মুক্তিবাহিনীকে অর্তকিতভাবে ঘিরে ফেলার চেষ্টা করে কিন্তু বীর মুক্তিযোদ্ধাদের অবিরাম আক্রমণের মুখে তাদের সব পরিকল্পনা ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়। মুক্তিযোদ্ধা গোলজার বীরদর্পে যুদ্ধ করতে থাকে, কিন্তু হঠাৎ পাকিস্তানী সেনারা গুলিতে তিনি মারাত্মক ভাবে আহত হন।[৬৮২] অস্বাভাবিক রক্তক্ষরণের ফলে একটা সময়ে তিনি মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়েন।[৬৮৩] যুদ্ধের অধিনায়ক অন্যান্য মুক্তিযোদ্ধাদের সাথে পরামর্শ করে যুদ্ধ

---

[৬৭৫] সাক্ষাৎকার, মুক্তিযোদ্ধা শেখ গোলাম হোসেন, গ্রামঃ দক্ষিণ পারুলিয়া।
[৬৭৬] সাক্ষাৎকার, মুক্তিযোদ্ধা মোঃ আব্দুর রউফ, সহকারী কমান্ডার, দেবহাটা।
[৬৭৭] সাক্ষাৎকার, মুক্তিযোদ্ধা মোঃ আব্দুর রউফ, সহকারী কমান্ডার, দেবহাটা। আরও দেখবেন- স.ম. বাবর আলী, 'প্রাগুক্ত' পৃষ্ঠা-২৬৯
[৬৭৮] সাক্ষাৎকার, মুক্তিযোদ্ধা মোঃ আব্দুর রউফ, সহকারী কমান্ডার, দেবহাটা।
[৬৭৯] সাক্ষাৎকার, মুক্তিযোদ্ধা শেখ গোলাম হোসেন, গ্রামঃ দক্ষিণ পারুলিয়া।
[৬৮০] সাক্ষাৎকার, মুক্তিযোদ্ধা শেখ গোলাম হোসেন, গ্রামঃ দক্ষিণ পারুলিয়া।
[৬৮১] সাক্ষাৎকার, মুক্তিযোদ্ধা শেখ গোলাম হোসেন, গ্রামঃ দক্ষিণ পারুলিয়া।
[৬৮২] সাক্ষাৎকার, মুক্তিযোদ্ধা মোঃ আব্দুর রউফ, সহকারী কমান্ডার, দেবহাটা।
[৬৮৩] সাক্ষাৎকার, মুক্তিযোদ্ধা মোঃ আব্দুর রউফ, সহকারী কমান্ডার, দেবহাটা।

প্রত্যাহার করে মুজিবনগরে ফিরে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নেন। অবশেষে দলের ক্যাপ্টেন শাহজান মাস্টারও যুদ্ধ প্রত্যহার করেন এবং শহীদ গোলজারের লাশ যথাযোগ্য মর্যাদায় ভারতের টাকীতে কবর দেওয়া হয়।[৬৮৪] ভাতশালায় যুদ্ধে মুক্তিযোদ্ধাদের জয়পরাজয় কোনটাই হয়নি কারণ মুক্তিযোদ্ধারা বার বার পাকিস্তানী সেনাদের ঘাঁটি দখল করার জন্য জীবনের ঝুঁকি নিয়ে যুদ্ধ করলেও সফলতা আসেনি, অন্যদিকে পাকিস্তানী হানাদার বাহিনী সুবিধাজনক অবস্থায় থেকে মুক্তিবাহিনীদের পরাস্ত করার জন্য অগ্রসর হতে গিয়ে বার বার বাঁধাগ্রস্থ হয়।[৬৮৫] তবে একথা সত্য যে, পাকিস্তানী বাহিনী মুক্তিবাহিনীর বীরত্ব ও দুঃসাহসিকতা দেখে নিঃসন্দেহে ভীত সন্ত্রস্ত হয়ে পড়ে। ভাতশালার যুদ্ধ এখনও ইতিহাসের পাতায় অমর হয়ে আছে।

দেবহাটা উপজেলা

৩.২৩ দেবহাটা উপজেলা দখল

যুদ্ধের দিনটা ১৫ নভেম্বর ১৯৭১।[৬৮৬] দলনেতা হলেন নৌ কমান্ডো খলিলুর রহমান, উপদল নেতা শেখ মোকাররম আলী।[৬৮৭] ১০/১২ জন নৌ কমান্ডো অংশগ্রহন করেন।[৬৮৮] ২০০ জন স্থলবাহিনীর মুক্তিযোদ্ধা দেবহাটা উপজেলা দখলে অংশগ্রহন করেন।[৬৮৯] বীর মুক্তিযোদ্ধারা অতর্কিত আক্রমণ শুরু করলে পাকিস্তানী হানাদার বাহিনী এবং রাকাজাররা গুলি ছুড়তে ছুড়তে উপজেলা ছেড়ে পালিয়ে যায়। প্রায় ৩০ মিনিট স্থায়ী এই যুদ্ধে পাকিস্তানী হানাদার বাহিনী এবং রাজাকাররা তাদের গুলির রসদ ফুরিয়ে ফেলে।[৬৯০] তখন তারা গুলি ছুড়তে ছুড়তে পারুলিয়া রাজাকার ক্যাম্পে চলে যায়।[৬৯১] দেবহাটা উপজেলা মুক্তিবাহিনীর দখলে চলে যায়। সেখান থেকে তারা অকেজো কিছু পাকিস্তানী বাহিনীর অস্ত্র উদ্ধার করে।[৬৯২] দেবহাটা উপজেলা দখল করার পর মুক্তিবাহিনীর সদস্যরা সেখান থেকে চলে যায়।[৬৯৩]

---

[৬৮৪] সাক্ষাৎকার, মুক্তিযোদ্ধা মোঃ আব্দুল করিম, গ্রাম- সখীপুর।
[৬৮৫] সাক্ষাৎকার, মুক্তিযোদ্ধা মোঃ আব্দুল করিম, গ্রাম- সখীপুর।
[৬৮৬] সাক্ষাৎকার, মুক্তিযোদ্ধা মোঃ ইয়াছিন আলী। ২৬/১২/২০১৬ দেবহাটা।
[৬৮৭] সাক্ষাৎকার, মুক্তিযোদ্ধা মোঃ ইয়াছিন আলী। আরও দেখবেন- কমান্ডো, মোঃ খলিলুর রহমান, মুক্তিযুদ্ধে নৌঅভিযান, পৃষ্ঠা- ১৬২।
[৬৮৮] সাক্ষাৎকার, মুক্তিযোদ্ধা মোঃ ইয়াছিন আলী।
[৬৮৯] সাক্ষাৎকার, মুক্তিযোদ্ধা মোঃ আব্দুর রউফ, সহকারী কমান্ডার, দেবহাটা।
[৬৯০] সাক্ষাৎকার, মুক্তিযোদ্ধা মোঃ আব্দুর রউফ, সহকারী কমান্ডার, দেবহাটা।
[৬৯১] সাক্ষাৎকার, মুক্তিযোদ্ধা মোঃ আব্দুল করিম, গ্রাম- সখীপুর। ২৬/১২/২০১৬ দেবহাটা।
[৬৯২] সাক্ষাৎকার, মুক্তিযোদ্ধা মোঃ আব্দুল করিম, গ্রাম- সখীপুর। আরও দেখবেন- কমান্ডো, মোঃ খলিলুর রহমান, মুক্তিযুদ্ধে নৌঅভিযান, পৃষ্ঠা- ১৬৩।
[৬৯৩] সাক্ষাৎকার, মুক্তিযোদ্ধা মোঃ গোলাম হোসেন।

কালীগঞ্জ উপজেলা

৩.২৪ কালীগঞ্জ ঝটিকা অভিযান

সামরিক ও ভৌগলিক দিক দিয়ে খুব গুরুত্বপূর্ণ কালীগঞ্জ উপজেলা ইছামতি ও কালীগঞ্জ নদীর ত্রি-মোহনায় অবস্থিত। ভারত সীমান্তের কাছাকাছি অবস্থিত হওয়ায় মুক্তিযোদ্ধাদের বাংলাদেশে প্রবেশ ও বাহির হবার অন্যতম পথ।[৬৯৪] পাকিস্তানী হানাদার বাহিনী, রাজাকার ও মিলিশিয়ারা কালীগঞ্জ উপজেলা সদরে ৩টি শক্তিশালী ঘাঁটি গড়ে তোলে।[৬৯৫] প্রথম ঘাঁটি উপজেলা ও ডাকবাংলা, দ্বিতীয় পক্ষ ঘাঁটি গফফার চেয়ারম্যানের বাড়ি এবং তৃতীয় ঘাঁটি বিশিষ্ট ধনী ব্যবসায়ী করিম গাইনের বাড়ি।[৬৯৬] এসব বাড়ীর ছাদের উপর বালির বস্তা দিয়ে প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা সুদৃঢ় এবং নীচের চারিদিকে ট্রেঞ্চ আর বাঙ্কার।[৬৯৭] যার ফলে কালীগঞ্জ সদর থেকে মিলিটারী ও রাজাকারদের বিতাড়িত না করা পর্যন্ত ভারতীয় বিভিন্ন ক্যাম্প থেকে অস্ত্র, গোলাবারুদ রসদ প্রভৃতি আনা নেয়া কঠিন হয়ে পড়ে।[৬৯৮] তাছাড়া ইছামতি নদী পাড়ে কালীগঞ্জ উপজেলার অবস্থান এবং ইছামতি ভারত বাংলাদেশের সীমান্ত নদী হওয়ায় যখনই মুক্তিযোদ্ধারা ভারতের পাড় থেকে নৌকা যোগে কোথাও যেতে নদীপথ ব্যবহার করত তখনই পাকিস্তানী সেনাদের বাইনোকুলার যন্ত্রে খুব সহজে তা ধরা পড়ত।[৬৯৯] সুতরাং কালীগঞ্জ উপজেলা মুক্ত করা সম্ভব হলে পাকিস্তানী হানাদার বাহিনী কালীগঞ্জ নদী পার হয়ে দক্ষিণ দিকে যেতে পারবে না, যার ফলে কালীগঞ্জ থেকে সুদূর দক্ষিণ অঞ্চল পর্যন্ত মুক্তিবাহিনীর দখলে নিতে পারবে।[৭০০] সুতরাং নবম সেক্টরের মুক্তিযোদ্ধারা আলাপ আলোচনা করে কালীগঞ্জ থেকে পাকিস্তানী সেনাদের বিতাড়িত করার পরিকল্পনা করে। কিন্তু পাকিস্তানী সেনাদের প্রতিরক্ষা ব্যুহতে আক্রমণ করা অত্যন্ত কঠিন ও দুঃসাহসিক ব্যাপার। কালীগঞ্জ উপজেলাতে পাকিস্তানী হানাদার বাহিনী ও রাজাকার অত্যন্ত বেপরোয়া হয়ে উঠে এবং রাজাকারদের অত্যাচার স্পর্ধা সীমাহীনভাবে বৃদ্ধি পায়।[৭০১] স্বাধীনতার পক্ষে লোকজনের বাড়িতে হামলা করে লুটপাট করে নেয়, বাড়িতে নারী-পুরুষদের উপর অমানুষিক নির্যাতন চালায় এবং সবশেষে আগুন দিয়ে পুড়িয়ে সবকিছু ভস্মিভূত করে দেয়।[৭০২] মোট কথা এলাকার নিরীহ মানুষেরা খানসেনাদের হাতে জিম্মি এবং তাদের সাথে যোগদেয় কিছু বাঙালী পা-চাটা কুকুর। এসব অত্যাচার নির্যাতন মুক্তিযোদ্ধাদের মর্যাদা ও শৌর্য্যবীর্যের উপর এক প্রচন্ড আঘাত আনে, ফলে ক্যাপ্টেন হুদা, লেঃ বেগ, ওয়াহিদ, নাজিরসহ আরও কয়েকজন মুক্তিযোদ্ধা মিলে যুদ্ধ শিবিরে বৈঠক সহ, বিভিন্ন গোপন রিপোর্ট

---

[৬৯৪] মীর মুস্তাক আহমেদ রবি, 'চেতনায় একাত্তর' পৃষ্ঠা- ২৭৪।
[৬৯৫] সাক্ষাৎকার, মুক্তিযোদ্ধা এস.এম. শাহাদাৎ হোসেন। ২২/১১/২০১৪ কালীগঞ্জ।
[৬৯৬] সাক্ষাৎকার, মুক্তিযোদ্ধা এস.এম. শাহাদাৎ হোসেন।
[৬৯৭] সাক্ষাৎকার, মুক্তিযোদ্ধা এস.এম. শাহাদাৎ হোসেন। আরও দেখবেন- স.ম. বাবর আলী, "*স্বাধীনতার দুর্জয় অভিয়ান*",পৃষ্ঠা- ২২৫।
[৬৯৮] সাক্ষাৎকার, মুক্তিযোদ্ধা এস.এম. শাহাদাৎ হোসেন।
[৬৯৯] সাক্ষাৎকার, মুক্তিযোদ্ধা এস.এম. শাহাদাৎ হোসেন।
[৭০০] সাক্ষাৎকার, মুক্তিযোদ্ধা এস.এম. শাহাদাৎ হোসেন।
[৭০১] সাক্ষাৎকার, মুক্তিযোদ্ধা এস.এম. শাহাদাৎ হোসেন।
[৭০২] সাক্ষাৎকার, মুক্তিযোদ্ধা এস.এম. শাহাদাৎ হোসেন। আরও দেখবেন- স.ম. বাবর আলী, "*স্বাধীনতার দুর্জয় অভিয়ান*",পৃষ্ঠা- ২২৫।

পর্যালোচনা করে।[৭০৩] ক্যাপ্টেন হুদা, লেঃ বেগ, ওয়াহিদ, আনিস সহ উপস্থিত মুক্তিযোদ্ধারা পাকিস্তানী সেনাদের উপর গেরিলা কায়দায় 'হিট এ্যান্ড রান' অর্থাৎ আঘাত করেই পালাতে হবে এমন কায়দায় আক্রমণ করার সিদ্ধান্ত নেয়।[৭০৪] কারণ পাকিস্তানী হানাদার , রাজাকার, মিলিশিয়াদেরকে আর কোন ভাবেই কালীগঞ্জে অবস্থান করতে দিতে চায় না মুক্তিযোদ্ধারা। রাত ৯টার দিকে মুক্তিযোদ্ধারা হাতিয়ার নিয়ে প্রস্তুত হয়ে কমান্ডার ক্যাপ্টেন হুদার নিকটে রিপোর্ট করে।[৭০৫] অধিনায়ক ক্যাপ্টেন হুদা মুক্তিযোদ্ধাদের চারটি দলে বিভক্ত করে নিজেই ৩০/৩৫ জনের একটি দলের নেতৃত্ব দেবেন যারা উপজেলা ও ডাকবাংলা পাকিস্তানী হানাদার ক্যাম্পে আক্রমণ চালাবে বলে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়।[৭০৬] দ্বিতীয় দলে ১৫/২০ জন মুক্তিযোদ্ধা রাখা হয় যারা আকবর ও আশরাফুলের নেতৃত্বে গফফার চেয়ারম্যানের বাড়ির পাকিস্তানী সেনাদের ক্যাম্পে হামলা চালাবে।[৭০৭] লেঃ বেগের নেতৃত্বে তৃতীয় দলটি করিম গাইনের বাড়িতে অবস্থিত ক্যাম্প আক্রমণ চালাবে এবং তার সহযোগী হিসাবে মোকাররম ও ইপিআর সোবহানসহ ৩০ জন মুক্তিযোদ্ধা থাকবে।[৭০৮] ওদিকে ওয়াহিদুজ্জামানের নেতৃত্বে ৪০ জন নিয়ে গঠিত চতুর্থ দলের দায়িত্ব কালীগঞ্জ সি এন্ড বি রোড পাহারা দেয় এবং সাদপুর ব্রিজ উড়িয়ে দেয়া এবং শেখ নাসিরের নেতৃত্বে ৭ জন মুক্তিফৌজের পঞ্চম দলটি পাউখালি ব্রিজ ও রাস্তা পাহারা দেবার দায়িত্ব দেওয়া হয়।[৭০৯] এলাকাটি পাকিস্তানী সেনাদের অনুকূলে থাকায় অধিনায়ক মাত্র ৩০/৩৫ মিনিটের মধ্যে এই দুঃসাহসিক অভিযানটি শেষ করার নির্দেশ দেয়।[৭১০] মোট কথা কম সময় কিভাবে যুদ্ধ করে মুক্তিবাহিনীদের যাতে ক্ষয়ক্ষতির ঝুঁকি না থাকে এ ব্যাপারে পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়। অধিকাংশ মুক্তিযোদ্ধারা এখানকার স্থায়ী বাসিন্দা তাই এই এলাকার রাস্তা-ঘাট, ঘর-বাড়ি সবই তাদের পরিচিত। ক্যাপ্টেন হুদা প্রথম ফায়ার উদ্বোধন করবে বলে সিদ্ধান্ত নেয়া হয়।[৭১১] উকশা এলাকা মুক্ত থাকায় সবাই নিরাপদে উকশা সীমান্ত পার হয় কারণ সুবেদার লস্করের নেতৃত্বে মুক্তিযোদ্ধাদের শক্তিশারী ঘাঁটির মাধ্যমে উকশা এলাকা সবসময় মুক্ত রাখা হয়।[৭১২] এটি বাংলাদেশের ভিতর মুক্তিযোদ্ধাদের যাতায়াত ও অস্ত্রশস্ত্র পাঠানোর একটি নিরাপদ স্থান। পাকিস্তানী বাহিনীর ধারণা কালীগঞ্জ উপজেলা সদরের ক্যাম্প হামলা করার মত সাহস মুক্তিযোদ্ধাদের নেই তাই সব ক্যাম্পের সেন্ট্রিরা ঘুমাতে থাকে। রাত প্রায় ১১ টার দিকে পদব্রজে এসে সুনির্দিষ্ট সময়ে সকল গ্রুপ কমান্ডার তাদের বাহিনী নিয়ে সুবিধাজনক জায়গায় অবস্থান নেয়।[৭১৩] এমন

---

[৭০৩] সাক্ষাৎকার, মুক্তিযোদ্ধা এস.এম. শাহাদাৎ হোসেন।
[৭০৪] সাক্ষাৎকার, মুক্তিযোদ্ধা এস.এম. শাহাদাৎ হোসেন।
[৭০৫] সাক্ষাৎকার, মুক্তিযোদ্ধা এস.এম. শাহাদাৎ হোসেন।
[৭০৬] সাক্ষাৎকার, মুক্তিযোদ্ধা এস.এম. শাহাদাৎ হোসেন।
[৭০৭] সাক্ষাৎকার, মুক্তিযোদ্ধা এস.এম. শাহাদাৎ হোসেন।
[৭০৮] সাক্ষাৎকার, মুক্তিযোদ্ধা এস.এম. শাহাদাৎ হোসেন।
[৭০৯] মেজর রফিকুল ইসলাম (অবঃ), "*দক্ষিণ পশ্চিম রণাঙ্গন*", সুচয়নী পাবলিশার্স, ঢাকা, পৃষ্ঠা- ১০১।
[৭১০] মেজর রফিকুল ইসলাম (অবঃ), ঐ।
[৭১১] স.ম. বাবর আলী, 'প্রাগুক্ত' পৃষ্ঠা- ১০১।
[৭১২] ঐ।
[৭১৩] ঐ।

সময় তুমুল বৃষ্টি হতে থাকে এবং এই সুযোগে পূর্ব নির্ধারিত সংকেত ও সময় অনুযায়ী তিন গ্রুপ একই সাথে ফায়ার ওপেন করে এবং কালীগঞ্জ উপজেলা গুলি বর্ষনের মাধ্যমে মুক্তিযোদ্ধারা খানসেনাদের বুঝিয়ে দেয়, মুক্তিযোদ্ধারা কত দুঃসাহসী, বেপরোয়া এবং বাংলাদেশের যেকোন সুরক্ষিত মিলিটারী অবস্থানে তাদের গতি অবারিত।[৭১৪] রাতের অন্ধকারে মুক্তিযোদ্ধাদের আক্রমণে খানসেনাদের ক্যাম্প ধ্বংস হয়ে যায় এবং চারিদিকে তাদের আর্তচিৎকার শোনা যায়। মুক্তিযোদ্ধাদের হঠাৎ এ আক্রমণে খানসেনারা সাময়িকভাবে বিহবল থাকায় প্রথম দিকে আক্রমণের জবাব দিতে দেরি করে। মুক্তিবাহিনীর জোয়ানরা মনের সাধ মিটিয়ে গুলিবর্ষণ করার পর পাকসেনা, রাজাকার আর মিলিশিয়াদের গুলি করা শুরু হয়।[৭১৫] পূর্ব পরিকল্পনা অনুযায়ী সব মুক্তিযোদ্ধাদের দল ৩৫ মিনিট ধরে শ্রাবণের বৃষ্টির ধারার মতো গুলি করার পর অধিনায়কের সংকেত অনুসারে নিরাপদে যুদ্ধ প্রত্যাহার করে।[৭১৬] তারপর উকশা ক্যাম্পে ফিরে এসে কিছুক্ষণ বিশ্রাম নিয়ে ইছামতি নদী পার হয়ে মুক্তিবাহিনী ঘাঁটিতে ফিরে আসে।[৭১৭] যুদ্ধটা শেষ করে মুক্তিযোদ্ধারা দারুন উচ্ছাসিত কারণ মুক্তিবাহিনীর কেউ আহত বা নিহত হয়নি অন্যদিকে পাকিস্তানী সেনাদের অনেকে মারাত্মকভাবে আহত ও ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতির সম্মুখীন হয়।

কালীগঞ্জ উপজেলা

৩.২৫ পারুলিয়া ব্রিজ অপারেশন

পারুলিয়া, সাতক্ষীরা ও কালীগঞ্জ রাস্তার মধ্যবর্তী স্থানে অবস্থিত একটি গ্রাম ও বাজার এবং পূর্ব-পশ্চিমে লম্বা একটি বেশ বড় খাল পারুলিয়ার বুক চিরে প্রবাহিত। সাতক্ষীরা ও কালীগঞ্জ মহাসড়কের উপর পারুলিয়া গ্রামে ১৫০ ফুট দীর্ঘ একটি কাঠের ব্রিজ অবস্থিত এবং সাতক্ষীরা ও কালীগঞ্জের একমাত্র যোগসূত্র ব্রিজটি হওয়ায় এটি খুব গুরুত্বপূর্ণ।[৭১৮] ভারত সীমান্ত থেকে পারুলিয়া গ্রামের দুরুত্ব ৫ কিলোমিটার, অন্যদিকে সাতক্ষীরা সদর এবং কালীগঞ্জ উভয় স্থান থেকে পারুলিয়ার দূরত্ব যথাক্রমে ১৫ কিলোমিটার।[৭১৯] পারুলিয়ার সোজা পশ্চিম দিকে ভারতের টাকী এবং বাগুন্ডি মুক্তিযোদ্ধা ক্যাম্প অবস্থিত। বাগুন্ডি ক্যাম্পের উত্তর পাশ দিয়ে ইছামতি নদী পূর্বদিকে প্রবাহিত হয়ে শাখরা এবং ভাতশালা গ্রামের পশ্চিম পাশে পৌছে বাঁক নিয়ে সোজা দক্ষিণ দিকে হাসনাবাদ, হিঙ্গলগঞ্জ, কৈখালী হয়ে রায়মঙ্গল নদীতে গিয়ে মিশেছে।[৭২০] এদিকে

---

[৭১৪] ঐ।
[৭১৫] ঐ।
[৭১৬] ঐ।
[৭১৭] ঐ।
[৭১৮] কমান্ডো মোঃ খলিলুর রহমান, মুক্তিযুদ্ধে নৌ-অভিযান। পৃষ্ঠা- ১৪৯।
[৭১৯] সাক্ষাৎকার, মুক্তিযোদ্ধা মোঃ ইয়াছিন আলী।
[৭২০] সাক্ষাৎকার, মুক্তিযোদ্ধা মোঃ ইয়াছিন আলী।

সাতক্ষীরায় ২১ পাঞ্জাবের সদর দপ্তর। পারুলিয়া ছাড়াও পাকিস্তানী সেনারা আলীপুর শাখরা, শ্রীপুর, দেবহাটা, কালীগঞ্জ ও শ্যামনগরে তাদের ক্যাম্প গড়ে তোলে। তাছাড়া সীমান্ত এলাকা হওয়ায় পাকিস্তানী সেনারা এখানে তাদের অবস্থান আরও সুদৃঢ় করার চেষ্টা করে, যার ফলে নিয়মিত সৈন্যের সাথে রেঞ্জার্স ও রাজাকার নিয়োজিত করা হয়।[৭২১] এ এলাকাটি ৯ নং সেক্টরের অধীন টাকী সাব-সেক্টরের নিয়ন্ত্রণাধীন এবং ক্যাপ্টেন শাহজাহান আলী এই সাব-সেক্টরের কমান্ডার ছিলেন।[৭২২] ভারত সীমান্তে কাছাকাছি হওয়ায় মুক্তিবাহিনী টাকী ও বাগুন্ডি ক্যাম্প থেকে পাকিস্তানী সেনাদের উপর আক্রমণ পরিচালনা করে।[৭২৩] সাতক্ষীরা জেলার দক্ষিণাঞ্চলে অনেক পাকিস্তানী বাহিনীর ঘাঁটি থাকায় এসব ঘাঁটির সৈন্যদের রসদ এবং রেশনসামগ্রী পরিবহনের জন্য পারুলিয়া ব্রিজের এই সড়ক পথের উপর নির্ভর করতে হয়। যার ফলে পাকিস্তানী হানাদার বাহিনীর জন্য পারুলিয়া ব্রিজটির গুরুত্ব অপরিসীম এবং সেজন্য সাতক্ষীরা সদর থেকে কালীগঞ্জ, দেবহাটা ও শ্যামনগর উপজেলা পুরোপুরি বিচ্ছিন্ন করার জন্য মুক্তিবাহিনী এই ব্রিজটি ধ্বংস করে দেবার পরিকল্পনা করে।[৭২৪] অন্যদিকে পাকিস্তানী হানাদার বাহিনী ব্রিজটি রক্ষার জন্য সর্বপ্রকার ব্যবস্থা গ্রহণ করে এবং রাজাকারদের দায়িত্বে দিনরাত ২৪ ঘন্টা এই ব্রিজ পাহারায় রাখে।[৭২৫] সেপ্টেম্বর মাসের আগে ভারতীয় ন্যাশনাল ক্যাডেট কোরের দুজন বিস্ফোরক বিশেষজ্ঞ মিঃ মন্ডল, মিঃ মুখার্জি, মোশাররফ হোসেন মিশু, স.ম. বাবর আলী সহ ১১ জন পারুলিয়া ব্রিজ ধ্বংস করার পরিকল্পনা করেন।[৭২৬] অন্যান্য মুক্তিযোদ্ধারা হলেন- বটিয়াঘাটার আফজাল, বরিশালের আনোয়ার, পারুলিয়ার জামশেদ, আবুল মাবুদ, মোফাজ্জেল, ইউনুস আলী (এ্যাড.), কিন্তু পারুলিয়া বাজারে পুলিশ ক্যাম্প বসিয়েছে এ খবর শুনে মুক্তিযোদ্ধারা ব্রিজ অপারেশন করার পূর্বে পুলিশ ক্যাম্প অপারেশন করার পরিকল্পনা করে।[৭২৭] পূর্ব পরিকল্পনা অনুযায়ী আফজাল ও আনোয়ার ৪/৫ জন মুক্তিযোদ্ধাসহ সরাসরি পুলিশ ক্যাম্প আক্রমণ করে তাদেরকে আত্মসমর্পন করার নির্দেশ প্রদান করে।[৭২৮] পুলিশেরা খুব ভীত সন্ত্রস্ত হয়ে ৬টা রাইফেল আর সব গুলিসহ আত্মসমর্পন করে এবং তারপর মুক্তিযোদ্ধারা তাদেরকে বেধে রেখে পারুলিয়া ব্রীজে মাইন ও বিস্ফোরক লাগানোর কাজ শুরু করে। কিন্তু ব্রিজের সামান্য ক্ষতিকরা সম্ভব হলেও পুরোপুরি ধ্বংস করা সম্ভব হয়নি। আরও দুবার দুটি দল ব্রিজ ধ্বংস করার চেষ্টার পরও ব্রিজ চলাচলের উপযোগী থেকে যায়।[৭২৯] এদিকে ব্রিজ প্রচন্ড শব্দে বিস্ফোরণ ঘটার ফলে পারুলিয়া হাসি বাসারাত উল্লাহ সাহেবের বাড়ির ধারে সরকারি গুদাম অবস্থিতি পাকিস্তানী সেনাদের ক্যাম্প

[৭২১] সাক্ষাৎকার, মুক্তিযোদ্ধা মোঃ আব্দুর রউফ, সহকারী কমান্ডার, দেবহাটা। ২৯/১১/২০১৫ পারুলিয়া।
[৭২২] সাক্ষাৎকার, মুক্তিযোদ্ধা মোঃ আব্দুর রউফ, সহকারী কমান্ডার, দেবহাটা।
[৭২৩] সাক্ষাৎকার, মুক্তিযোদ্ধা মোঃ আব্দুর রউফ, সহকারী কমান্ডার, দেবহাটা।
[৭২৪] সাক্ষাৎকার, মুক্তিযোদ্ধা মোঃ গোলাম হোসেন, দক্ষিণ পারুলিয়া।
[৭২৫] সাক্ষাৎকার, মুক্তিযোদ্ধা মোঃ গোলাম হোসেন, দক্ষিণ পারুলিয়া। ২৯/১১/২০১৫ পারুলিয়া।
[৭২৬] সাক্ষাৎকার, মুক্তিযোদ্ধা মোঃ আব্দুল করিম, গ্রাম- সখীপুর।
[৭২৭] সাক্ষাৎকার, মুক্তিযোদ্ধা মোঃ আব্দুল করিম, গ্রাম- সখীপুর। ২৯/১১/২০১৫ পারুলিয়া।
[৭২৮] সাক্ষাৎকার, মুক্তিযোদ্ধা মোঃ আব্দুল করিম, গ্রাম- সখীপুর।
[৭২৯] সাক্ষাৎকার, মুক্তিযোদ্ধা মোঃ আব্দুর রউফ, সহকারী কমান্ডার, দেবহাটা।

থেকে সারারাত গোলাবর্ষণ করে।[৭৩০] যশোহর জেলার ফজলুর রহমান নামক একজন দুঃসাহসিক মুক্তিযোদ্ধা পারুলিয়া ব্রিজ ধ্বংস করার চেষ্টা করেন।[৭৩১] তার পরিকল্পনা খুব কৌশলপূর্ণ এবং তিনি তার সাথে কয়েকজন মুক্তিযোদ্ধাকে নিয়ে পারুলিয়া ব্রিজের কয়েকশত গজ দুরে একটা বড় ধরনের খড়ের গাদার উপর বিস্ফোরক রেখে দড়ির মাধ্যমে সেটাকে ব্রিজের কাছাকাছি নেন। তিনি নিজে আর একটা মাঝারী ধরনের খড়ের গাদা পানিতে ভাসিয়ে তার নীচে আত্মগোপন করে ঐ বিস্ফোরকের নিকট উপস্থিত হন এবং ব্রিজ বিস্ফোরক স্থাপন করে ফিরে এসে তাতে আগুন লাগিয়ে দেন। বিস্ফোরণ হবার পরও ব্রিজের খুব বেশি ক্ষতি হয়নি। শুধুমাত্র কয়েকজন পাহারারত রাজাকার আহত হয় এবং সাতক্ষীরা মুসলিমলীগের গফুর সাহেবের ছেলে সিরাজ একটা পা হারায়।[৭৩২] ২০ সেপ্টেম্বর মেজর জলিল পুনরায় লেঃ মাহফুজ আলম বেগকে উক্ত ব্রিজ ধ্বংস করার জন্য একটি বড় গ্রুপ প্রস্তুত করার নির্দেশ দেন এবং এই দলে ৩ জন নৌ কমান্ডোকে অন্তর্ভুক্ত করা হয় যারা বিস্ফোরক ব্যবহারে পারদর্শী এবং তারা হলেন- ইমাম বারী, ইমদাদুল হক ও খলিলুর রহমান।[৭৩৩] সেপ্টেম্বর ২০ তারিখ সন্ধ্যার পর প্রবল ঝড়-বৃষ্টির মাঝে বেগ সাহেবের নেতৃত্বে ৫০ জন মুক্তিযোদ্ধার দল টাকী ক্যাম্প থেকে নৌকায় ইছামতি নদী অতিক্রম করে বিপরীত পাড়ে চর শ্রীপুর নামক গ্রামের উত্তর পাশদিয়ে ঘলঘলিয়া গ্রামের মধ্যদিয়ে রত্নেশ্বরপুর অতিক্রম করে বিল পাড়ি দিয়ে সখিপুর গ্রামের দক্ষিণ প্রান্তে এসে পৌছান।[৭৩৪] মুক্তিযোদ্ধা আবুল কাশেম ও জহুরুল হক পথ নির্দেশনা দেন। তারা ১২টার দিকে সম্পূর্ণ দলটি সখিপুর গ্রামের উত্তর প্রান্তে পৌছে ব্রিজের দক্ষিণাংশে দুপাশে দুটি গ্রুপ নিয়ে অবস্থান গ্রহণ করেন।[৭৩৫] নদীর ভাটার জন্য অপেক্ষা করেন এবং রাত ১টায় ভাটা শুরু হলে লেঃ বেগ নদীতে বৃহদাকার একটি খড়ের বোঝা ফেলে সেটিকে আড়াল করে পারুলিয়া ব্রিজে পৌছেন।[৭৩৬] নৌ-কমান্ডো ৩ জন ও লেঃ বেগ এক্সপ্লোসিভ নিয়ে ব্রিজে পৌছে তড়িৎ বেগে কোমর থেকে খুলে ৩টি খুঁটি ও ব্রিজের এক পাশের গার্ডারে স্থাপন করে সর্দপানে সাঁতরে পশ্চিম দিকে চলে যান।[৭৩৭] মুক্তিযোদ্ধার একটি দল খেজুর বাড়িয়া গ্রামে অপেক্ষা করতে থাকে।[৭৩৮] তাদের কাছে পৌছে সংকেত দেবার পর অপর দলটিও সখিপুরের পালপাড়ার অবস্থান ত্যাগ করে পিছনে গিয়ে সখিপুর গ্রামের দক্ষিণাংশে নির্দেশিত স্থানে একত্রিত হন এবং রাত ২টার সময় ভারত যাবার উদ্দেশ্যে সবাই ফিরে চলেন। এসময় প্রচন্ড শব্দে এক্সপ্লোসিভ বিস্ফোরিত হয় এবং সাথে সাথে পারুলিয়া ব্রিজের মাঝখান

[৭৩০] সাক্ষাৎকার, মুক্তিযোদ্ধা মোঃ আব্দুর রউফ, সহকারী কমান্ডার, দেবহাটা।
[৭৩১] সাক্ষাৎকার, মুক্তিযোদ্ধা মোঃ আব্দুর রউফ, সহকারী কমান্ডার, দেবহাটা।
[৭৩২] সাক্ষাৎকার, মুক্তিযোদ্ধা মোঃ গোলাম হোসেন, দক্ষিণ পারুলিয়া।
[৭৩৩] সাক্ষাৎকার, মুক্তিযোদ্ধা মোঃ গোলাম হোসেন, দক্ষিণ পারুলিয়া।
[৭৩৪] সাক্ষাৎকার, মুক্তিযোদ্ধা মোঃ গোলাম হোসেন, দক্ষিণ পারুলিয়া।
[৭৩৫] সাক্ষাৎকার, মুক্তিযোদ্ধা মোঃ আব্দুল করিম, গ্রাম- সখীপুর।
[৭৩৬] সাক্ষাৎকার, মুক্তিযোদ্ধা মোঃ আব্দুল করিম, গ্রাম- সখীপুর।
[৭৩৭] সাক্ষাৎকার, মুক্তিযোদ্ধা মোঃ আব্দুল করিম, গ্রাম- সখীপুর।
[৭৩৮] সাক্ষাৎকার, মুক্তিযোদ্ধা মোঃ আব্দুল করিম, গ্রাম- সখীপুর।

থেকে দু টুকরো হয়ে ব্রিজ নদীতে ঝুলে পড়ে।[৭৩৯] সাতক্ষীরার পারুলিয়া ব্রিজ ধ্বংসের ফলে পাকিস্তানী সেনারা আরও ক্ষিপ্ত ও সজাগ হয়ে যায়। যদিও পাকিস্তানী হানাদার বাহিনী।[৭৪০] পরবর্তীকালে আবার মেরামত করে চলাচলের উপযোগী করে তারপরও মুক্তিবাহিনীর আক্রমণের জন্য পাকিস্তানী সেনারা সব সময়ই ভীত সন্ত্রস্ত থাকতো। আবার কোন সময় মুক্তিবাহিনী এই ব্রিজ উড়িয়ে দেয়।[৭৪১]

কালীগঞ্জ উপজেলা

৩.২৬ কুলিয়া ব্রিজের যুদ্ধ

২০ নভেম্বর মুক্তিবাহিনীর প্রচন্ড আক্রমণে সাতক্ষীরা জেলার দক্ষিণ অংশের উপজেলা কালীগঞ্জে অবস্থানকারী পাকিস্তানী বাহিনীর দূর্গের পতন ঘটে, যার ফলে পাকিস্তান সেনাবাহিনীর ২১ পাঞ্জাব রেজিমেন্ট এবং রেঞ্জার্স ও রাজাকাররা কালীগঞ্জ ছেড়ে কুলিয়া ব্রিজের মুখে এসে অবস্থান নেয়।[৭৪২] পাকিস্তানী সেনাদের সুরক্ষিত দূর্গের অবস্থান কুলিয়া ব্রিজ থেকে ৩ কিলোমিটার পেছনে এবং এখানে তাদের একটি ১২০ মিলিমিটার কামান থেকে সীমান্তসহ বিস্তীর্ণ এলাকায় আর্টিলারি সাপোর্ট প্রদান করা হয়।[৭৪৩] ২১ পাঞ্জাব কালীগঞ্জ ছেড়ে আসার সময় পারুলিয়া ব্রিজটি ডিনামাইট দিয়ে উড়িয়ে দেয়।[৭৪৪] সাবসেক্টর কমান্ডার ক্যাপ্টেন শাহজাহান আলী ও ক্যাপ্টেন নুরুল হুদার নেতৃত্বে মুক্তিবাহিনীর ৬টি কোম্পানী ২২ নভেম্বর ভোর ৫ টায় পাকিস্তানি হানাদারবাহিনীর উপর আক্রমণ করার পরিকল্পনা করেন।[৭৪৫] ক্যাপ্টেন শাহাজাহান আলীর অধীনে যুদ্ধরত কয়েকজন নৌ-কমান্ডো হলেন- ইমাম বারী, জবেদ আলী, ইমদাদুল হক, এবাদুল হক, মুজিবর রহমান, আমজাদ আলী সহ ১০-১২ জন।[৭৪৬] ক্যাপ্টেন শাহজাহান ২০ নভেম্বর এই নৌ-কামান্ডারদের দ্বারা কুলিয়া ব্রিজটি ধ্বংস করার পরিকল্পনা করেন এবং এবং সে অনুযায়ী ২০ নভেম্বর রাতে দলনেতা ইমাম বারীর নেতৃত্বে ১০ জন কমান্ডো কুলিয়ার ১ কিলোমিটার আগে বালিয়াডাঙ্গা গ্রাম থেকে মাইন ও ফিনস ডেগারসহ পানিতে নেমে সাঁতরিয়ে ব্রিজের দিকে এগিয়ে যেতে থাকে।[৭৪৭] কিন্তু ছোট নদীতে পানির স্রোত কম হওয়ায় কমান্ডো দল সাঁতরে ব্রিজের ১০০ গজের মধ্যে আসলে বাঁধার মুখোমুখি হয় কারণ মুক্তিবাহিনীর হাত থেকে ব্রিজ রক্ষা করার জন্য এখানে স্থানীয়ভাবে নির্মিত মাছ আটকানোর জন্য পাটা (বেড়া) দিয়ে নদীর এপার থেকে ওপার

[৭৩৯] সাক্ষাৎকার, মুক্তিযোদ্ধা মোঃ গোলাম হোসেন, দক্ষিণ পারুলিয়া।
[৭৪০] সাক্ষাৎকার, মুক্তিযোদ্ধা মোঃ গোলাম হোসেন, দক্ষিণ পারুলিয়া।
[৭৪১] সাক্ষাৎকার, মুক্তিযোদ্ধা মোঃ গোলাম হোসেন, দক্ষিণ পারুলিয়া।
[৭৪২] কমান্ডো মোঃ খলিলুর রহমান, মুক্তিযুদ্ধে নৌ-অভিযান, পৃষ্ঠা- ১৫৩। ২৩/১১/২০১৫ কুলিয়া।
[৭৪৩] সাক্ষাৎকার, মুক্তিযোদ্ধা মোঃ নুরুল ইসলাম, বসন্তপুর।
[৭৪৪] সাক্ষাৎকার, মুক্তিযোদ্ধা মোঃ নুরুল ইসলাম, বসন্তপুর।
[৭৪৫] সাক্ষাৎকার, মুক্তিযোদ্ধা মোঃ নুরুল ইসলাম, বসন্তপুর।
[৭৪৬] সাক্ষাৎকার, মুক্তিযোদ্ধা মোঃ নুরুল ইসলাম, বসন্তপুর।
[৭৪৭] সাক্ষাৎকার, মুক্তিযোদ্ধা মোঃ ইয়াছিন আলী, বসন্তপুর। ২৩/১১/২০১৫ কুলিয়া।

পর্যন্ত ঘিরে রেখেছে।[৭৪৮] এর দুপাশেই পাকিস্তানী সেনাদের সুরক্ষিত বাঙ্কার থাকার ফলে তারা ব্রিজ পর্যন্ত পৌছাতে ব্যর্থ হয়ে ফিরে আসেন। ২২ নভেম্বর নৌকমান্ডোরা স্থলবাহিনীর মুক্তিযোদ্ধাদের সাথে একযোগে ব্রিজের মুখে অবস্থানকারী পাকিস্তানী সেনাদের উপর আক্রমণ করেন এবং ভোর ৫টায় ব্রীজে পাহারারত ৪ জন মিলিশিয়া মুক্তিবাহিনীদের কাছে প্রাথমিক গুলিতে পরাস্ত হয়।[৭৪৯] মুক্তিবাহিনীও পাকিস্তানী হানাদার বাহিনী উভয়ই সমানভাবে পাল্টাপাল্টি ভাবে জবাব দিতে থাকে এবং উভয়পক্ষে ব্যাপক গুলি বিনিময় হয়। সকাল ৯টা থেকে পাকিস্তানী সেনারা তাদের পিছনে আলীপুর অবস্থান থেকে আর্টিলারি ফায়ার শুরু করে, ফলে পাকিস্তানী সেনাদের সেলবো ফায়ার মুক্তিবাহিনীর অবস্থান লন্ডভন্ড করে দেয়।[৭৫০] ৬টি মুক্তিযোদ্ধাদের কোম্পানি সমতল ভূমিতে পিছনে হটতে গিয়ে পাকিস্তানী বাহিনীর গুলিতে আহত ও নিহত হয়।[৭৫১] এই যুদ্ধে মুক্তিবাহিনীর ১১ জন নিহত এবং অসংখ্য মুক্তিযোদ্ধা আহত হয়।[৭৫২] সাবসেক্টর কমান্ডারদ্বয় ৪ কিলোমিটার পিছিয়ে পারুলিয়াতে অবস্থান নেন কিন্তু মুক্তিবাহিনীর একটি ছোট দল ১২/১৫ জন সদস্যসহ নৌকমান্ডো খলিলুর রহমানের পরিকল্পনা মোতাবেক কুলিয়া গ্রামের উত্তরাংশে অবস্থিত আনছার মাস্টারের পুকুরের ভিতরে অবস্থান নেয় এবং ব্রিজের মুখ থেকে স্থানটির দুরত্ব ২০০ গজ দক্ষিণে অবস্থিত হওয়ায় দিনভর টুকটাক গুলিবর্ষণ করে মুক্তিযোদ্ধারা তাদের অবস্থান সম্পর্কে পাকিস্তানী হানাদার বাহিনীকে জানিয়ে দেয়।[৭৫৩] মুক্তিবাহিনীর সাথে একটি মাত্র এল.এম.জি এবং বাকিগুলো এস.এল.আর ও ৩০৩ রাইফেল থাকে।[৭৫৪] পাকিস্তানি পাকিস্তানী সেনাদের একটি দল দুপুর ১টার দিকে ঘুরে পেছনের পথে নদী অতিক্রম করে কুলিয়ার বৃহৎ বাজারে আগুন লাগিয়ে দেয়।[৭৫৫] সাথে সাথে পুকুরের মধ্যে অবস্থানকারী মুক্তিযোদ্ধারা এল.এম.জি এবং রাইফেল নিয়ে প্রচন্ড যুদ্ধ শুরু করে যার ফলে পাকিস্তানী সেনাদের কয়েকজন নিহত ও আহত হয় এবং তারা পিছু হটে নদী পার হয়ে ব্রিজের পূর্বাংশের বালিয়াডাঙ্গা গ্রামে ঘাঁটিতে ফিরে আসে। কিন্তু সম্পূর্ণ বাজারটি পুড়ে ছাই হয়ে যায় এবং বিকেল ৫টা পর্যন্ত আর কোন পক্ষ থেকে গোলাগুলি হয়নি।[৭৫৬] নৌকামান্ডো খলিলুর রহমান অগ্রবর্তী অবস্থান ব্রিজের মুখে পৌছানোর সিদ্ধান্ত নেয়। কিন্তু পাকিস্তানি সৈন্যরা বাজার পোড়ানোর পর এবং এলাকা মানবশূন্য হওয়ায় পাকিস্তানী হানাদার বাহিনী নদীর পশ্চিম অংশে বাজারে অবস্থান নিয়ে আছে কিনা সেটা খবর নেয়ার কোন উপায় নেই। অন্য দিকে কেউই সামনের ২০০ গজ ফাঁকা স্থান অতিক্রম করে বাজারে যাবার ঝুঁকি নিতে রাজি না হওয়ায় দলনেতা খলিলুর রহমান একটি ঝুঁড়ির মধ্যে একটি স্টেনগান

---

[৭৪৮] সাক্ষাৎকার, মুক্তিযোদ্ধা মোঃ ইয়াছিন আলী, বসন্তপুর।
[৭৪৯] সাক্ষাৎকার, মুক্তিযোদ্ধা মোঃ ইয়াছিন আলী, বসন্তপুর।
[৭৫০] সাক্ষাৎকার, মুক্তিযোদ্ধা মোঃ ইয়াছিন আলী, বসন্তপুর।
[৭৫১] সাক্ষাৎকার, মুক্তিযোদ্ধা মোঃ ইয়াছিন আলী, বসন্তপুর।
[৭৫২] সাক্ষাৎকার, মুক্তিযোদ্ধা মোঃ ইয়াছিন আলী, বসন্তপুর।
[৭৫৩] সাক্ষাৎকার, মুক্তিযোদ্ধা মোঃ ইয়াছিন আলী, বসন্তপুর।
[৭৫৪] সাক্ষাৎকার, মুক্তিযোদ্ধা মোঃ ইয়াছিন আলী, বসন্তপুর।
[৭৫৫] সাক্ষাৎকার, মুক্তিযোদ্ধা মোঃ ইয়াছিন আলী, বসন্তপুর।
[৭৫৬] সাক্ষাৎকার, মুক্তিযোদ্ধা মোঃ ইয়াছিন আলী, বসন্তপুর। আরও দেখবেন- কমান্ডো মোঃ খলিলুর রহমান, 'প্রাগুক্ত' পৃষ্ঠা- ১৫৪।

ও অতিরিক্ত দুটি ম্যাগজিন নিয়ে কৃষকের বেশ নিয়ে ফাঁকা স্থানটি পার হয়ে পোড়া বাজারে এসে সংকেত দিলে অবশিষ্ট ১১ জন মুক্তিযোদ্ধারা পুনরায় নদীর পাড়ে পূর্বের স্থানে এসে অবস্থান গ্রহণ করেন।[৭৫৭] সন্ধ্যায় মেজর জলিল অগ্রবর্তী অবস্থানে পৌছালে তাকে ভারী অস্ত্রের প্রয়োজনের কথা জানানো হয় এবং যার ফলে গভীর রাতে হাসনাবাদ বি.এস.এফ ঘাঁটি থেকে ১২০ মি.মি. কামান এনে পারুলিয়ায় স্থাপন করে খানসেনাদের অবস্থানের উপর বৃষ্টির মতো শেলিং করা হয়।[৭৫৮] পাকিস্তানি পাকিস্তানী সেনাদের ঘাঁটির পিছনে উত্তরদিকে শেলগুলো ফেলানো হয়, ফলে পাকিস্তানী হানাদার বাহিনী মনে করে বুঝি মুক্তিবাহিনী ভারতীয় সেনাবাহিনীর সাহায্য নিয়ে তাদের ঘিরে ফেলার চেষ্টা করছে। যার ফলে ২২ নভেম্বর রাতেই পাকিস্তানী সেনারা কুলিয়া এবং আলীপুরের প্রতিরক্ষা ব্যুহ ছেড়ে পিছিয়ে সাতক্ষীরা শহরে এসে অবস্থান নেয়।[৭৫৯] অন্যদিকে নৌকমান্ডো খলিলুর রহমান তিন কোম্পানী মুক্তিযোদ্ধাদের নিয়ে সাতক্ষীরা শহরের পশ্চিম দিকে এল্লারচর লঞ্চ ঘাঁটে অবস্থান গ্রহণ করেন।[৭৬০]

শ্যামনগর উপজেলা

৩.২৭ গোপালপুর আক্রমণ

গোপালপুর শ্যামনগর উপজেলার অন্তর্গত একটি গ্রাম। লেঃ বেগের নেতৃত্বে মুক্তিযোদ্ধারা শ্যামনগর উপজেলা সদরে অবস্থান করে, সাথে বেশ কিছু প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত মুক্তিফৌজ, ইপিআর সদস্য এবং বাকীরা সবেমাত্র অস্ত্রের শিক্ষানবীশ করছে- সব মিলিয়ে মোট ৫০০ জন।[৭৬১] ভাদ্র মাসের বৃষ্টি আর কাদায় চারিদিকে চলাফেরার অনুপযুক্ত হয়ে যায়। এমন সময় রাত প্রায় ১১ টার দিকে ক্যাপ্টেন হুদা আরও প্রায় ৫০০ জন মুক্তিফৌজ নিয়ে শ্যামনগরে এসে লেঃ বেগের সাথে আলাপ আলোচনা করেন।[৭৬২] মাত্র ৪৫ মিনিট শ্যামনগরে অবস্থান করে ক্যাপ্টেন হুদা ৮/১০ জন মুক্তিযোদ্ধাকে সাথে নিয়ে তিনি জরুরী কাজে বেরিয়ে গেলেন।[৭৬৩] উপজেলার পুলিশ মুক্তিবাহিনীদের সাহায্য সহযোগিতা করার কারণে এই এলাকায় সাধারণ লোকজন এবং মুক্তিযোদ্ধা বেশ শান্তিতে অবস্থান করতে থাকে। তবে যেকোন মুহূর্তে পাকিস্তানী হানাদার বাহিনী রাজাকারদের নিয়ে শ্যামনগরে আসতে পারে এমন খবর জানা যায়। লেঃ বেগের নেতৃত্বে প্রায় ৫০০ জন মুক্তিযোদ্ধা এবং মিজানুর রহমানের নেতৃত্বে মুক্তিযোদ্ধারাও একত্র অবস্থান করতে থাকতে সবার লক্ষ্যে শ্যামনগরে পাকিস্তানী

[৭৫৭] সাক্ষাৎকার, মুক্তিযোদ্ধা মোঃ ইয়াছিন আলী, বসন্তপুর।
[৭৫৮] সাক্ষাৎকার, মুক্তিযোদ্ধা মোঃ ইয়াছিন আলী, বসন্তপুর।
[৭৫৯] সাক্ষাৎকার, মুক্তিযোদ্ধা মোঃ ইয়াছিন আলী, বসন্তপুর।
[৭৬০] সাক্ষাৎকার, মুক্তিযোদ্ধা মোঃ ইয়াছিন আলী, বসন্তপুর।
[৭৬১] সাক্ষাৎকার, মুক্তিযোদ্ধা দেবী রঞ্জন মন্ডল, উপজেলা মুক্তিযোদ্ধা কমান্ডার, শ্যামনগর। ১২/১২/২০১৪ গোপালপুর।
[৭৬২] সাক্ষাৎকার, মুক্তিযোদ্ধা দেবী রঞ্জন মন্ডল, উপজেলা মুক্তিযোদ্ধা কমান্ডার, শ্যামনগর।
[৭৬৩] সাক্ষাৎকার, মুক্তিযোদ্ধা মোঃ এন্তাজ আলী, নকিপুর, শ্যামনগর। ১২/১২/২০১৪ গোপালপুর।

হানাদার দের আগমন প্রতিহত করা এবং মুক্তিযোদ্ধাদের অবস্থানকে আরও শক্তিশালী করে তোলা।[৭৬৪] কৈখালী ইপিআর ও ফরেস্ট ক্যাম্প কমান্ডার ইব্রাহিম ঢালীও তখন শ্যামনগরে অবস্থান করেন।[৭৬৫] একসাথে প্রায় হাজার খানিক মুক্তিযোদ্ধাদের থাকা, খাওয়া দাওয়া, ঘুমানোর ব্যাপার সবকিছু মিলিয়ে একটা জটিল অবস্থার সৃষ্টি হয়। রাত যখন ২:৩০টা বাজে তখন হঠাৎ সার্চ লাইটের মতো দুটো আলো জ্বলে উঠে এবং সবাই বেশ সজাগ হয়ে ওঠে কিন্তু বিষয়টা সবাই ঠিকঠাক মতো বুঝতে পারে না। কেউ মনে করলো খানসেনাদের আগমন, আবার কেউ ভাবলো শুধুমাত্র রাজাকারদের আগমন। যদিও মুক্তিযোদ্ধাদের নিকট এটি ট্যাঙ্ক ও এন্টি পারসন মাইন, এল.এম.জি, এস.এল.আর রাইফেল, এস.এম.জি সহ অন্যান্য অস্ত্র গোলাবারুদ কম ছিল না তারপরও যেটির অভাব ছিল সেটি হল সুশৃংখল বাহিনী।[৭৬৬] হঠাৎ গোলাগুলি শুরু হয় এবং মুক্তিবাহিনী বুঝতে পারে, শুধু রাজাকার বাহিনী নয় খানসেনাও শ্যামনগর দখল করার জন্য এই নৈশ অভিযান চালিয়েছে। মুক্তিবাহিনী খানিকটা অপ্রস্তুত অবস্থায় যে যেখানে সুবিধা পেল সেখানে অস্ত্র হাতে নিয়ে যুদ্ধে নেমে পড়ে এবং সময় যত পার হতে থাকে যুদ্ধের তীব্রতা বাড়তে থাকে, ধীরে ধীরে উভয়পক্ষ কাছাকাছি অবস্থানে আসতে থাকে।[৭৬৭] যখন ভোর হতে থাকে তখন মুক্তিবাহিনী ও শত্রু পক্ষ ১৫০ গজ মুখোমুখি দুরত্বে অবস্থান করে যুদ্ধ চালিয়ে মুক্তিযোদ্ধাদের অধিকাংশের বাড়ি বরিশাল ও কুষ্টিয়া জেলা সহ অন্যত্র, ফলে এখানকার পথঘাট সবই তাদের অচেনা, সুতরাং রাতের অন্ধকারে মুক্তিযোদ্ধাদের সংখ্যা অধিক থাকার পরও যে যার মতো আন্দাজে ফায়ার দিয়ে যায় তা বোঝা যায় না। ভোরের দিকে পাকিস্তানী সেনারা গোপালপুর শ্যামনগর রাস্তার (বর্তমান শহীদ মুক্তিযোদ্ধা সড়ক) পাশেই অবস্থান নেয় এবং মুক্তিবাহিনীর লোকেরা ওদের অয়ারলেস সেট দেখতে পায় এবং তাদের কথাবার্তা কিছু কিছু শুনতে পায়।[৭৬৮] যুদ্ধ চলতে থাকে এবং খানসেনাদের পক্ষ থেকে মুক্তিবাহিনীদেরকে আত্মসমর্পনের আহবান জানায়। অন্য দিকে এলাকায় এত মুক্তিফৌজ থাকায় সাধারণ জনগণ মনে করে, মুক্তিযোদ্ধারা নিজেরাই প্রশিক্ষণ নিয়ে যুদ্ধের কলাকৌশল রপ্ত করছে এবং গোলাগুলি করে হাতের নিশানা ঠিক করছে যা দেখতে অনেক আগ্রহী যুবক গাছেও উঠে গেছে। যুদ্ধের গতি কখনও বৃদ্ধি পেতে থাকে, কখনও বা ধীর গতিতে চলতে থাকে। মুক্তিযোদ্ধা জবেদ আলী অন্যান্য মুক্তিযোদ্ধাদের থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে ২/৩ জন সঙ্গী নিয়ে পাকিস্তানী সেনাদের মোকাবেলা করতে থাকে কিন্তু হঠাৎ তার একজন সহযোদ্ধা মাথা উচু করে গুলি ছুড়তে যাবার সাথে সাথে মাথায় আঘাত পেয়ে মৃত্যুবরণ করেন এবং অন্য আরেকজন আহত হয়।[৭৬৯] এখন জবেদ আলী ধানের ক্ষেতের মধ্যে দিয়ে পার হয়ে আহত

[৭৬৪] সাক্ষাৎকার, মুক্তিযোদ্ধা মোঃ এন্তাজ আলী, নকিপুর, শ্যামনগর।
[৭৬৫] সাক্ষাৎকার, মুক্তিযোদ্ধা মোঃ এন্তাজ আলী, নকিপুর, শ্যামনগর।
[৭৬৬] সাক্ষাৎকার, মুক্তিযোদ্ধা গাজী আবুল হোসেন, সহকারী কমান্ডার, নকিপুর, শ্যামনগর। ১২/১২/২০১৪ গোপালপুর।
[৭৬৭] সাক্ষাৎকার, মুক্তিযোদ্ধা গাজী আবুল হোসেন, সহকারী কমান্ডার, নকিপুর, শ্যামনগর।
[৭৬৮] সাক্ষাৎকার, মুক্তিযোদ্ধা গাজী আবুল হোসেন, সহকারী কমান্ডার, নকিপুর, শ্যামনগর।
[৭৬৯] সাক্ষাৎকার, মুক্তিযোদ্ধা মোঃ জিয়াদ আলী, সহকারী কমান্ডার, নকিপুর, শ্যামনগর।

সঙ্গীকে নিয়ে গোপালপুর দীঘির মধ্যে এসে পৌছায়। মুক্তিযোদ্ধারা একে অপর থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে কে কোন দিকে অবস্থান নিয়েছে তার কোন ঠিক নেই, অন্যদিকে সকাল ৮টার দিকেও পাকিস্তানী হানাদার বাহিনী, রাজাকাররা মুক্তিযোদ্ধাদেরকে আক্রমণ চালিয়ে যেতে থাকে।[৭৭০] জবেদ আলী অনেক কষ্টে আহত মুক্তিযোদ্ধাকে নিয়ে ঋষিপাড়ায় প্রবেশ করে এবং সে দেখতে পায় কিছু দুরে বাঁশঝাড়ের অভ্যন্তরে একদল মুক্তিবাহিনী অবস্থান নিয়েছে এবং ইতোমধ্যে পাকিস্তানী হানাদার বাহিনী আরও প্রায় ২ কিলোমিটার এগিয়ে এসে অবস্থান নেয়।[৭৭১] মুক্তিবাহিনী দেখতে পায়, রাজাকার মাহমুদ, নুরুল ইসলাম, ইস্রাফিল মাস্টার প্রমুখ পাকিস্তানী বাহিনীকে পথ দেখিয়ে নিয়ে সাথে আনছে।[৭৭২] মনসুর সরদার নামের একজন পুস্তক ব্যবসায়ী আহত মুক্তিযোদ্ধাদের করুন অবস্থা দেখে গজ তুলা ও ডেটল ইত্যাদি দিয়ে ক্ষতস্থান পরিস্কার করে দেয় এবং সেবা করতে থাকে।[৭৭৩] ইমাম গাজীর পিতা আব্বাস গাজীকে নৌকা থেকে উকি মারার দায়ে পাকহানাদাররা গুলি করে মারে, একজন ঋষীকে বেয়নেট দিয়ে হত্যা করে, দুজন কৃষক না বুঝতে পেরে পাকিস্তানী হানাদারদের পাশ দিয়ে ধানের চারা নিয়ে অন্য জায়গায় যাবার সময় খানসেনারা তাদের হত্যা করে, অন্য দিকে একজন বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্রসহ দুইজনকে ধরে নিয়ে যায়।[৭৭৪] লেঃ বেগ যুদ্ধ করে কভারিং দিয়ে পশ্চাপদসরণ করার সময় পাকিস্তানী সেনাদের ফজলু নামক একজন মুক্তিযোদ্ধাকে ধরে নিয়ে যায়।[৭৭৫] সকাল যখন ৯:০০ টা বাজে তখনও যুদ্ধ চালিয়ে যেতে থাকে এবং আরও একজন মুক্তিযোদ্ধা শহীদ হন।[৭৭৬] যুদ্ধ করতে করতে কুষ্টিয়া জেলার ইপিআর সুবেদার ইলিয়াস আহমদ, কুষ্টিয়া জেলার আবুল কালাম আজাদ ও আব্দুল কাদের শহীদ হন।[৭৭৭] তারপর পাকিস্তানী হানাদার বাহিনী, রাজাকাররা ফিরে যায় আর মুক্তিবাহিনীরা এলোমেলোভাবে ভারতে ফিরে আসে। শ্যামনগর উপজেলা জামে মসজিদের ইমামের নেতৃত্বে শহীদদের জানাযা ও দাফন কাফন করা হয় এবং স্বাধীনতার পরে শ্যামনগর মুক্তিযোদ্ধা সংসদ এর কমান্ডার লিয়াকত আলীর নেতৃত্বে শহীদদের কবর নির্মাণ করা হয় এবং একটি স্মৃতিসৌধ নির্মাণ করা হয়।[৭৭৮] গোপালপুর যুদ্ধ মুক্তিযোদ্ধাদের অনেক শিক্ষা দেয় সৈন্য সংখ্যা ও অস্ত্রের সাথে সাথে সুশৃংখল বাহিনীও প্রয়োজন। গোপালপুর যুদ্ধে যেসব মুক্তিযোদ্ধারা অংশগ্রহণ করেন এরা কয়েকজন হলেন- আবুল হোসেন, ইব্রাহীম ঢালী, গাজী মুজিবর, এন্তাজ, হালিম, হাসেম, ফজলু, বারেক, গাজী নওসের প্রমুখ।[৭৭৯]

---

[৭৭০] সাক্ষাৎকার, মুক্তিযোদ্ধা মোঃ জিয়াদ আলী, সহকারী কমান্ডার, নকিপুর, শ্যামনগর।
[৭৭১] সাক্ষাৎকার, মুক্তিযোদ্ধা মোঃ জিয়াদ আলী, সহকারী কমান্ডার, নকিপুর, শ্যামনগর।
[৭৭২] সাক্ষাৎকার, মুক্তিযোদ্ধা মাস্টার নজরুল ইসলাম, নকিপুর, শ্যামনগর।
[৭৭৩] সাক্ষাৎকার, মুক্তিযোদ্ধা মাস্টার নজরুল ইসলাম, নকিপুর, শ্যামনগর।
[৭৭৪] সাক্ষাৎকার, মুক্তিযোদ্ধা মাস্টার নজরুল ইসলাম, নকিপুর, শ্যামনগর।
[৭৭৫] সাক্ষাৎকার, মুক্তিযোদ্ধা মাস্টার নজরুল ইসলাম, নকিপুর, শ্যামনগর।
[৭৭৬] সাক্ষাৎকার, মুক্তিযোদ্ধা দেবী রঞ্জন মন্ডল, উপজেলা মুক্তিযোদ্ধা কমান্ডার, শ্যামনগর।
[৭৭৭] সাক্ষাৎকার, মুক্তিযোদ্ধা দেবী রঞ্জন মন্ডল, উপজেলা মুক্তিযোদ্ধা কমান্ডার, শ্যামনগর।
[৭৭৮] সাক্ষাৎকার, মুক্তিযোদ্ধা দেবী রঞ্জন মন্ডল, উপজেলা মুক্তিযোদ্ধা কমান্ডার, শ্যামনগর।
[৭৭৯] সাক্ষাৎকার, মুক্তিযোদ্ধা দেবী রঞ্জন মন্ডল, উপজেলা মুক্তিযোদ্ধা কমান্ডার, শ্যামনগর।

শ্যামনগর উপজেলাঃ

৩.২৮ রামজীবনপুরের যুদ্ধ

জামায়াতে ইসলামী দলের মন্ত্রী মওলানা আব্দুস সাত্তার ১৯৭১ সালে মুক্তিযুদ্ধ শুরু হলে তিনি রাজাকার বাহিনীতে যোগদান করে কামান্ডারের দায়িত্ব নেন।[৭৮০] মওলানা আব্দুস সাত্তার মুক্তিযোদ্ধা ও মুক্তিযুদ্ধের স্বপক্ষের লোকদের হত্যার জন্য একটি তালিকা তৈরী করেন এবং তার অত্যাচারে সাধারণ মানুষের জীবন অতিষ্ঠ হয়ে ওঠে এবং তার নির্দেশে শ্যামনগর অঞ্চলে গণহত্যা সংঘটিত হয়।[৭৮১] শ্যামনগর উপজেলার রায়পুর গ্রামের আওয়ামীলীগের নেতা আব্দুল করিম, মওলানা আব্দুস সাত্তারের নিকট আত্মীয় হওয়া সত্বেও মুক্তিযোদ্ধাদের সাহায্য করার অপরাধে কৌশলে তাকে ডেকে এনে হত্যা করে।[৭৮২] এসব কারণে মুক্তিযোদ্ধারা খুব জরুরী ভিত্তিতে মওলানা আব্দুস সাত্তারকে হত্যা করার পরিকল্পনা করে। গোপন সূত্রে মুক্তিযোদ্ধারা জানতে পারে, রাজাকার কমান্ডার মওলানা আব্দুস সাত্তার শ্যামনগর আই.বি-তে অবস্থান করছে এবং সাথে সাথে কমান্ডার মুক্তিযোদ্ধা মিজানুর রহমানের নেতৃত্বে ১৫/১৬ জনের একটি মুক্তিবাহিনী শ্যামনগরের উদ্দেশ্যে রওনা দেন।[৭৮৩] মুক্তিযোদ্ধারা রামজীবনপুর পৌছাতেই সামনে রাজাকারদের উপস্থিতি বুঝতে পারে এবং রামজীবনপুর কালভাটের উপর তিন রাস্তার মোড়ে দুপক্ষের সম্মুখ যুদ্ধ আরম্ভ হয়।[৭৮৪] উভয় পক্ষই প্রচন্ড গোলাগুলি করতে থাকে এবং এদিক একজন নির্ভীক মুক্তিযোদ্ধা জীবনের মায়া ত্যাগ করে খুব ঝুঁকি নিয়ে ক্রলিং করে মওলানা আব্দুস সাত্তার এর পিছনে যান এবং তার মাথায় প্রচন্ড জোরে অস্ত্রের আঘাত করেন।[৭৮৫] মওলানা আব্দুস সাত্তার এর করুন অবস্থা দেখে অন্যান্য রাজাকাররা এদিক ওদিক পালিয়ে যেয়ে জীবন রক্ষা করে এবং রাজাকার কমান্ডার মওলানা আব্দুস সাত্তার কে ঐ স্থানে গুলি করে হত্যা করা হয়।[৭৮৬] মুক্তিযোদ্ধারা এই যুদ্ধক্ষেত্র থেকে রাজাকারদের ফেলে যাওয়া ৬টা রাইফেল ও মওলানা আব্দুস সাত্তার এর পকেট থেকে দুই শতাধিক লোকের নামের হত্যার জন্য চিহ্নিত করা একটি তালিকা পান।[৭৮৭] কিন্তু পরবর্তীকালে রাজাকাররা এসে মুক্তিযোদ্ধাদের সহযোগী মনিরউদ্দীন মোড়লের বাড়িঘর আগুনে জ্বালিয়ে দেয়।[৭৮৮]

---

[৭৮০] সাক্ষাৎকার, মুক্তিযোদ্ধা দেবী রঞ্জন মন্ডল, উপজেলা মুক্তিযোদ্ধা কমান্ডার, শ্যামনগর। ২২/১২/২০১৪ শ্যামনগর বাজার।
[৭৮১] সাক্ষাৎকার, মুক্তিযোদ্ধা দেবী রঞ্জন মন্ডল, উপজেলা মুক্তিযোদ্ধা কমান্ডার, শ্যামনগর।
[৭৮২] সাক্ষাৎকার, মুক্তিযোদ্ধা দেবী রঞ্জন মন্ডল, উপজেলা মুক্তিযোদ্ধা কমান্ডার, শ্যামনগর।
[৭৮৩] সাক্ষাৎকার, মুক্তিযোদ্ধা গাজী আবুল হোসেন, নকিপুর, শ্যামনগর। ২২/১২/২০১৪ নবেকী শ্যামনগর।
[৭৮৪] সাক্ষাৎকার, মুক্তিযোদ্ধা গাজী আবুল হোসেন, নকিপুর, শ্যামনগর।
[৭৮৫] সাক্ষাৎকার, মুক্তিযোদ্ধা গাজী আবুল হোসেন, নকিপুর, শ্যামনগর।
[৭৮৬] সাক্ষাৎকার, মুক্তিযোদ্ধা মোঃ জিয়াদ আলী, সহকারী কমান্ডার, নকিপুর, শ্যামনগর। ২২/১২/২০১৪ নবেকী শ্যামনগর।
[৭৮৭] সাক্ষাৎকার, মুক্তিযোদ্ধা গাজী আবুল হোসেন, নকিপুর, শ্যামনগর।
[৭৮৮] সাক্ষাৎকার, মুক্তিযোদ্ধা গাজী আবুল হোসেন, নকিপুর, শ্যামনগর।

শ্যামনগর উপজেলা

৩.২৯ কালিন্দি নদীতে গানবোটের সাথে যুদ্ধ

কালিন্দি নদী সুন্দরবন এলাকার একটি খরস্রোতা গুরুত্বপূর্ণ নদী যা বাংলাদেশ ভারতকে সংযোগ করেছে। বাংলাদেশের মোট ১১টা সেক্টরের বীর মুক্তিযোদ্ধারা বৃষ্টি, ঝড়, কাদামাটি সহ সব ধরনের প্রতিকুল অবস্থা মোকাবেলা করে খানসেনা ও রাজাকারদের সাথে যুদ্ধে মগ্ন। বৃষ্টির পানি এবং নদী পাকিস্তানী সেনাদের মূল ভয়ের কারণ এসব কারণে বার বার পাকিস্তানী হানাদারদের কে মুক্তিবাহিনীর কাছে পরাজয় বরণ করতে হয়। দেশ-বিদেশে পত্র পত্রিকায় বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ প্রথম হেডলাইন হিসাবে প্রকাশিত হয়। এদিকে নবম সেক্টরের মুক্তিযোদ্ধারা অন্যান্য সেক্টরের সাথে প্রতিযোগিতা করে যুদ্ধ চালিয়ে যেতে থাকে। নবম সেক্টরের কমান্ডার মেজর জলিল সহ অন্যান্য কমান্ডারবৃন্দ খুলনা জেলার সকল উপজেলা এলাকা দখল করে নিলেও খুলনা শহরের বড় ধরনের অভিযান পরিচালনার কথা পরিকল্পনা করে।[৭৮৯] অনেক আলাপ আলোচনার পর খুলনা মহানগরীতে অপারেশন পরিচালনা করার জন্য একটি শক্তিশালী ও দুঃসাহসিক মুক্তিবাহিনী পাঠানোর সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। নৌ-কমান্ডো আলফাজ উদ্দিনের নেতৃত্বে ২০ সদস্যের একটা শক্তিশালী টিম গঠন করা হয় এবং লেঃ মাহফুজুল আলম বেগ ও বটিয়াঘাটার দুর্ধষ কমান্ডার আফজালকে এই মুক্তিবাহিনীর দলকে নিরাপদে খুলনা শহরের পৌছে দেবার দায়িত্ব দেওয়া হয়।[৭৯০] সময়টা তখন আগস্ট মাস এবং আলফাজ উদ্দিন ও তাঁর কমান্ডোবাহিনী প্রচুর মাইন, প্রয়োজনীয় বিস্ফোরক দ্রব্য ও অস্ত্র শস্ত্র এবং গোলাবারুদ নিয়ে নবম সেক্টরে রিপোর্ট করে।[৭৯১] লেঃ বেগ ও আফজাল নৌ-কমান্ডোদের টিম নিয়ে শমসের নগর বিওপি দিয়ে পার হয়ে সুন্দরবনের মধ্য দিয়ে রাতেই চুনকুড়ি নদীতে পৌছে যায়।[৭৯২] পাকনৌবাহিনীর গানবোট নিয়মিত কালিন্দি নদী পাহারা দেয়ার কাজে নিয়োজিত থাকায় কমান্ডার আফজালের নির্দেশে নবাব্দী ফকির ও তার দল নদীর তীরে ওয়াপদা বাঁদে অনেকগুলো বাঙ্কার তৈরী করে রাখে যাতে এগুলো প্রয়োজনে মুক্তিবাহিনীকে সাহায্য করতে পারে।[৭৯৩] আফজাল ও তার বাহিনী নতুন উদ্যমে দেশমাতৃকার মাটি থেকে দখলদার পাকিস্তানী বাহিনীকে উৎখাত করার লক্ষ্যে খুলনা মহানগরী ও পশুর, ভৈরব, রুপসা নদীতে সব ধরনের অপারেশন ও খন্ড যুদ্ধ বা গেরিলা যুদ্ধ পরিচালনার প্রস্তুতি নিয়ে রাতের সূচি ভেদ্য অন্ধকার পথে চলতে থাকে।[৭৯৪] নৌকামান্ডো হলেও সবাই যেকোন অপারেশন খন্ড যুদ্ধ বা গেরিলা আক্রমণের অনেক পারদর্শী। সিদ্ধান্ত হয়, নবাব্দী ফকিরের ব্যবস্থাপনায় রাতে তারা খাওয়া দাওয়া ও বিশ্রাম শেষে ফজরের আযানের সাথে সাথে

---

[৭৮৯] সাক্ষাৎকার, মুক্তিযোদ্ধা গাজী আবুল হোসেন, নকিপুর, শ্যামনগর। ২২/১২/২০১৪ নবেকী শ্যামনগর।
[৭৯০] সাক্ষাৎকার, মুক্তিযোদ্ধা গাজী আবুল হোসেন, নকিপুর, শ্যামনগর। ঐ।
[৭৯১] স.ম. বাবর আলী, 'প্রাগুক্ত' পৃষ্ঠা- ২৮১।
[৭৯২] সাক্ষাৎকার, মুক্তিযোদ্ধা দেবী রঞ্জন মন্ডল, উপজেলা মুক্তিযোদ্ধা কমান্ডার, শ্যামনগর। ২২/১২/২০১৪ শ্যামনগর।
[৭৯৩] সাক্ষাৎকার, মুক্তিযোদ্ধা দেবী রঞ্জন মন্ডল, উপজেলা মুক্তিযোদ্ধা কমান্ডার, শ্যামনগর।
[৭৯৪] সাক্ষাৎকার, মুক্তিযোদ্ধা দেবী রঞ্জন মন্ডল, উপজেলা মুক্তিযোদ্ধা কমান্ডার, শ্যামনগর।

জলযান যোগে খুলনার উদ্দেশ্যে রওনা হওয়ার।[৭৯৫] কিন্তু রাতেই লেঃ বেগ ও তার নেতৃত্বে মুক্তিবাহিনীর দল অন্যত্র গুরুত্বপূর্ণ অভিযান নাম করে চলে যায়। ফলে কমান্ডার আফজালের উপর একক দায়িত্ব পড়ে নৌকামান্ডো দলকে খুলনা শহরে পৌছে দেবার। কিন্তু নবাব্দী ফকির ও তার লোকজন এসে জানায় দুই দুইটা পাকনেভীর গানবোট গভীর রাত থেকে কালিন্দি নদীতে পাহারা দিচ্ছে।[৭৯৬] অন্যদিকে এ নৌপথ ছাড়া খুলনা যাবার অন্য কোন পথ নেই। যার ফলে কমান্ডার আফজাল ও নৌকামান্ডো নেতা আফজাল অনেক আলাপ আলোচনার পর সিদ্ধান্ত নেয়, পাক গানবোটে মাইন লাগানোর এবং প্রয়োজনে সম্মুখ যুদ্ধে শত্রু বাহিনীকে মোকাবিলা করার এবং সিদ্ধান্ত অনুযায়ী কমান্ডারের নির্দেশে আফজাল বাহিনী বাঙ্কারে অবস্থান করে।[৭৯৭] অন্যদিকে আলফাজের নির্দেশে সব কমান্ডাররা বুকে মাইন বেধে প্রস্তুতি নেয় এবং কমান্ডারের নেতৃত্বে আফজাল বাহিনী কভারিং ফায়ার এর প্রস্তুত হয়।[৭৯৮] আগস্ট মাস হলেও সকাল থেকে কুয়াশা ভাব বিরাজ করায়, সূর্যের মুখ স্পষ্টভাবে দেখা যায় না এবং কালিন্দী নদী তার আপন গতিতে সাগরের দিকে বয়ে চলে। নদীর এক পাশে গভীর সুন্দরবন এবং অন্যপাড়ে চুনকুড়ি সহ সবুজ গ্রাম। কিন্তু হঠাৎ পাকিস্তানী বাহিনীর গানবোট থেকে ফায়ারিং শুরু হওয়ায় কমান্ডার আফজাল পাল্টা জবাব দেয়। ইতোমধ্যে নৌকমান্ডো রইস উদ্দিনসহ অন্যান্য নৌকমান্ডোরা পানিতে নেমে সাঁতার কাটা শুরু করে কিন্তু হঠাৎ কুয়াশা ভাবটা কেটে যাওয়ার সূর্যকিরণ স্পষ্ট হতে থাকে এবং নৌকমান্ডারা খুব ভাল ভাবেই পাক বাহিনীর গানবোর্ট দেখতে পায়। অন্যদিকে পাক নৌবাহিনীও তাদের কে দেখতে পেয়ে বর্ষার মতো গুলি বর্ষণ করতে থাকে। কিন্তু দুঃসাহসিক নৌ-কমান্ডো ক্যাপ্টেন আলফাজ এসব দেশপ্রেমিক নৌকমান্ডোদের নিশ্চিত মৃত্যুর ঝুঁকি নিতে চাইলেন না, কারণ তিনি চিন্তা করে দেখলেন দিনের আলোয় এ ধরনের অপারেশন গেরিলা আইন কানুনের বাহিরে।[৭৯৯] সুতরাং তিনি সবাইকে এ অভিযান স্থগিত করে তীরে ফেরার নির্দেশ দেন। গানবোট খুব দ্রুত গতিতে নৌকমান্ডোদের লক্ষ্য করে অবিরাম শেল নিক্ষেপ করতে থাকে কিন্তু সৌভাগ্যক্রমে শেলগুলো নদীর জলে পড়ে অবিস্ফোরিত রয়ে যায়। ফলে নিশ্চিত মৃত্যুর হাত থেকে ২০ জন নৌকমান্ডোরা বেঁচে যান এবং গানবোট দুটো খুব দ্রুত গতিতে তীরের দিকে আসতে থাকে।[৮০০] এমন দূর্বিসহ অবস্থা থেকে কমান্ডার আফজাল নিজেই দুইঞ্চি মর্টার ফায়ার করেন এবং এল.এম.জি ফায়ার জোরদার করার নির্দেশ দেন। এটা এল.এম.জি ও মর্টারের সর্বগ্রাসী ফায়ার গানবোট দুটোকে মারাত্মকভাবে আঘাত করে, যার ফলে একটা গানবোট তো রীতিমতো। কালিন্দি নদীর পানিতে ঘুরপাক খেয়ে ডুবে যাওয়ার মতো অবস্থা হয়, অন্যটি দ্রুত পিছিয়ে যেতে

[৭৯৫] সাক্ষাৎকার, মুক্তিযোদ্ধা দেবী রঞ্জন মন্ডল, উপজেলা মুক্তিযোদ্ধা কমান্ডার, শ্যামনগর। ২৩/১২/২০১৪ শ্যামনগর।
[৭৯৬] সাক্ষাৎকার, মুক্তিযোদ্ধা মোঃ জিয়াদ আলী, সহকারী কমান্ডার, নকিপুর, শ্যামনগর।
[৭৯৭] সাক্ষাৎকার, মুক্তিযোদ্ধা মোঃ জিয়াদ আলী, সহকারী কমান্ডার, নকিপুর, শ্যামনগর।
[৭৯৮] সাক্ষাৎকার, মুক্তিযোদ্ধা মোঃ জিয়াদ আলী, সহকারী কমান্ডার, নকিপুর, শ্যামনগর। ২৩/১২/২০১৪ নকিপুর বাজার।
[৭৯৯] সাক্ষাৎকার, মুক্তিযোদ্ধা মাস্টার নজরুল ইসলাম।
[৮০০] সাক্ষাৎকার, মুক্তিযোদ্ধা মাস্টার নজরুল ইসলাম।

সক্ষম হয় এবং মুক্তিবাহিনীর অব্যর্থ ফায়ারে গানবোটের সৈনিকদের আর্তচিৎকার শোনা যায়।[৮০১] এদিকে উভয় পক্ষের ব্যাপক গোলাগুলির কারণে সুন্দরবনাঞ্চল আর আশেপাশের গ্রামগুলো কেঁপে উঠতে থাকে। পাকিস্তানী বাহিনীর কয়েকজন সৈন্য আহত হয়, কিন্তু মারাত্মক আঘাতপ্রাপ্ত গানবোটটিও ঠিক হয়ে আবার ফায়ার করা শুরু করে। যুদ্ধে কোন পক্ষের কোন ছাড় নেই এবং কয়েক ঘন্টা ধরে যুদ্ধ চলতে থাকে। একদিকে গানবোট দুটো কিছুক্ষণ পর পর তীরে নামার চেষ্টা করে অন্যদিকে মুক্তিবাহিনী জীবনপন ফায়ার দিয়ে তাদের অগ্রগতিতে প্রতিহত করতে থাকে। মুক্তিবাহিনীর পর্যাপ্ত গুলি আছে, তেমনি আছে দুঃসাহস, যার ফলে বেলা গড়িয়ে দুপুর থেকে বিকেল হয়ে যায়। তারপরও কমান্ডার আফজাল এবং নৌকমান্ডো দলনেতা আলফাজ উদ্দিনের যুদ্ধ সন্ধ্যা পর্যন্ত চালিয়ে নিয়ে যেতে বদ্ধ পরিকর।[৮০২] বিকেল প্রায় ৪টার দিকে পাক নৌগানবোট ধীরে ধীরে পিছু হটতে থাকে এবং ১৫/২০ মিনিট পর তারা দৃষ্টির অগোচরে চলে যায়।[৮০৩] তারপর কমান্ডোদের নির্দেশে যুদ্ধ প্রত্যাহার করা হয় এবং অনেকগুলো মাইন নদীতে ভাসিয়ে দেয়া হয়, অনেকগুলো অকেজো হওয়ার ফেলে দেয়া হয়, কিছু মাইন ও অস্ত্র গোলাবারুদ নবান্দী ফকিরের দায়িত্বে রেখে মুক্তিবাহিনী কালিন্দি নদী পার হয়ে সুন্দরবনের ভিতরে প্রবেশ করে এবং তারা অনেক কষ্টে ছোট খাট বাঁধা বিপত্তি পার হয়ে ভারতের শমসের নগর পৌছায়।[৮০৪] এ যুদ্ধে ৪/৫ জন খানসেনা নিহত হয় এবং মুক্তিবাহিনীর ৩ জন এবং আশপাশ গ্রামের ৩/৪ জন সাধারণ লোক জীবন হারায়।[৮০৫] নৌকমান্ডো দলনেতা আলফাজ উদ্দিনের সাথে যারা ছিলেন তারা হলেন নৌকমান্ডো রইস উদ্দিন-আশাশুনি, শফিক আহমেদ-ধুলিহার, কাজী নজরুল ইসলাম-নেবাখালি, শাহাদৎ হোসেন-তালা, মুজিবর রহমান-শ্যামনগর, মোহর আলী-শ্যামনগর, প্রমুখ।[৮০৬] কমান্ডার আফজারের সাথে ছিলেন- আমজাদ, আকরাম, সেনের বাজারের বাক্কার, বঙ্গবন্ধুর চাচাতো ভাই শেখ ফরিদ, বটিয়াঘাটার ইলিয়াস, সাতক্ষীরার কাদের, চাঁদখালির আমিনুল ইসলাম, রাড়ুলির দবির সরদার, ধামরাইলের আব্দুর রাজ্জাক, সোহরাব গদাইপুরের মোজাম্মেল সহ ৬০/৬৫ জন।[৮০৭]

[৮০১] সাক্ষাৎকার, মুক্তিযোদ্ধা মোঃ জিয়াদ আলী, সহকারী কমান্ডার, নকিপুর, শ্যামনগর।
[৮০২] সাক্ষাৎকার, মুক্তিযোদ্ধা মাস্টার নজরুল ইসলাম।
[৮০৩] সাক্ষাৎকার, মুক্তিযোদ্ধা মোঃ এন্তাজ আলী।
[৮০৪] সাক্ষাৎকার, মুক্তিযোদ্ধা মোঃ এন্তাজ আলী। ২২/১২/২০১৪ নকিপুর বাজার।
[৮০৫] সাক্ষাৎকার, মুক্তিযোদ্ধা মোঃ এন্তাজ আলী।
[৮০৬] সাক্ষাৎকার, মুক্তিযোদ্ধা দেবী রঞ্জন মন্ডল, উপজেলা মুক্তিযোদ্ধা কমান্ডার, শ্যামনগর।
[৮০৭] সাক্ষাৎকার, মুক্তিযোদ্ধা দেবী রঞ্জন মন্ডল, উপজেলা মুক্তিযোদ্ধা কমান্ডার, শ্যামনগর।

শ্যামনগর উপজেলা

৩.৩০ চুনকড়ি নদীতে গানবোটের উপর আক্রমণ

হরিনগর গ্রামটি সাতক্ষীরা জেলার দক্ষিণে শ্যামনগর উপজেলার অধীনে সুন্দরবনের পাশে অবস্থিত। শ্যামনগর উপজেলা থেকে ১০ কিলোমিটার দক্ষিণে অবস্থিত এবং গ্রামটির দক্ষিণ পাশ দিয়ে চুনকড়ি নদী শিবসা থেকে উৎপত্তি হয়ে সোজা পশ্চিম দিকে প্রবাহিত হয়ে বারত সীমান্তবর্তী কৈখালীর নিকটে রায়মঙ্গল নদীতে গিয়ে মিলিত হয়েছে।[৮০৮] ছোট বড় অনেক নদী এখানে রয়েছে এবং ভারত সীমান্ত থেকে হরিনগরের দুরত্ব ১৫ কিলোমিটার কৈখালী সীমান্তে মুক্তিযোদ্ধাদের ক্যাম্প এবং এর দক্ষিণে সুন্দরবনের সেপ্টেম্বর মাসের শেষের দিকে পলাশী নৌ-কমান্ডো থেকে লেঃ কমান্ডার মার্টিস ২০ জন কমান্ডোকে মুক্তিযুদ্ধে ৯ নম্বর সেক্টর কমান্ডার মেজর জলিলের কাছে পাঠান এবং চিঠি পাঠিয়ে প্রয়োজনীয় নির্দেশাবলী দিয়ে দেন।[৮০৯] মেজর জলিল নৌ-কমান্ডোদের মংলা বন্দরে পাঠানোর জন্য আফজাল এবং আনোয়ারের অধীনে আরও ৫০-৬০ জন গেরিলা যোদ্ধাকে নির্ধারণ করেন।[৮১০] পরিকল্পনা অনুযায়ী মুক্তিবাহিনীরা বাগুন্ডি ক্যাম্প থেকে ট্রাকে চেপে কৈখালী পৌছে সীমান্ত নদী অতিক্রম করে পায়ে হেঁটে মংলার পথে রওনা দেয়। সন্ধ্যার দিকে হরিনগর পৌছে যায় এবং আফজাল এই গ্রামের পচান্দী গাজীর বাড়িতে মুক্তিযোদ্ধাদের খাওয়া-দাওয়া ও বিশ্রামের ব্যবস্থা করেন।[৮১১] রাতে মুক্তিযোদ্ধারা জানতে পারে রাতে পাকিস্তানী বাহিনীর গানবোটগুলো এই এলাকা টহল দেবার জন্য আসে, এখন গ্রামবাসীরা হাঁস, মুরগী, খাসি বিভিন্ন উপহার সামগ্রী দেয় এবং তারা খুশী হয়ে চলে যায়।[৮১২] ভোর বেলার দিকে পাহারারত মুক্তিযোদ্ধারা আফজাল এবং আনোয়ার দুরে পাকিস্তানী গানবোটের ইঞ্জিনের শব্দ শোনার কথা জানালে আফজাল, আনোয়ার মুক্তিযোদ্ধাদের ঘুম থেকে উঠে যুদ্ধের প্রস্তুতি নিতে বলে এবং নৌকমান্ডোদের গানবোটে মাইন বাঁধার নির্দেশ প্রদান করেন।[৮১৩] কিন্তু নৌ-কমান্ডোদের কেউ চলন্ত গানবোটে মাইন লাগাতে পারে না অন্যদিকে তাদের গন্তব্যস্থল মংলা, একথা জানার পর তারা ক্ষিপ্ত হয়ে নৌকমান্ডোদের ভৎসনা করতে থাকেন। আফজাল এবং আনোয়ার উভয়ই বদমেজাজি মানুষ হওয়ায় তারা এল.এম.জি এবং এস.এম.আর দিয়েই গানবোটটিকে আক্রমণের সিদ্ধান্ত নিলেন। পাকিস্তানী বাহিনীর গানবোট গুলো প্রায় মুন্সীগঞ্জ থেকে সীমান্ত কৈখালী মুক্তিযোদ্ধা ক্যাম্পের উপর গুলিবর্ষণ করে এবং অনেক সময় নৌবাহিনীর গানবোটগুলো কালীগঞ্জ ও মুন্সীগঞ্জ এ তাদের ঘাঁটিতে প্রয়োজনীয় রসদ পৌছে দিয়ে

[৮০৮] সাক্ষাৎকার, মুক্তিযোদ্ধা গাজী আবুল হোসেন। ২৪/১২/২০১৪ শ্যামনগর।
[৮০৯] সাক্ষাৎকার, মুক্তিযোদ্ধা গাজী আবুল হোসেন। আরও দেখবেন- কমান্ডো মোঃ খলিলুর রহমান, 'প্রাগুক্ত' পৃষ্ঠা- ১৩৩।
[৮১০] সাক্ষাৎকার, মুক্তিযোদ্ধা গাজী আবুল হোসেন। ২৪/১২/২০১৪ শ্যামনগর।
[৮১১] সাক্ষাৎকার, মুক্তিযোদ্ধা মাস্টার নজরুল ইসলাম।
[৮১২] সাক্ষাৎকার, মুক্তিযোদ্ধা মাস্টার নজরুল ইসলাম।
[৮১৩] সাক্ষাৎকার, মুক্তিযোদ্ধা এস.এম. লিয়াকত আলী, শ্যামনগর। ২৪/১২/২০১৪ নকিপুর।

কৈখালী মুক্তিযোদ্ধা ক্যাম্পের উপর গুলিবর্ষণ করে এবং এটি তাদের আধিপত্য বিস্তারের কৌশল।[৮১৪] পাক নৌগানবোট গুলো যখন গোলাবর্ষনের পর হরিনগর পৌছে, তখন মুক্তিবাহিনীর সদস্যরা আচমকা নদীর কিনারে বেড়িবাঁধের আড়াল থেকে বৃষ্টির মতো অনবরত গুলিবর্ষণ করা শুরু করে। পাকিস্তানী বাহিনীর বেশ কয়েকজন সদস্য আহত ও নিহত হয়, কিন্তু দুটি গানবোট থেকে অবিরামভাবে ভারী গোলাবর্ষণের ফলে সম্পূর্ণ গ্রাম কাপতে থাকে, অনেক বাড়িঘরে আগুন লেগে যায়।[৮১৫] গুলিবর্ষণ করতে করতে গানবোট দুটি সামনের দিকে আগ্রসর হতে থাকলে গ্রামের মানুষ ভয়ে সর্বস্ব ফেলে জীবন বাঁচাতে সীমান্তের দিকে ছুটতে থাকে। ফলে অসংখ্য মানুষ এবং জীব প্রাণ হরায়। অবস্থা দেখে আফজাল এবং আনোয়ার মুক্তিযোদ্ধাদের যুদ্ধ প্রত্যাহার করে দ্রুত সীমান্তের দিকে যাবার নির্দেশ দেন এবং অবশেষে প্রবল গুলি ও শেলিংয়ের মাঝে নৌ কমান্ডোদের ব্যবহারের জন্য ১০টি মাইন ও ২০ জোড়া ফিন্স পরিত্যক্ত রেখে তারা সীমান্ত পাড়ি দিয়ে পুনরায় হাসনাবাদ ক্যাম্পে ফিরে যান।[৮১৬] নৌকমান্ডোরা সম্পূর্ণ ঘটনা মেজর জলিলকে জানালে তিনি আফজাল ও আনোয়ার উভয়ের উপর প্রচন্ড রেগে যান এবং যুদ্ধে অংশগ্রহণের উপর নিষেধাজ্ঞা জারী করেন।[৮১৭] নৌ-কমান্ডোদের পুনরায় পলাশী ক্যাম্পে ফেরত পাঠান।[৮১৮] নৌকমান্ডোরা মংলা বন্দরে অবস্থানকারী কমান্ডোদের জন্য অতিরিক্ত মাইন বহন করে আনলেও একটি ভুল সিদ্ধান্তের কারণে তাদের প্রচুর ক্ষয়ক্ষতির সম্মুখীন হতে হয় এবং সাথে অসংখ্য নিরীহ গ্রামবাসী জীবন হারায়।[৮১৯] এই যুদ্ধে অংশ নেন কমান্ডো আলফাজ উদ্দিন, নুরুল ইসলাম, দিলীপ কুমার, আঃ ওয়াদুদ মিয়া, মুজিবর রহমান, আমজাদুল হোসেন, জবেদ আলী প্রমুখ।[৮২০]

তালা উপজেলা

৩.৩১ বারাত যুদ্ধ

বারাত সাতক্ষীরা জেলার তালা উপজেলার একটি গ্রাম। তালা উপজেলা থেকে ৭ কি.মি. পশ্চিমে এবং পাটকেলঘাটা বাজার থেকে প্রায় ৫ কি.মি. পূর্বদিকে বারাত গ্রামের অবস্থান।[৮২১] সাতক্ষীরা খুলনা মহাসড়কের দক্ষিণ পাশে অবস্থিত হাজারী পদ দাসের বাড়িতে মোহাম্মদ আব্দুস সোবহানের নেতৃত্বে ১৩ জন মুক্তিযোদ্ধা এসে ঘাঁটি স্থাপন করে।[৮২২] ধীরে ধীরে তাঁরা পার্শ্ববর্তী গ্রামের লোকদের গেরিলা বাহিনীতে সম্পৃক্ত করে এবং

[৮১৪] সাক্ষাৎকার, মুক্তিযোদ্ধা এস.এম. লিয়াকত আলী, শ্যামনগর। ২৪/১২/২০১৪ নকিপুর।
[৮১৫] সাক্ষাৎকার, মুক্তিযোদ্ধা দেবী রঞ্জন মন্ডল, উপজেলা মুক্তিযোদ্ধা কমান্ডার, শ্যামনগর। ২৪/১২/২০১৪ শ্যামনগর।
[৮১৬] সাক্ষাৎকার, মুক্তিযোদ্ধা দেবী রঞ্জন মন্ডল, উপজেলা মুক্তিযোদ্ধা কমান্ডার, শ্যামনগর।
[৮১৭] সাক্ষাৎকার, মুক্তিযোদ্ধা দেবী রঞ্জন মন্ডল, উপজেলা মুক্তিযোদ্ধা কমান্ডার, শ্যামনগর।
[৮১৮] সাক্ষাৎকার, মুক্তিযোদ্ধা গাজী আবুল হোসেন, সহকারি কমান্ডার, শ্যামনগর, উপজেলা মুক্তিযোদ্ধা কমান্ড।
[৮১৯] সাক্ষাৎকার, মুক্তিযোদ্ধা গাজী আবুল হোসেন।
[৮২০] সাক্ষাৎকার, মুক্তিযোদ্ধা গাজী আবুল হোসেন।
[৮২১] সাক্ষাৎকার, মুক্তিযোদ্ধা মোঃ আব্দুস সোবহান, মুক্তিযোদ্ধা কমান্ডার, বারাত, তালা, সাতক্ষীরা। ১০/১২/২০১৪ বারাত।
[৮২২] সাক্ষাৎকার, মুক্তিযোদ্ধা মোঃ আব্দুস সোবহান, মুক্তিযোদ্ধা কমান্ডার, বারাত, তালা, সাতক্ষীরা।

দেশ মাতৃকাকে হানাদার মুক্ত করতে অস্ত্র প্রশিক্ষণ দেয়। মুক্তিবাহিনীর কমান্ডোর আব্দুস সোবহানের নেতৃত্বে একটি গোয়েন্দা টিম গঠিত হয়।[৮২৩] ৩ অক্টোবর মঙ্গলবার সকাল বেলা এলাকার গৃহ শিক্ষক এবং মুক্তিবাহিনীর গোয়েন্দা নীহাররঞ্জন পালকে পাটকেলঘাটা অভিমুখে পাঠানো হয় রাজাকারদের গতিবিধি জানার জন্য।[৮২৪] মুক্তিবাহিনীর কাছে তথ্য ছিল রাজাকার বাহিনী অত্র ক্যাম্প আক্রমণ করবে। দুর্ভাগ্যক্রমে নীহাররঞ্জন পথ মধ্যে রাজাকার বাহিনীর কাছে ধরা পড়ে।[৮২৫] রাজাকার বাহিনী তাঁকে সঙ্গে নিয়ে বারাত ক্যাম্পের দিকে অগ্রসর হতে থাকে। ক্যাম্পের কাছাকাছি আসলে মুক্তিবাহিনীর নিরাপত্তা রক্ষীদের নজরে পড়ে।[৮২৬] রাজাকার বাহিনী বারাত ক্যাম্পের দিকে অগ্রসর হতে থাকে। বীর মুক্তিযোদ্ধাদের প্রশিক্ষণ কাজে লাগানোর সময় আসলেও সবার সামনে ছিল গোয়েন্দা নীহাররঞ্জন পাল। অপঃপর কৌশল গ্রহণের মাধ্যমে কমান্ডার সোবহানের নেতৃত্বে শুরু হয় কাঙ্খিত যুদ্ধ।[৮২৭] অতর্কিত আক্রমণে রাজাকার মিলিশিয়া বাহিনী প্রথমে ঘাবড়ে যায় তারপরও তারা আক্রমণ অব্যাহত রাখে। পাটকেলঘাটা এবং তালার রাজাকার বাহিনী খবর পেয়ে এই যুদ্ধে যোগ দেয় এবং বেপরোয়া গুলিবর্ষণ করতে থাকে। রাজাকারদের কাছে মুক্তিবাহিনীর সংখ্যা ছিল অজানা। মুক্তিবাহিনী তাদের বাঙ্কারে থাকায় বিশেষ সুবিধা পায়। মুক্তিবাহিনী একটি ফায়ার করলে রাকাজারবাহিনী গুলি ছোড়ে কয়েকশ। দুপুর গড়িয়ে পড়ে গোলাগুলি চলতে থাকে সন্ধ্যা পর্যন্ত। এই যুদ্ধে ৪ জন রাজাকার নিহত হয়।[৮২৮] এই যুদ্ধে রাজাকাররা ৩০৩ রাইফেল ব্যবহার করে পক্ষান্তরে মুক্তিযোদ্ধারা রাইফেল, এস.এল.এম ও গ্রেনেড ব্যবহার করে, মুক্তিবাহিনীর কোন সদস্য হতাহত হয়নি। নীহাররঞ্জন অলৌকিক ভাবে বেঁচে যান এবং পরবর্তীতে মুক্তিযুদ্ধে যোগদান করেন।[৮২৯] এই যুদ্ধে যারা বীর বিক্রমে লড়াই করেন তারা হলেন- লুৎফর রহমান, রমজান আলী, সন্তোষ কুমার দাস, সাহাবুদ্দিন শেখ, ঈমান আলী গাজী, রইচ উদ্দিন, নজির আহমেদ মোড়ল, মকবুল ইসলাম মোড়ল, বিজয় কৃষ্ণপাল, আতাউর রহমান ও মতিয়ার রহমান।[৮৩০] কমান্ডার আব্দুস সোবহানের রণকৌশলে বিরাট রাজাকার বাহিনী পরাজিত ও পিছু হটে যায়। পরের দিন পাকিস্তানী সেনাএবং রাজাকারদের মিলিত বাহিনী বারাত গ্রামে ঢুকে বহু ঘরবাড়ি পুড়িয়ে দেয়।[৮৩১] মুক্তিযোদ্ধারা কোনরুপ সংঘর্ষে না গিয়ে বারাত ক্যাম্প ছেড়ে প্রায় ১৫ কি.মি. দক্ষিণে মাদরা ক্যাম্পে গিয়ে অবস্থা নেয়।[৮৩২]

---

[৮২৩] সাক্ষাৎকার, মুক্তিযোদ্ধা সন্তোষ কুমার দাস। ১০/১২/২০১৪ বারাত।
[৮২৪] সাক্ষাৎকার, মুক্তিযোদ্ধা সন্তোষ কুমার দাস।
[৮২৫] সাক্ষাৎকার, মুক্তিযোদ্ধা মোঃ আব্দুস সোবহান, মুক্তিযোদ্ধা কমান্ডার।
[৮২৬] সাক্ষাৎকার, মুক্তিযোদ্ধা মোঃ আব্দুস সোবহান, মুক্তিযোদ্ধা কমান্ডার।
[৮২৭] সাক্ষাৎকার, মুক্তিযোদ্ধা মোঃ আব্দুস সোবহান, মুক্তিযোদ্ধা কমান্ডার।
[৮২৮] সাক্ষাৎকার, মুক্তিযোদ্ধা সন্তোষ কুমার দাস।
[৮২৯] সাক্ষাৎকার, মুক্তিযোদ্ধা সন্তোষ কুমার দাস।
[৮৩০] সাক্ষাৎকার, মুক্তিযোদ্ধা সন্তোষ কুমার দাস।
[৮৩১] সাক্ষাৎকার, মুক্তিযোদ্ধা সন্তোষ কুমার দাস।
[৮৩২] সাক্ষাৎকার, মুক্তিযোদ্ধা সন্তোষ কুমার দাস।

তালা উপজেলা

৩.৩২ বালিয়াদহা যুদ্ধ

সাতক্ষীরা জেলার তালা উপজেলার ৮ নম্বর মাগুরা ইউনিয়নের একটি গ্রাম বালিয়াদহা। এটি তালা উপজেলা থেকে প্রায় ৮ কি.মি. দক্ষিণ পশ্চিমে অবস্থিত। এই গ্রামের একটি পোড়া বাড়িতে মুক্তিযোদ্ধারা তাদের ক্যাম্প গড়ে তোলে।[৮৩৩] সকাল বেলা গুপ্তচর মারফত খবর আসে পাটকেলঘাটা থেকে একদল সশস্ত্র রাজাকার বালিয়াদহা মুক্তিযোদ্ধা ক্যাম্প আক্রমণের জন্য অগ্রসর হচ্ছে। খবর পাওয়ায় মুক্তিযোদ্ধারা পথে পাহারা বসায়। এই ক্যাম্পের কমান্ডার ছিলেন মোড়ল আব্দুস সালাম, মোল্লা মনোয়ার হোসেন।[৮৩৪] এই ক্যাম্পে মুক্তিযোদ্ধাদের সংখ্যা ছিল প্রায় ২৯ জন।[৮৩৫] ২৬শে অক্টোবর রাজাকার ইমান আলী শেখ ও রাজাকার সিরাজের নেতৃত্বে তাদের একটি বাহিনী স্থানীয় জাহান আলী পাড়ের বাড়িতে এসে ওঠে।[৮৩৬] রাজাকার বাহিনী বালিয়াদহা মসজিদের পাশে পজিশন নেয়। অন্যদিকে মুক্তিযোদ্ধারা বালিয়াদহা বাজারের পাশে সরকারি পুকুর পাড়ে পজিশন নেয়। রাজাকার বাহিনী অগ্রবর্তী হয়ে প্রথমে আক্রমণ চালায়। মুক্তিযোদ্ধারা ধীরে ধীরে গুলি চালাতে থাকে। রাজাকারগণ ভীত সন্ত্রস্ত হয়ে পড়ে কারণ বেপরোয়া গুলিবর্ষণের ফলে তাদের রসদ দ্রুত ফুরিয়ে যায়। রাজাকাররা পিছাতেও পারে না, সম্মুখে অগ্রসর ও হতে পারে না। মুক্তিযোদ্ধারা তাদের আক্রমণ ধীরে ধীরে বাড়াতে থাকে। প্রচন্ড গোলাগুলিতে আকাশ বাতাস প্রকম্পিত হতে থাকে। প্রায় এক ঘন্টা ব্যাপী গোলাগুলি চালিয়ে রাজাকার পিছু হটে যায়।[৮৩৭] বালিয়াদহ অভিযানের পথে তারা কয়েকটি হিন্দু বাড়ি লুট করে।[৮৩৮] পালিয়ে যাওয়ার সময় তারা কয়েকজন গুলিবিদ্ধ হয় এবং লুটকৃত মালামাল ফেলে রেখে যায়। রাজাকারবাহিনী পশ্চাদপরসন করায় মুক্তিযোদ্ধাদের মনোবল দৃঢ় হয়, মুক্তিযোদ্ধারা বুঝতে পারে শীঘ্রই বালিয়াদহ ক্যাম্প আক্রমণ করা হবে ফলে মুক্তিযোদ্ধারা নতুন করে প্রস্তুতি নিতে থাকে।[৮৩৯] মুজিব বাহিনীর কমান্ডার আব্দুস সালাম জেলা কমান্ডারের নির্দেশে অন্যত্র জরুরী অপারেশনে অংশগ্রহণের জন্য বালিয়াদহা ক্যাম্প ত্যাগ করেন।[৮৪০] মোল্লা মনোয়ার তখন ক্যাম্পের একক দায়িত্ব গ্রহণ করেন। এই ক্যাম্পের অন্যান্য সহযোগিদের মধ্যে শেখ ময়নুল ইসলাম, আব্দুল খালেক, নওফেল হোসেন, মোজাম্মেল হক, গোবিন্দ প্রমুখ।[৮৪১] এই ক্যাম্পের মুক্তিযোদ্ধারা ৪টি ভাগে বিভক্ত হয়ে তাদের রণকৌশল সাজাতে থাকে। প্রথম দলটি পাটকেলঘাটা বালিয়াদহা পথে খলিষখালীতে পজিশনে থাকে।[৮৪২] দ্বিতীয় দলটি ইসলামকাঠি, বাগমারা হয়ে

[৮৩৩] সাক্ষাৎকার, মুক্তিযোদ্ধা শেখ ময়নুল ইসলাম, চাঁদকাটি। ১০/১২/২০১৪ চাঁদকাঠি।
[৮৩৪] সাক্ষাৎকার, মুক্তিযোদ্ধা মোঃ মনোয়ারা হোসেন, যুদ্ধের কমান্ডার, বালিয়াদহা।
[৮৩৫] সাক্ষাৎকার, মুক্তিযোদ্ধা শেখ ময়নুল ইসলাম, চাঁদকাটি।
[৮৩৬] সাক্ষাৎকার, মুক্তিযোদ্ধা শেখ ময়নুল ইসলাম, চাঁদকাটি।
[৮৩৭] সাক্ষাৎকার, মুক্তিযোদ্ধা শেখ ময়নুল ইসলাম, চাঁদকাটি।
[৮৩৮] সাক্ষাৎকার, মুক্তিযোদ্ধা মোঃ মনোয়ারা হোসেন, যুদ্ধের কমান্ডার, বালিয়াদহা। ২৫/০৫/২০১৬ বালিয়াদহা।
[৮৩৯] সাক্ষাৎকার, মুক্তিযোদ্ধা মোঃ মনোয়ারা হোসেন, যুদ্ধের কমান্ডার, বালিয়াদহা।
[৮৪০] সাক্ষাৎকার, মুক্তিযোদ্ধা মোঃ মনোয়ারা হোসেন, যুদ্ধের কমান্ডার, বালিয়াদহা।
[৮৪১] সাক্ষাৎকার, মুক্তিযোদ্ধা মোঃ মনোয়ারা হোসেন, যুদ্ধের কমান্ডার, বালিয়াদহা।
[৮৪২] সাক্ষাৎকার, মুক্তিযোদ্ধা শেখ ময়নুল ইসলাম, চাঁদকাটি।

বলরাম পুরে অবস্থান করবে।[৮৪৩] তৃতীয় দলটি খলিশখালি দক্ষিণপাড়া হয়ে মঙ্গলানন্দকাটি এলাকায় অবস্থান করবে।[৮৪৪] চতুর্থ দলটি রিজার্ভ বাহিনী হিসেবে সর্বদা প্রস্তুত থাকবে।[৮৪৫] ৪ নভেম্বর সকাল ৯টার দিকে খবর আসে পাকিস্তানি মিলিটারী বাহিনী রাজাকারদের মিলিশিয়া বাহিনী একত্রিত হয়ে একটি বিরাট বাহিনী বালিয়াদহ মুক্তিবাহিনীর ক্যাম্প আক্রমণের জন্য অগ্রসর হচ্ছে।[৮৪৬] শত্রু পক্ষের বাহিনী ছিল বিরাট তাদের সঙ্গে ছিল মর্টার, এল.এম.জি, চাইনিজ রাইফেল সহ সর্বাধুনিক অস্ত্রশস্ত্র।[৮৪৭] মুক্তিযোদ্ধারা তাৎক্ষণিক সিদ্ধান্ত নিলেন আক্রমণ হবে গেরিলা কায়দায়। অর্থাৎ Hit and Run Policy: বেশ দুর থেকে মুক্তিবাহিনী কমান্ডার মনোয়ার হোসেন লক্ষ্য করেন পাকিস্তানি বাহিনী সামনে এবং রাজাকাররা পিছনে।[৮৪৮] পথ দেখানোর জন্য তারা সৈয়দ শেখ এবং মহাতাপ গাজীকে ধরে নিয়ে আসছে।[৮৪৯] পাকিস্তানী বাহিনী এবং রাজাকাররা ছিল সংখ্যায় অনেক বেশী তাছাড়া অত্যাধুনিক অস্ত্র সজ্জিত।[৮৫০] এমতাবস্থায় শত্রু বাহিনী ভিতরে ঢুকলে মুক্তিবাহিনী বড় ধরনের বিপর্জয়ের মধ্যে পড়ার আশংকায় কমান্ডার মনোয়ার ফায়ার উদ্বোধন করেন।[৮৫১] পাকিস্তানী বাহিনী ব্যাপক শেলিং করতে থাকে। যুদ্ধের এক পর্যায়ে রাজাকাররা পাশের আখক্ষেতে পালিয়ে যায়।[৮৫২] পাকিস্তানী বাহিনী বুদ্ধি হারিয়ে ফেলে। মুক্তিযোদ্ধারা গুলি করতে করতে পশ্চাদপদসরন করতে থাকে। কমান্ডার মনোয়ার তার বাহিনী নিয়ে বালিয়াদহা বিলে গিয়ে অন্য তিনটি দলের সাথে নিরাপদে মিলিত হয়।[৮৫৩] মুক্তিবাহিনীর আর কোন রকম সাড়া না পেয়ে পাকিস্তানী বাহিনী বালিয়াদহা বাজারে চলে আসে। সমস্ত বাজার এবং বাড়ি লুটপাট করে। এই গ্রামের প্রায় ৯০টি বাড়ি তারা পুড়িয়ে দেয়।[৮৫৪] খানসেনারা কে.এম.এসসি ইনষ্টিটিউশন এর অফিস বিজ্ঞানাগার ধ্বংস করে দেয়। সেখানে ১০ হাজার অধিক মূল্যের যন্ত্রপাতি ছিল। এছাড়া দরজা-জানালা, চেয়ার-টেবিল সবকিছু ধ্বংস করে দেয়।[৬৫৪ক] যে সকল রাজাকারদের চেনা যায় তাদের মধ্যে চরগ্রামের লোকমান, কৃষ্ণকাটির সিরাজ, শামসু শেখ, কানাই দিয়া গ্রামের মজিদ, চরগ্রামের গহর পাড়, তাফজ উদ্দীন শেখ, ইমান আলী শেখ উল্লেখযোগ্য।[৮৫৫] এই যুদ্ধে মুক্তিবাহিনীর কেউ হতাহত না হলেও নাজের গোলদার নামের একজন সাধারণ লোক নিহত হয়।[৮৫৬]

---

[৮৪৩] সাক্ষাৎকার, মুক্তিযোদ্ধা শেখ ময়নুল ইসলাম, চাঁদকাটি।
[৮৪৪] সাক্ষাৎকার, মুক্তিযোদ্ধা শেখ ময়নুল ইসলাম, চাঁদকাটি।
[৮৪৫] সাক্ষাৎকার, মুক্তিযোদ্ধা শেখ ময়নুল ইসলাম, চাঁদকাটি।
[৮৪৬] সাক্ষাৎকার, মুক্তিযোদ্ধা মোঃ মনোয়ারা হোসেন, যুদ্ধের কমান্ডার, বালিয়াদহা।
[৮৪৭] সাক্ষাৎকার, মুক্তিযোদ্ধা মোঃ মনোয়ারা হোসেন, যুদ্ধের কমান্ডার, বালিয়াদহা।
[৮৪৮] সাক্ষাৎকার, মুক্তিযোদ্ধা মোঃ মনোয়ারা হোসেন, যুদ্ধের কমান্ডার, বালিয়াদহা।
[৮৪৯] সাক্ষাৎকার, মুক্তিযোদ্ধা মোঃ মনোয়ারা হোসেন, যুদ্ধের কমান্ডার, বালিয়াদহা।
[৮৫০] সাক্ষাৎকার, মুক্তিযোদ্ধা মোঃ মনোয়ারা হোসেন, যুদ্ধের কমান্ডার, বালিয়াদহা।
[৮৫১] সাক্ষাৎকার, মুক্তিযোদ্ধা শেখ ময়নুল ইসলাম, চাঁদকাটি।
[৮৫২] সাক্ষাৎকার, মুক্তিযোদ্ধা শেখ ময়নুল ইসলাম, চাঁদকাটি।
[৮৫৩] সাক্ষাৎকার, মুক্তিযোদ্ধা শেখ ময়নুল ইসলাম, চাঁদকাটি।
[৮৫৪] সাক্ষাৎকার, মুক্তিযোদ্ধা শেখ ময়নুল ইসলাম, চাঁদকাটি।
৬৫৪ক সাক্ষাৎকার, শেখ রেজাউল করিম, প্রধান শিক্ষক, কে.এম.এসসি ইনষ্টিটিউশন, তালা, সাতক্ষীরা। ২৬/০৫/২০১৬ বালিয়াদহা।
[৮৫৫] সাক্ষাৎকার, মুক্তিযোদ্ধা মোঃ মোজাম্মেল হক। ২৬/০৫/২০১৬ বালিয়াদহা।
[৮৫৬] সাক্ষাৎকার, মুক্তিযোদ্ধা মোঃ মোজাম্মেল হক।

তালা উপজেলা

৩.৩৩ মাগুরা যুদ্ধ

সাতক্ষীরা জেলার তালা উপজেলা সদর থেকে প্রায় ৪ কি.মি. দক্ষিণ পশ্চিমে কপোতাক্ষ নদীর তীরে ঐতিহ্যবাহী মাগুরা গ্রাম। মুজিব বাহিনীর ক্যাম্পটা অত্র গ্রামের একজন ধনাঢ্য ব্যক্তি অজয় রায় চৌধুরী ওরফে ঝুনু বাবুর বাড়িতে গড়ে ওঠে।[৮৫৭] এই ক্যাম্পের দায়িত্ব পালন করেন প্রখ্যাত ছাত্রনেতা মোঃ ইউনুছ আলী ইনু যিনি খুলনা সদর মহকুমা মুজিব বাহিনীর প্রধান ছিলেন।[৮৫৮] তিনি মাগুরা পীর সাহেবের মাজারের খাদেম সহ অন্যান্যদের সাথে সুসম্পর্ক রেখে গোপনে বিভিন্ন কার্যবলী পরিচালনা করতেন মাজারের পাশে আব্দুল মান্নানের বাড়িতে ও মুক্তিযোদ্ধারা অবস্থান করতেন।[৮৫৯] স.ম. বাবর আলী, কালাম সহ কয়েকজন মুক্তিযোদ্ধা কপিলমুনি রাজাকার ঘাঁটি আক্রমণের সম্পর্কে কিছু গুরুত্বপূর্ণ আলোচনার জন্য মাগুরায় আসে এবং মুক্তিবাহিনী ক্যাম্পে বসে পরিকল্পনা শুরু করে।[৮৬০] মুক্তিযুদ্ধে ঝুনু বাবু মুক্তিবাহিনীকে বিভিন্ন ভাবে সাহায্য সহযোগিতা করতো। ১৯ নভেম্বর ঝুনু বাবু কয়েকজন যুবক নিয়ে ভারতের উদ্দেশ্যে যাত্রা করেন কিন্তু পাটকেলঘাটার কাছাকাছি আসলে রাজাকার বাহিনী তাকে ধরে মিলিটারী ক্যাম্পে নিয়ে আসে।[৮৬১] রাজাকার ও মিলিটারীদের নির্মম অত্যাচারে তার বাড়িতে মুজিব বাহিনীর ক্যাম্প আছে এটি ফাঁস করে দেন।[৮৬২] মুক্তিযোদ্ধাদের কাছে তেমন কোন ভারী অস্ত্রশস্ত্র নেই, শুধুমাত্র নিজেদের নিরাপত্তার জন্য স্টেনগান, এল.এম.জি, আর রিভলভার আছে কিন্তু সেগুলো গোপনীয়তা রক্ষার জন্য ইউনুসের বাসায় রাখা আছে ২৫ নভেম্বর বিকেল বেলা মুক্তিযোদ্ধারা গোলাগুলির আওয়াজ পায়, সেই মুহূর্তে মাগুরা বাজার পোস্ট অফিসের পিয়ন আব্দুল জব্বার এসে মুক্তিযোদ্ধাদেরকে খুব দ্রুত নিরাপদ স্থলে আশ্রয় নেওয়ার জন্য বলে, কারণ পাকিস্তানী হানাদার বাহিনী তাদের ক্যাম্পের সন্ধান পেয়ে গেছে।[৮৬৩] আব্দুল জব্বার মুক্তিবাহিনীর অনেক বিশ্বাসী গোয়েন্দা, অন্যদিকে রাজাকার ক্যাম্পে তার অবারিত যাতায়াত ছিল।[৮৬৪] সে কৌশলে রাজাকারদের সাথে ভাল সম্পর্ক বজায় রেখে বিভিন্ন খবরা খবর মুক্তিবাহিনীদের জানাতো। রাজাকাররা ঝুনু বাবুকে সাথে আনছে এটি শুনে মুক্তিযোদ্ধারা হতবাক হয়ে পড়ে।[৮৬৫] বিকেল ৫ টার দিকে পাকিস্তানী বাহিনীর অস্বাভাবিক আগমনে মুক্তিযোদ্ধাদের কেউ কেউ পাশের খালের ভেড়িতে পজিশন নেয়, আবার কয়েকজন পাশ্ববর্তী

[৮৫৭] সাক্ষাৎকার, মুক্তিযোদ্ধা অধ্যাপক সুভাষ চন্দ্র সরকার (গোয়ালপোতা), যুদ্ধে অংশগ্রহণকারী মুক্তিযোদ্ধা ।৫/৬/২০১৬ মাগুরা বাজার।
[৮৫৮] সাক্ষাৎকার, মুক্তিযোদ্ধা শেখ সামছুর রহমান, যুদ্ধে অংশগ্রহণকারী মুক্তিযোদ্ধা।
[৮৫৯] সাক্ষাৎকার, মুক্তিযোদ্ধা অনাথ বন্দু মন্ডল, যুদ্ধে অংশগ্রহণকারী মুক্তিযোদ্ধা।
[৮৬০] সাক্ষাৎকার, মুক্তিযোদ্ধা কল্যাণ কুমার মন্ডল, যুদ্ধে অংশগ্রহণকারী মুক্তিযোদ্ধা। ৫/৬/২০১৬ মাগুরা বাজার।
[৮৬১] সাক্ষাৎকার, মুক্তিযোদ্ধা কল্যাণ কুমার মন্ডল, যুদ্ধে অংশগ্রহণকারী মুক্তিযোদ্ধা। ৫/৬/২০১৬ মাগুরা বাজার।
[৮৬২] সাক্ষাৎকার, মুক্তিযোদ্ধা গৌর পদ মন্ডল, মাগুরাডাঙ্গা, যুদ্ধে অংশগ্রহণকারী মুক্তিযোদ্ধা। ৫/৬/২০১৬ মাগুরা বাজার।
[৮৬৩] সাক্ষাৎকার, মুক্তিযোদ্ধা কল্যাণ কুমার মন্ডল, যুদ্ধে অংশগ্রহণকারী মুক্তিযোদ্ধা।
[৮৬৪] সাক্ষাৎকার, মুক্তিযোদ্ধা শেখ সামছুর রহমান, যুদ্ধে অংশগ্রহণকারী মুক্তিযোদ্ধা।
[৮৬৫] সাক্ষাৎকার, মুক্তিযোদ্ধা শেখ ময়নুল ইসলাম, যুদ্ধে অংশগ্রহণকারী মুক্তিযোদ্ধা।

ধানক্ষেতে আশ্রয় নেয়।[৮৬৬] শেখ শামসুর রহমান এবং নুরুজ্জামান ওরফে মন্টু, শেখ মোর্তুজা আলী ও মকবুল হোসেন মিলে এল.এম.জি নিয়ে সাবধানে সুবিধাজনক স্থানে ওত পেতে বসে থাকে।[৮৬৭] কয়েক মিনিটের মধ্যে খানসেনা ও রাজাকাররা এসে এলোপাতাড়ি গুলি ছুড়া শুরু করে। এই যুদ্ধের নেতৃত্ব দেন সুভাষ চন্দ্র সরকার এদিকে নুরুজ্জামান মন্টু দুঃসাহসিকভাবে তার এল.এম.জি দিয়ে ফায়ার করা শুরু করে এবং প্রায় দুঘন্টা ধরে উভয়পক্ষেই গুলি বিনিময় হয়।[৮৬৮] কিন্তু নুরুজ্জামান মন্টু হঠাৎ পাকিস্তানী হানাদারদের একটি গুলিতে মারাত্মক আহত হয় এবং সে এল.এম.জি টা সাথে নিয়ে গড়াতে গড়াতে একটা নালার ধারে উপস্থিত হয়।[৮৬৯] সন্ধ্যা হয়ে আসায় গোলাগুলি বন্ধ করে খানসেনারা চলে যাবার পর মুক্তিযোদ্ধারা ক্যাম্পে ফিরে আসে। কিন্তু এ যুদ্ধে বীর মুক্তিযোদ্ধা সুশীল, বক্কার ও আজিজ শহীদ হন।[৮৭০] গভীররাতে এই তিনজন শহীদকে সামরিক কায়দার শেষ শ্রদ্ধা নিবেদন করে মাগুরায় রঞ্জন মন্ডলের জমির বাঁশতলায় আজিজ ও বক্কারকে একটা কবরে এবং সুশীলকে অন্য একটা কবর খুড়ে মাটি দেওয়া হয়।[৮৭১] এই দিন মুক্তিবাহিনীর কোন যুদ্ধের পরিকল্পনা না থাকায় তারা বেশীর ভাগ মুক্তিযোদ্ধাদের দক্ষিণ দিকে পাঠিয়ে দিয়ে কয়েক জন মাত্র পাকিস্তানী সেনাদের মোকাবেলা করার দায়িত্ব নেন। যাঁরা প্রাণপণে যুদ্ধ করে অন্যদের নিরাপদ স্থানে যেতে জীবনের ঝুঁকি নেন তাদের মধ্যে অন্যতম হলেন- নুরুজ্জামান মন্টু, সুভাষ চন্দ্র সরকার, কল্যাণ কুমার মন্ডল, কার্ত্তিক চন্দ্র নাথ, অতুল মন্ডল, অচিন্ত্য পাল, রমেশ সরকার, নুরুল ইসলাম।[৮৭২] বক্কার যখন মারা যায় তখন সুভাষ সরকারকে বলেন, দাদা মারা যাচ্ছি, বাড়িতে খবর দেবেন আমি কাপুরুষের পরিচয় দিইনি, দেশ একদিন স্বাধীন হবে, দেশের জন্য প্রাণ দান করলাম, আমার কিছু চাওয়ার নেই এটাই ছিল বক্কারের শেষ কথা।[৮৭৩] যুদ্ধ যখন শেষ হয় তখন সুভাষ চন্দ্র সরকারের কাছে আর মাত্র ২টি গুলি অবশিষ্ঠ ছিল।[৮৭৪] মাগুরা যুদ্ধে মুক্তিবাহিনীর এ বীরত্ব গাথা অবদান ইতিহাসে চির স্মরণীয়।

উপসংহারঃ

সাতক্ষীরার রনাঙ্গনে পাকিস্তানী হানাদার বাহিনী এবং তাদের সহযোগী রাজাকার বাহিনীর বিরুদ্ধে মুক্তিকামী জনতা প্রায় নয় যুদ্ধ করে। উল্লেখযোগ্য যুদ্ধ সমূহ হল-মাগুরার যুদ্ধ, কাকডাঙ্গার যুদ্ধ, টাউন শ্রীপুরের যুদ্ধ ইত্যাদি। যুদ্ধে পরাজয় যখন ঘনিয়ে আসে তখন তারা পিছু হটে খুলনায় গিয়ে ১৭ ডিসেম্বর ১৯৭১ ভারতীয় মিত্র বাহিনীর কাছে আত্ম সমর্পন করে।

---

[৮৬৬] সাক্ষাৎকার, মুক্তিযোদ্ধা অধ্যাপক সুভাষ চন্দ্র সরকার (গোয়ালপোতা), যুদ্ধে অংশগ্রহণকারী মুক্তিযোদ্ধা।
[৮৬৭] সাক্ষাৎকার, মুক্তিযোদ্ধা অধ্যাপক সুভাষ চন্দ্র সরকার (গোয়ালপোতা), যুদ্ধে অংশগ্রহণকারী মুক্তিযোদ্ধা।
[৮৬৮] সাক্ষাৎকার, মুক্তিযোদ্ধা অধ্যাপক সুভাষ চন্দ্র সরকার (গোয়ালপোতা), যুদ্ধে অংশগ্রহণকারী মুক্তিযোদ্ধা।
[৮৬৯] সাক্ষাৎকার, মুক্তিযোদ্ধা অধ্যাপক সুভাষ চন্দ্র সরকার (গোয়ালপোতা), যুদ্ধে অংশগ্রহণকারী মুক্তিযোদ্ধা।
[৮৭০] সাক্ষাৎকার, মুক্তিযোদ্ধা শেখ সামছুর রহমান, যুদ্ধে অংশগ্রহণকারী মুক্তিযোদ্ধা।
[৮৭১] সাক্ষাৎকার, মুক্তিযোদ্ধা শেখ সামছুর রহমান, যুদ্ধে অংশগ্রহণকারী মুক্তিযোদ্ধা।
[৮৭২] সাক্ষাৎকার, রঞ্জন মন্ডল, মাগুরা, তালা, সাতক্ষীরা। ৬/৬/২০১৬ মাগুরা।
[৮৭৩] সাক্ষাৎকার, রঞ্জন মন্ডল, মাগুরা, তালা, সাতক্ষীরা।
[৮৭৪] সাক্ষাৎকার, রঞ্জন মন্ডল, মাগুরা, তালা, সাতক্ষীরা।

চতুর্থ অধ্যায়

গণহত্যা ও বিজয়

ভূমিকাঃ

১৯৭১ সালের ২৫ মার্চ রাতে পাকিস্তানী হানাদার বাহিনী যে গণহত্যা শুরু করে তা ১৬ ডিসেম্বর আত্মসমর্পণ পর্যন্ত চালিয়ে যায়। পাকিস্তানী হানাদার বাহিনীকে একাজে যে সকল ধর্মভিত্তিক রাজনৈতিক দল সহযোগিতা করে তার মধ্যে জামায়াতে ইসলামী ও মুসলিম লীগ অন্যতম এবং এদের পৃষ্ঠ পোষকতায় গড়ে ওঠে রাজাকার, আলবদর, আল সামস, পিস কমিটি সহ বিভিন্ন সংগঠন। তারা সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের মানুষ, বামপন্থী রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব, আওয়ামী লীগ অনুসারী, সংস্কৃতি মনা ব্যক্তি, মুক্তিযুদ্ধে যোগদানকারী পরিবারের লোকদের নিশ্চিহ্ন করার ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হয়। তারা সর্বত্র লুটপাট, অগ্নিসংযোগ, ধর্ষণ এবং নারকীয় গণহত্যা চালায়। দলে দলে মানুষ তাদের বাস্তুভিটা ফেলে ভারতে চলে যায়। যুদ্ধের শুরুতে বামপন্থী রাজনৈতিক দলের নেতারা যে প্রাথমিক প্রতিরোধ গড়ে তোলে পাকিস্তানী হানাদার বাহিনীর আক্রমণের মুখে তা ভেঙ্গে যায় এদেশের স্বাধীনতা কামী নেতৃত্ব স্থানীয় ব্যক্তি বর্গ দীর্ঘস্থায়ী যুদ্ধের প্রস্তুতির জন্য ভারতে চলে গেলে রাজনৈতিক আঙ্গনে শূন্যতার সৃষ্টি হয়। এ সুযোগ স্বাধীনতা বিরোধী কতিপয় বাঙালি পাকিস্তানী হানাদার সহযোগিতায় নির্মম হত্যাযজ্ঞে মেতে ওঠে। ১৯ এপ্রিল ১৯৭১ পাকিস্তানী হানাদার বাহিনীর বিশাল কনভয় সর্বপ্রথম সাতক্ষীরায় পৌছায়। তাদের সাথে যুক্ত হয় সাতক্ষীরা মহকুমা রাজাকার বাহিনীর কমান্ডার জয়নুদ্দীন আহমদ, আব্দুল্লাহেল বাকী, ইছাহাক আলীর বিশাল শক্তিশালী রাজাকার বাহিনী। সাতক্ষীরা ভারতের সামান্ত বর্তী অঞ্চল হওয়ায় দেশের পূর্বাঞ্চলের মানুষ এ পথ দিয়ে ভারতে শরণার্থী হতে থাকে। যাদের পথমধ্যেই হত্যা করা হতো। এ অধ্যায়ের সাতক্ষীরা জেলার গণহত্যা ও নির্যাতনের উপজেলা ভিত্তিক চিত্র তুলে ধরা হল।

শ্যামনগর উপজেলা

৪.১ হরিনগর বাজারের গণহত্যা

১৯৭১ সালের ৩ সেপ্টেম্বর মুক্তিযুদ্ধের গেরিলা বাহিনী, নৌবাহিনীর সাথে শ্যামনগর উপজেলার চুনকুড়ি নদীতে পাকিস্তানী সেনাদের সাথে ব্যাপক যুদ্ধ সংঘটিত হয়।[৮৭৫] পর পর দুইদিন সংঘটিত এই যুদ্ধে পাকিস্তানী সেনাবাহিনী পিছু হটতে বাধ্য হয়। ২য় যুদ্ধের দিন স্থানীয় বীর মুক্তিযোদ্ধা নবাব্দি ফকির, তার

[৮৭৫] সাক্ষাৎকার, দেবী রঞ্জন মন্ডল, গ্রাম- গোবিন্দপুর, শ্যামনগর, সাতক্ষীরা। ১২/১২/২০১৪ হরিনগর, সাতক্ষীরা।

বিরাট বাহিনী নিয়ে পাকিস্তানী সেনাদের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে।[৮৭৬] যুদ্ধরত খানসেনারা কৈখালী এলাকা থেকে পিছু হটতে হটতে হরিনগর বাজার এলাকায় চলে আসে। অতঃপর সেপ্টেম্বর মাসের ৯ তারিখে তারা হরিনগর বাজারে স্থানীয় রাজাকারদের সাথে নিয়ে সাধারণ মানুষের উপর অতর্কিত হামলা করে এবং সব দোকান পাটে আগুন লাগিয়ে দেয়।[৮৭৭] এই হামলায় বহু মানুষ নিহত হয়। নিহতের মধ্যে ২৮ জনের পরিচয় জানা সম্ভব হয়।[৮৭৮] অগ্নিসংযোগের ফলে মানুষ দিশেহারা হয়ে ছুটাছুটি করতে থাকে। অগ্নিসংযোগের পূর্বে রাজাকার বাহিনী দোকান পাট লুটপাট করে। এ ঘটনার শেষে হরিনগর বাজারের রাস্তায় এবং নদীতে পড়ে থাকে শুধু লাশ আর লাশ।[৮৭৯] নিহতদের মধ্যে যাদের পরিচয় পাওয়া গেছে তারা হলেন- গিরিন মন্ডল, বাবুরাম মন্ডল, মনোরঞ্জন মন্ডল, বৈষ্ণব মন্ডল, সকলেই হরিনগর গ্রামের বাসিন্দা, সুরেন্দ্রনাথ মন্ডল, যোগেন্দ্র মন্ডল, খগেন্দ্র মন্ডল, রামেশ্বর মন্ডল, কালীপদ মন্ডল, কার্ত্তিক চন্দ্র মন্ডল, হরেন্দ্রনাথ মন্ডল, মহাদেব মন্ডল, ডাঃ বিহারী মন্ডল, অধীর মন্ডল, বিপিন মন্ডল, অধর মন্ডল, বিপিন পাঠান, মহাদেব চন্দ্র মন্ডল, ধীরেন্দ্রনাথ বিশ্বাস, মহাদেব কুমার মন্ডল, অধীর মন্ডল, উপনচাঁদ মন্ডল, দাউদ গাজী, আদম গাজী, আব্দুল বারী সানা, সৈয়দ গাজী, সর্বসাং-হরিনগর এবং কৃষ্ণপদ গাইন, সর্বসাং- মুন্সীগঞ্জ, শ্যামনগর, সাতক্ষীরা।[৮৮০]

৪.২ কাতখালীতে গণহত্যা

কাতখালীর চুনা নদীটি অবস্থিত ২ নম্বর কাশিমাড়ী ইউনিয়ন এবং ৩ নম্বর শ্যামনগর ইউনিয়নের সীমানাস্থলে। সেপ্টেম্বর মাসের মাঝামাঝি সময়ে বিভিন্ন অঞ্চল থেকে শরণার্থীগণ পাকিস্তানী বাহিনীর অত্যাচারে চুনা নদী দিয়ে ভারতের উদ্দেশ্যে পাড়ি জমাতে থাকে। কাতখালীর ব্রিজ সংলগ্ন এলাকায় আসলে স্থানীয় রাজাকাররা এবং পাকিস্তানী বাহিনী মিলিত হয়ে নিরস্ত্র এসব মানুষের উপর নির্বিচারে গুলিবর্ষণ করে এবং বেয়নেট দিয়ে খুচিয়ে খুচিয়ে তাদের হত্যা করে।[৮৮১] শত শত লোককে তারা হত্যা করার পর ব্রিজ সংলগ্ন বিলের মধ্যে ফেলে রেখে দেয়। এতবেশি সংখ্যক মানুষ এখানে হত্যা করা হয়েছিল যে, তাদের সঠিক সংখ্যা নির্ণয় করা সম্ভব হয়নি।[৮৮২] সাতক্ষীরার প্রত্যন্ত অঞ্চলের এই নিভৃত পল্লীর বধ্যভূমি সংরক্ষণের অভাবে বিলীন হয়ে গেছে।

[৮৭৬] সাক্ষাৎকার, গাজী আবুল হোসেন, গ্রাম- নকিপুর, শ্যামনগর, সাতক্ষীরা। ১২/১২/২০১৪ হরিনগর, সাতক্ষীরা।
[৮৭৭] সাক্ষাৎকার, মাস্টার নজরুল ইসলাম, গ্রাম- নকিপুর, শ্যামনগর, সাতক্ষীরা। ১২/১২/২০১৪ হরিনগর, সাতক্ষীরা।
[৮৭৮] সাক্ষাৎকার, এন্তাজ আলী, গ্রাম- চন্ডীপুর, শ্যামনগর, সাতক্ষীরা। ১২/১২/২০১৪ হরিনগর, সাতক্ষীরা।
[৮৭৯] ঐ।
[৮৮০] সাক্ষাৎকার, দেবী রঞ্জন জোয়ারদার, গ্রাম- হরিনগর, মুন্সীগঞ্জ, শ্যামনগর, সাতক্ষীরা। ১২/১২/২০১৪ হরিনগর, সাতক্ষীরা।
[৮৮১] সাক্ষাৎকার, গাজী আবুল হোসেন, গ্রাম- নকিপুর, শ্যামনগর, সাতক্ষীরা। ১৫/১২/২০১৪ কাতখালী, সাতক্ষীরা।
[৮৮২] সাক্ষাৎকার, এন্তাজ আলী, গ্রাম- চন্ডীপুর, শ্যামনগর, সাতক্ষীরা। ১৫/১২/২০১৪ কাতখালী, সাতক্ষীরা।

দেবহাটা উপজেলা

৪.৩ ইছামতি নদীতে গণহত্যা

১৯৭১ সালের ১৯ এপ্রিল সাতক্ষীরা শহরে প্রথম পাকিস্তানী আর্মি এসে তাদের ক্যাম্প স্থাপন করে। তারপর স্থানীয় রাজাকাররা দেবহাটাতে পাকিস্তানী সেনাদের আরেকটি ক্যাম্প স্থাপন করতে সহযোগিতা করে।[৮৮৩] দেবহাটা উপজেলা অবস্থিত ভারতের সীমান্তবর্তী এলাকায়। বাগেরহাটের রামপাল, মংলা, খুলনা, পাইকগাছা, গদাইপুর, শ্রীউলা, প্রভৃতি অঞ্চল থেকে সংখ্যালঘু শরণার্থীরা প্রায় ৫০-৬০টি বিরাট বড় নৌকা করে তাদের ভিটামাটি ফেলে ভারতে যাচ্ছিল।[৮৮৪] এপ্রিল মাসের ২৬ তারিখে দেবহাটা উপজেলার পারুলিয়ায় পৌছালে স্থানীয় পিচ কমিটির সদস্য মোহাম্মদ আব্দুর রউফ সরদার, মোজাহার সরদার, রাজাকার মহর আলী গাজী, নজিবর সরদার, মওলানা আব্দুল হামিদ, মোহাম্মদ শওকত আলী পাকিস্তানী সেনাদের সঙ্গে নিয়ে উক্ত শরণার্থীদের উপর অতর্কিত হামলা করে। স্থানীয় মুক্তিযোদ্ধা কমান্ডার মোহাম্মদ আব্দুর রউফ বলেন, ১ হাজারের অধিক মানুষকে ঐদিন হত্যা করে নদীর জলে ভাসিয়ে দেয়া হয়।[৮৮৫]

৪.৪ খেজুর বাড়ীয়ার অগ্নিসংযোগ

১৯৭১ সালের জুন মাসের মাঝামাঝি সময়ে ৯ নম্বর সাব-সেক্টরের শাহজাহান মাস্টারের নেতৃত্বে সাতক্ষীরা কালীগঞ্জ রোডের পারুলিয়া বাজারের কাছে মুক্তিযোদ্ধারা একটি অহঃরঃধহশ সরহব বসিয়ে পাকিস্তানী হানাদার বাহিনীর কয়েকটি গাড়ী ধ্বংস করে দেয়। এতে প্রায় ২৫-৩০ জন পাকিস্তানী সেনা নিহত হয়।[৮৮৬] দেবহাটা উপজেলার পাকিস্তানী সেনাক্যাম্প থেকে পাকিস্তানী হানাদার বাহিনীর একটি বিরাট বাহিনী এসে পার্শ্ববর্তী খেজুর বাড়িয়া গ্রামে ঢুকে গান পাউডার দিয়ে ব্যাপকভাবে অগ্নিসংযোগ করে। অগ্নিসংযোগে প্রায় শতাধিক বাড়ি ভস্মীভূত হয়।[৮৮৭] আব্দুল মালেক নামে একজন গ্রামবাসীকে পাকিস্তানী হানাদার সেনারা বেয়নেট চার্চ করে হত্যা করে। অনেক সুন্দরী নারীকে সেখানে থেকে পারুলিয়া ওয়াপদা গ্যারেজে ধরে নিয়ে ধর্ষণের পর হত্যা করে। খেজুর বাড়িয়াতে একটি বধ্যভূমি রয়েছে যা বর্তমানে অরক্ষিত।[৮৮৮]

---

[৮৮৩] সাক্ষাৎকার, মোঃ আব্দুল করিম, সখীপুর, দেবহাটা, সাতক্ষীরা। ১৫/১২/২০১৫ দেবহাটা, সাতক্ষীরা।
[৮৮৪] সাক্ষাৎকার, শেখ গোলাম হোসেন, দক্ষিণ পারুলিয়া, দেবহাটা, সাতক্ষীরা। ১৫/১২/২০১৫ দেবহাটা, সাতক্ষীরা।
[৮৮৫] সাক্ষাৎকার, মোঃ আব্দুর রউফ, পারুলিয়া, দেবহাটা, সাতক্ষীরা। ১৫/১২/২০১৫ দেবহাটা, সাতক্ষীরা।
[৮৮৬] সাক্ষাৎকার, মোঃ আব্দুর রউফ, পারুলিয়া, দেবহাটা, সাতক্ষীরা। ২৫/১২/২০১৫ খেজুর বাড়িয়া, সাতক্ষীরা।
[৮৮৭] সাক্ষাৎকার, মোঃ আব্দুল করিম, সখীপুর, দেবহাটা, সাতক্ষীরা। ২৫/১২/২০১৫ খেজুর বাড়িয়া, সাতক্ষীরা।
[৮৮৮] সাক্ষাৎকার, মোঃ ইয়াছিন আলী, দেবহাটা, সাতক্ষীরা। ২৫/১২/২০১৫ খেজুর বাড়িয়া, সাতক্ষীরা।

৪.৫ টাউন শ্রীপুরের গণহত্যা

দেবহাটা উপজেলার পশ্চিম সীমান্তে ইছামতি নদীর তীরঘেষে অবস্থিত নীরব নিথর একটি গ্রাম হল টাউন শ্রীপুর। সেখানে ই.পি.আর ক্যাম্প ছিল। স্থানটি ভারতের সীমান্তবর্তী হওয়ায় সেখানের জুন মাসের প্রথম দিকে পাকিস্তানী সেনাবাহিনী অতিরিক্ত সৈন্য মোতায়েন করে। ৭ জুন সেখানে পাকিস্তানী সেনাবাহিনীর সাথে মুক্তিযোদ্ধাদের ব্যাপক যুদ্ধ সংঘটিত হয়।[৮৮৯] ৩০ জনের অধিক খানসেনা নিহত হওয়ার পর পাকিস্তানী সেনাবাহিনী পার্শ্ববর্তী এলাকা থেকে বাঙালীদের এবং পথ থেকে শরণার্থীদের ধরে হত্যা করে পার্শ্ববর্তী বিলে ফেলে দেয়।[৮৯০] স্বাধীনতা পর সেখানে অসংখ্য নর-কঙ্কাল, হাড় ও মাথার খুলি পাওয়া যায়।[৮৯১] বর্তমানে সেখানে একটি বধ্যভূমি রয়েছে। এখানে টাউন শ্রীপুরের যুদ্ধে শহীদ গোলজার হোসেনের কবর রয়েছে।[৮৯২]

৪.৬ পারুলিয়া ওয়াপদা গ্যারেজ

দেবহাটা উপজেলার পারুলিয়া ওয়াপদা গ্যারেজের অফিসে পাকিস্তানী সেনাবাহিনীর একটি ক্যাম্প স্থাপিত হয়। উক্ত ক্যাম্পে বিভিন্ন এলাকা থেকে মুক্তিযুদ্ধের স্বপক্ষের শক্তির লোকদের ধরে এনে নির্মম অত্যাচার করা হতো। তাছাড়া বিভিন্ন এলাকা থেকে ধর্মীয় সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের সুন্দরী নারীদের ধরে এনে তাদের ধর্ষণ করা হতো।[৮৯৩] ধর্ষণ কাজে যারা সহযোগিতা করত তাদের মধ্যে রাজাকার জোবেদ সানা, রাজাকার আব্দুল আজিজ, রাজাকার শেখ ফজর আলী, রাজাকার সিদ্দিক নিকারী, মওলানা রওশন আলী, রাজাকার মীর আলী গাজী, রাজাকার আবু বক্কার, রাজাকার বেলাত গাজী সহ অনেকে।[৮৯৪] বীরাঙ্গণাদের মধ্যে যাদের নাম পাওয়া গেছে শ্রীমতি সতীসাবিত্রি চক্রবর্তী, নিসতারা বেগম, ছফুরা খাতুন, মোছাঃ আছিয়া খাতুন, মোছাঃ আর্জিনা বেগম।[৮৯৫] যে দুই লক্ষ মা-বোনের সম্ভ্রমের বিনিময়ে আমাদের স্বাধীনতা অর্জিত হয়েছে ঐ সকল মা-বোন আমাদের অহংকার।

৪.৭ হাদিপুরের গণহত্যা

১৯৭১ সালের মে মাসের মাঝামাঝি সময়ে দেবহাটা উপজেলার হাদিপুর গ্রামের ঘোষপাড়ায় পাকিস্তানী বাহিনী ও রাজাকার বাহিনী একত্রিত হয়ে অতর্কিত আক্রমণ করে। পাকিস্তানী ঘাতকরা জগন্নাথপুর গ্রামের

[৮৮৯] সাক্ষাৎকার, মোঃ আব্দুর রউফ, পারুলিয়া, দেবহাটা, সাতক্ষীরা। ২৯/১২/২০১৫ টাউন শ্রীপুর, সাতক্ষীরা।
[৮৯০] সাক্ষাৎকার, শেখ গোলাম হোসেন, দক্ষিণ পারুলিয়া, দেবহাটা, সাতক্ষীরা। ২৯/১২/২০১৫ টাউন শ্রীপুর, সাতক্ষীরা।
[৮৯১] সাক্ষাৎকার, মোঃ আব্দুল করিম, সখীপুর, দেবহাটা, সাতক্ষীরা। ২৯/১২/২০১৫ টাউন শ্রীপুর, সাতক্ষীরা।
[৮৯২] সাক্ষাৎকার, মোঃ ইয়াছিন আলী, দেবহাটা, সাতক্ষীরা। ২৯/১২/২০১৫ টাউন শ্রীপুর, সাতক্ষীরা।
[৮৯৩] সাক্ষাৎকার, মোঃ আব্দুল করিম, সখীপুর, দেবহাটা, সাতক্ষীরা। ২৮/১২/২০১৫ পারুলিয়া, সাতক্ষীরা।
[৮৯৪] সাক্ষাৎকার, শেখ গোলাম হোসেন, দক্ষিণ পারুলিয়া, দেবহাটা, সাতক্ষীরা। ২৮/১২/২০১৫ পারুলিয়া, সাতক্ষীরা।
[৮৯৫] সাক্ষাৎকার, মোঃ আব্দুর রউফ, পারুলিয়া, দেবহাটা, সাতক্ষীরা। ২৮/১২/২০১৫ পারুলিয়া, সাতক্ষীরা।

গোপিনাথ ঘোষ, হাদিপুরের নরেন ঘোষ, পাগলা ঘোষ ও ভারুখালী গ্রামের ওয়াজেদ আলীকে নৃশংসভাবে হত্যা করে। পাকিস্তানী সেনারা হাদিপুর গ্রামের ১১টা বাড়িতে এবং জগন্নাথপুর গ্রামের কয়েকটি বসত বাড়িতে আগুন জ্বালিয়ে দেয়।[৮৯৬]

৪.৮ ঝাউডাঙ্গায় গণহত্যা

ঝাউডাঙ্গা বাজার, সাতক্ষীরা উপজেলার অন্তর্গত একটি গুরুত্বপূর্ণ স্থান। এটি যশোর-সাতক্ষীরা সড়কে অবস্থিত এবং বাংলাদেশ ভারত সীমান্তের কাছাকাছি অবস্থিত হওয়ায় ব্যবসা কেন্দ্র হিসাবে এর তাৎপর্য অনেক বেশি। বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধের প্রথম দিকে মুক্তিবাহিনীর দক্ষতা ততবেশি বৃদ্ধি পায়নি। ইতোমধ্যে নতুন মুজিবনগর সরকার গঠিত হয় এবং আস্তে আস্তে তারা তাদের কার্যক্রম শুরু করে। কিন্তু যুদ্ধের প্রস্তুতি ও তেমনভাবে নেওয়া হয়নি। এদিকে বাংলাদেশকে বিভিন্ন সেক্টর ভাগ করে পুরাপুরিভাবে নবম সেক্টরের কার্যক্রম তখনও শুরু হয়নি। অন্যদিকে পাকিস্তানি হানাদার, রাজাকারদের নির্মম অত্যাচারে সাধারণ মানুষের জীবন অতিষ্ট হয়ে উঠে। হানাদার বাহিনী সারাদেশ ব্যাপী ধর্ষণ, লুটপাট, বিশৃংখলা, ঘরবাড়ি আগুন লাগিয়ে দেওয়া প্রভৃতি কার্যক্রম চালিয়ে যায়। তাদের সীমাহীন অত্যাচারে জর্জরিত হয়ে আওয়ামীলীগ, ছাত্রলীগ কর্মী, হিন্দু সম্প্রদায়ের লোকজন দলে দলে ভারতে পাড়ি জমাতে থাকে নিরাপদ আশ্রয় লাভের জন্য জন্য। ২১ মে ১৯৭১ ৭ জ্যৈষ্ঠ ১৩৭৮ ঝাউডাঙ্গা বাজারে পাকিস্তানী হানাদার এক নারকীয় হত্যাযজ্ঞ চালায়।[৮৯৭] কারণ সেদিন রামপাল, দাকোপ, বাটিয়াঘাটা ও ডুমুরিয়া উপজেলার হাজার হাজার মানুষ ভারতে যাবার জন্য ঝাউডাঙ্গা বাজারে এসে উপস্থিত হয়। তারা ঝাউডাঙ্গা ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যানের বাড়ির খেজুর বাগানে এসে আশ্রয় নেয়।[৮৯৮] ঠিক সেই সময় দুটি জীপ ভর্তি খানসেনা ঝাউডাঙ্গা ব্রিজের উপর এসে থামে। পাকিস্তানী হানাদার ও কয়েকজন বিহারী অস্ত্র হাতে গাড়ী থেকে নামে এবং হঠাৎ করে এলাপাতাড়ি গুলি ছোড়া শুরু করে। এসব শরণার্থীরা তখন আতংকিত হয়ে এদিক ওদিকে দৌড়াতে থাকে। ওদিকে খানসেনারা বিরতিহীন ভাবে গুলি চালাতে থাকে। সাতক্ষীরা-কালীগঞ্জ রাস্তার উপর নির্দয়হীন ভাবে হত্যাযজ্ঞ চলতে থাকে এবং অসহায় মানুষেরা গুলি খেয়ে মরতে থাকে এবং অনেকে আহত হয়ে ছটফট করতে থাকে। যে যার মত কেবল জীবন বাঁচানোর জন্য দৌড়ে পালাতে থাকে, কাউকে দেখার বা সেবা করার সুযোগতো নেই। যে যার মত করে স্বামী-স্ত্রী, পুত্র-কন্যা, পিতা-মাতা, সহায় সম্বল ফেলে এদিক ওদিক ছুটতে থাকে। অল্প সময়ের মধ্যে লাশে লাশে পুরো ঝাউডাঙ্গা বাজার ঢাকা পড়ে। আহতের আর্তনাদ ও কান্নার রোলে আকাশ বাতাস ভারী হযে যায়। এটি বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধের ইতিহাসে এক মর্মান্তিক গণহত্যা। কিন্তু

[৮৯৬] সাক্ষাৎকার, মোঃ ইয়াছিন আলী, দেবহাটা, সাতক্ষীরা এবং সাক্ষাৎকার, মোঃ আব্দুর রউফ, পারুলিয়া, দেবহাটা, সাতক্ষীরা। ২৮/১২/২০১৫, হাদিপুর, সাতক্ষীরা।
[৮৯৭] সাক্ষাৎকার, মোঃ আবুল হোসেন, পারিকুপি, কলারোয়া, সাতক্ষীরা। ১৯/১২/২০১৫, ঝাউডাঙ্গা, সাতক্ষীরা।
[৮৯৮] সাক্ষাৎকার, মোঃ আবুল হোসেন, পারিকুপি, কলারোয়া, সাতক্ষীরা। ১৯/১২/২০১৫, ঝাউডাঙ্গা, সাতক্ষীরা।

ঝাউডাঙ্গার সেদিন খানসেনাদের গুলিতে ঠিক কতজন লোক মারা যায় তার সঠিক হিসাব আজ পর্যন্ত পাওয়া যায় নি। কারণ এক একজন প্রত্যক্ষদর্শী এক এক ধরণের বর্ণনা দেয়। মোটামুটি ভাবে ১০০০ জন লোক নিহত এবং এক/দেড় হাজার জনলোক আহত হয় বলে জানা যায়।[৮৯৯] কার্তিক চন্দ্র মন্ডল পিতা- সুধীর কুমার মন্ডল গ্রাম- বটিয়াঘাটা সুধীর কুমার মন্ডল গ্রাম- দেবীতলা বটিয়াঘাটা শরৎ মিস্ত্রী পিতা- গিরীধর মিস্ত্রী গ্রাম- হাটবাড়ি উপজেলা- বটিয়াঘাটা বলরাম বিশ্বাস গ্রাম- ফুলতলা উপজেলা- বটিয়াঘাটা নিশীকান্ত মন্ডল পিতা- বাবু রাম মন্ডল বটিয়াঘাটা নগেন্দ্র নাথ বিশ্বাস প্রমুখ ব্যক্তিরা নিহত হন।[৯০০] যারা পায়ে, বুকে পিঠে গুলি খেয়ে মারাত্মকভাবে আহত হয়, তারা পানি ও চিকিৎসার জন্য আকুল প্রার্থনা জানায় কিন্তু কেউ সাহায্যের জন্য এগিয়ে আসে না। কারণ মিলিটারীর ভয়ে ঝাউডাঙ্গা বাজারের দোকানদার, হাটুরে সাধারণ লোকজন ভয়ে এদিক ওদিক পালিয়ে যায়। যারা মারাত্মকভাবে আহত অবস্থায় পড়ে থাকে, তারাও চিকিৎসার অভাবে এক সময় কাতরাতে কাতরাতে মারা যায়। পাকিস্তানী সেনাদের এই নারকীয় হত্যাযজ্ঞে শরণার্থীরা এতবেশি শঙ্কিত হয়ে পড়ে যে, কে কোন দিকে কিভাবে পিতা-মাতা, স্বামী-স্ত্রী, সন্তানদেরকে ফেলে এদিক ওদিক শুধুমাত্র জীবন বাঁচাতে দৌড়ে পালায় তা কেউ বলতে পারে না।[৯০১] কিন্তু যখন পাকিস্তানী সেনারা তাদের নির্দয় গণহত্যা শেষ করতে থাকে এখান থেকে তারা চলে যায় তখন বেঁচে যাওয়া শরণার্থীদের অনেকে তাদের আত্মীয় স্বজনের খোঁজে আসে কিন্তু কেউ কেউ তাদের আপনজনের সন্ধান পেলেও অনেকেই তাদের প্রিয় আপনজনকে চিরদিনের মত হারিয়ে আবার ভারতের পথে যাত্রা শুরু করে। বছর খানিক বয়সী এক শিশু তার মৃত মায়ের দুধ খেতে থাকে। তাকে স্থানীয় একজন উদ্ধার করে ভারতে একটি সেবাশ্রমে পাঠিয়ে দেয়।[৯০২] অধ্যাপিকা দীপা ব্যার্নাজী তার মাতা দেবী ব্যার্নাজী, স্বামী লোহিত ব্যার্নাজীকে হারিয়ে ফেলেন। অনেক খোঁজাখুজির পর তাকে পাওয়া গেলেও পশ্চিমবঙ্গের বলিগঞ্জের তিনতলা থেকে তিনি আবার হারিয়ে যান কিন্তু তারপর তাকে কোনদিন খুঁজে পাওয়া যায়নি। মাঠে, রাস্তাঘাটে শত শত লাশ পড়ে থাকে কিন্তু মৃত লাশের সৎকার করা সম্ভব হয় না। শরণার্থীরা তাদের জীবন বাঁচাতে বিছানাপত্র, টাকা, সোনাদানা, জমির দলিলপত্র সব কিছু ফেলে সীমান্ত পার হয়ে ভারতে চলে যায়। এদিকে মুসলীগ লীগ, জামায়াত কর্মীরা অসহায় শরণার্থীদের কাছ থেকে লুটপাট করে এমনকি মৃত মানুষের জিনিসপত্র নিতে তাদের বিবেকে এতটুকু বাধেনি। ঝাউডাঙ্গায় নিরীহ বাঙালী নিধনের কথা স্মরণ করে এখনও মানুষের গা শিউরে উঠে এবং পাকিস্তান বাহিনী এবং রাজাকারদের প্রতি তীব্র ঘৃণার সৃষ্টি হয়। এটি বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের সময় একটি হৃদয় বিদারক ঘটনা।

---

[৮৯৯] সাক্ষাৎকার, মোঃ আবুল হোসেন, পারিকুপি, কলারোয়া, সাতক্ষীরা। ১৯/১২/২০১৫, ঝাউডাঙ্গা, সাতক্ষীরা।
[৯০০] সাক্ষাৎকার, মোঃ আবুল হোসেন, পারিকুপি, কলারোয়া, সাতক্ষীরা।
[৯০১] সাক্ষাৎকার, মোঃ আবুল হোসেন, পারিকুপি, কলারোয়া, সাতক্ষীরা।
[৯০২] সাক্ষাৎকার, মোঃ আবুল হোসেন, পারিকুপি, কলারোয়া, সাতক্ষীরা। আরও দেখবেন- স.ম. বাবর আলী 'প্রাগুক্ত' পৃষ্ঠা- ১৯৫।

৪.৯ সাতক্ষীরা টাউন হাইস্কুলের হত্যাযজ্ঞ

সাতক্ষীরা টাউন হাইস্কুল যেটি বর্তমানে সাতক্ষীরা গভঃ হাইস্কুল নামে পরিচিত, এখানে ১৯৭১ সালে পাকিস্তানী হানাদার বাহিনী এক হত্যাযজ্ঞ করে। ২৬ মার্চে স্বাধীনতা ঘোষণার পর বরিশাল, ভোলা, ঝালকাঠি, পটুয়াখালি, পিরোজপুর, বাগেরহাট, খুলনা ও যশোরের বিভিন্ন স্থান থেকে বিভিন্ন বয়সের নারী-পুরুষ-শিশুরা জীবন বাঁচানোর জন্য দলে দলে সীমান্ত অতিক্রম করে ভারতে চলে যাওয়ার জন্য সাতক্ষীরা সীমান্ত পথ বেছে নেয়। এই সকল অসহায় মানুষেরা পাটকেলঘাটা, বিনেরপোতা পেরিয়ে সাতক্ষীরার আমতলা মোড়ে অবস্থিত সাতক্ষীরা টাউন হাইস্কুলে যাত্রা বিরতি করে।[৯০৩] বঙ্গবন্ধুর অসহযোগ আন্দোলনের সময় থেকে স্কুল কলেজসহ সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বন্ধ থাকায় এই স্কুলটি বন্ধ থাকে, ছাত্রলীগ, আওয়ামীলীগের স্বেচ্ছাসেবকেরা ভারতগামী শরণার্থীদের অল্প সময়ের জন্য বিশ্রামের ব্যবস্থা করে এই টাউন হাইস্কুলে। তারা শরণার্থী মানুষের জন্য ডাক চিড়া, গুড় ও রুটির ব্যবস্থা করে। এভাবে কয়েক দল পার হতে থাকে। কিন্তু ১৭ এপ্রিল মুক্তিযোদ্ধাগণ সাতক্ষীরা ন্যাশনাল ব্যাংক অপারেশন করার কারণে ১৯ এপ্রিল পাকিস্তানী হানাদার বাহিনী সাতক্ষীরা শহর দখল করে নেয়।[৯০৪] ১৯ এপ্রিল রেজিষ্ট্রী অফিসের পেছনে ক্যাপ্টেন কাজী নামে পরিচিত মশহুর রহমানকে ও তাঁর শ্যালককে হত্যা করে।[৯০৫] এছাড়া ডিনামাইট দিয়ে তার এবং আরও কয়েকজনের বাড়ি উড়িয়ে দেয়। পাকিস্তানী বাহিনী যখন টাউন হাইস্কুলে তাবু টানায়, তখন বিভিন্ন এলাকা থেকে শরণার্থীরা এসে ঐ স্কুলে অবস্থান নেয় এবং যারা পথে থাকে তাদের অনেকে জানতে না পেরে স্কুলে এসে উপস্থিত হয়। কিন্তু এই সকল অসহায় শরণার্থীরা হঠাৎ পাকিস্তানী হানাদার দেরকে দেখে শঙ্কিত হয়ে পড়ে এবং অনেকে চলে যাওয়ার জন্য অনুরোধ করে কিন্তু পাকিস্তানী সেনারা কাউকে যেতে না দিয়ে সবাইকে আটক করে রাখে। এরূপ শঙ্কার মধ্যে অসহায় শরণার্থীরা একদিন, একরাত পাড় করে। ২০ এপ্রিল রাত ৯ টার দিকে টাউন হাইস্কুলে অবস্থানরত নারী-পুরুষ ও শিশুদের উপর শুরু হয় নারকীয় গণহত্যা। পাকিস্তান মিলিটারী বাহিনী প্রায় সাড়ে চারশত নারী-পুরুষ-শিশু-বৃদ্ধ ও যুবককে নৃশংসভাবে হত্যা করে এবং তাদের হাত থেকে কেউ রক্ষা পায়নি। কিন্তু এই সকল ভাগ্যবিড়ম্বিত মানুষের ঠিকানা আজ পর্যন্ত জানা যায়নি। সাতক্ষীরা টাউন হাইস্কুলের পাশে কাটিয়ার কর্মকার পাড়া অবস্থিত এবং এখানে মৃত সন্তোষ দত্তের বাড়িতে ৫০ বছরের বেশি সময় ধরে তার বিধবা শালিকা শ্রীমতি আশালতা আমিন বসবাস করতেন।[৯০৬] তিনি স্বাধীনতা যুদ্ধের সময়ে ২০ এপ্রিল রাতের এক নারকীয় হত্যাযজ্ঞের বিবরণ দেন। সেদিন ১৩৭৮ সালের বৈশাখের প্রথম সপ্তাহের মঙ্গলবার, সন্ধ্যার পর টিপটিপ বৃষ্টি শুরু হয়, সবাই অজানা আতংকে অস্থির হয়ে

[৯০৩] সাক্ষাৎকার, মোঃ আব্দুল মালেক সোনা, থানাঘাটা, সাতক্ষীরা, সাক্ষাৎকার, নূর মোহাম্মদ, উত্তর কাটিয়া, সাতক্ষীরা। ৩০/০৫/২০১৫, টাউন স্কুল, সাতক্ষীরা।
[৯০৪] সাক্ষাৎকার, প্রফেসর ড. এম.এ বারী, সাতক্ষীরা। ২৯/০৫/২০১৫, টাউন স্কুল, সাতক্ষীরা।
[৯০৫] সাক্ষাৎকার, প্রফেসর ড. এম.এ বারী, সাতক্ষীরা।
[৯০৬] সাক্ষাৎকার, মোঃ আব্দুল মালেক সোনা, থানাঘাটা, সাতক্ষীরা।

পড়ে।[৯০৭] এদিকে শিশুরা ক্ষুধার যন্ত্রণায় কাঁদতে থাকে এবং সেদিন অনেক শরণার্থী আগে থেকে জানতে না পেরে সন্ধ্যার আগেও পরে টাউন হাইস্কুলে আশ্রয় গ্রহণ করে। স্কুলের উত্তর পাশে দীনেশ কর্মকারের বাড়িতে কিছু শরনার্থী আশ্রয় নেয়। কিন্তু তারাও রক্ষা পায়নি। তাদেরকে ধরে এনে দেয়ালের এক পাশে দাড় করিয়ে দা, বটি দিয়ে কুঁপিয়ে এবং বেয়নেট খুচিয়ে হত্যা করে। আর এই সকল দা-বটি সরবরাহ করে পাকিস্তানী সেনাদের দালাল- এক কথায় রাজাকার। আশালতা দেবী জানান, তিনি আগে থেকেই কিছু শরণার্থীদের নিয়ে পাশের উপজেলাঘাটা গ্রামে আত্মীয়ের বাড়িতে আশ্রয় গ্রহণ করেন এবং পরের দিন গোপন পথে ভারতে চলে যায়।[৯০৮] এছাড়া টাউন স্কুলের মাঠের উত্তর পাশের প্রায় ৬২ বছর বয়সী আবু বক্কর জানান- হাইস্কুলের প্রাঙ্গণে আশ্রয় গ্রহণকারী শরণার্থীদেরকে স্কুলের পিছনের মাটির দেয়ালের সামনে ধরে নিয়ে বেয়নেট খুঁচিয়ে, দা, বটি, চাকু দিয়ে কেটে কেটে হত্যা করে এবং তাদের লাশ মাটি চাপা দেয়।[৯০৯] ২০ এপ্রিল ১৯৭১ রাতে যশোরের মণিরামপুর, অভয়নগর উপজেলা, খুলনার ফুলতলা, ৯৬ গ্রাম, পাইকগাছা, ডুমুরিয়া, তেরখাদা, দাকোপ, বটিয়াঘাটাসহ বিভিন্ন জায়গা থেকে আগত শরণার্থীদের উপর এক নির্মম হত্যাযজ্ঞ চালায় পাকিস্তানী হানাদার বাহিনী।[৯১০] অন্যদিকে দীনেশ কর্মকারের বাড়িতে যেসব শরণার্থীরা আশ্রয় নেয় তাদের বেশির ভাগকে বেয়নেট এবং ধারালো অস্ত্র দিয়ে হত্যা করে।[৯১১] কয়েকজন পালিয়ে যেতে সক্ষম হয়। দেশ স্বাধীন হবার মাস খানেক পর এখান থেকে হাঁড়, খুলি ও কংকাল, ট্রাকে করে নিয়ে যাওয়া হয়। সাতক্ষীরার সুখলাল ডোম ও তার সহযোগিরা খুলি আর কংকাল খুড়েঁ এগুলো তুলতে সাহায্য সহযোগিতা করে।[৯১২]

৪.১০ কুলিয়ার গণহত্যা

দেবহাটা উপজেলার ১ নম্বর কুলিয়া ইউনিয়নের খান বাহাদুর মোবারক আলী ব্রিজের পাশে এবং তৎকালীন তফসিল অফিসের পূর্ব পাশের বিলে বিভিন্ন এলাকা থেকে সাধারণ মানুষকে ধরে এনে হত্যা করা হতো। স্বাধীনতার পর সেখানে অনেক নর-কঙ্কালের সন্ধান পাওয়া যায়। বর্তমানে সেখানে একটি বধ্যভূমি রয়েছে। এছাড়া কুলিয়ার আব্দুল গফফার চেয়ারম্যানের বাড়ির পাশে আরও একটি গণকবর রয়েছে যা বর্তমানে অরক্ষিত।[৯১৩]

---

[৯০৭] স.ম. বাবর আলী 'প্রাগুক্ত' পৃষ্ঠা- ১৮৯।
[৯০৮] ঐ।
[৯০৯] ঐ।
[৯১০] ঐ।
[৯১১] ঐ।
[৯১২] ঐ।
[৯১৩] কমান্ডো মোঃ খলিলুর রহমান 'মুক্তিযুদ্ধে নৌ-অভিযান' 'সাহিত্য প্রকাশ' ঢাকা- পৃষ্ঠা- ১৫৩।

৪.১১ পারকুমিরা এবং পাটকেলঘাটার গণহত্যা

পারকুমিরা ও পুটিখালী গ্রামটি পাটকেলঘাটা বাজারের সন্নিকটে অবস্থিত। ২৩ এপ্রিল ১৯৭১ ৯ বৈশাখ ১৩৭৮ শুক্রবার, পাটকেলঘাটা বাজারে জনৈক পাঞ্জাবী রুটি বিক্রেতা অবাঙালি মনু কসাই ও স্থানীয় কতিপয় পাকিস্তানী দালালদের সহযোগিতায় পাকিস্তানী হানাদার বাহিনী পারকুমিরা ও পুটিখালী গ্রামে প্রবেশ করে এবং কয়েকজন নিরীহ স্থানীয় লোকজনকে ধরে নিয়ে আসে। পাকসেনা, রাজাকার ও বিহারীরা ব্যাপক হারে গণহত্যা শুরু করলে খুলনা, ফুলতলা ও নওয়াপাড়া থেকে আগত শরশার্থীরা ভারত যাওয়ার পথে পারকুমিরা দাতব্য চিকিৎসালয়ে বিশ্রাম করছিলেন। ভোরে যখন মসজিদ থেকে মুয়াজ্জিনের আযানের ধ্বনি ভেসে আসছে, ঠিক ঐ সময় পাকিস্তানী সেনারা এক নারকীয় হত্যাযজ্ঞ শুরু করে। পাকিস্তানী সেনারা দাতব্য চিকিৎসালয়ের সামনে ৪৯ জনকে নির্মমভাবে হত্যা করে।[৯১৪] এরপর বেলা ১০ টা থেকে ১টা পর্যন্ত পাকিস্তানী সেনারা পাটকেলঘাটা বাজারে নির্মম গণহত্যা চালায়। আব্দুর রউফ, দীনবন্ধু পাল, অনিল দাস, নিমাই সাধু, গোস্ট বিহারী কুন্ডু, ষষ্টি বিহারী কুন্ডু, সালামত মল্লিক, শেখ আব্দুর রহমান, শেখ জালাল উদ্দীন, শেখ সামছুর রহমান, শেখ বদর উদ্দিন, সর্বেসাং- পুটিখালী, বেলায়েত আলী, ফজলুর রহমান, সাজ্জাদ আলী, সামছুর রহমান, মুজিবর রহমান, শেখ আব্দুল জব্বার, সাজ্জাদ আলী (বালিয়াদহা), আজিজুর রহমান সহ কয়েকজন নিরীহ লোককে গুলি করে হত্যা করে। মোহর আলী সহ ৩ জনকে একসাথে গুলি করা হয়, মোহর আলী গুলিবৃদ্ধ অবস্থায় বেঁচে যান। এছাড়া আনন্দ সাধু (তৈলকুপি) গুলিবৃদ্ধ অবস্থায় বেঁচে যান।[৯১৫] নির্মমভাবে পুড়িয়ে মারে কাশিপুর গ্রামের হায়দার আলী বিশ্বাসকে।[৯১৬] তিনি তৎকালীন মুসলিম লীগের একজন কর্মী ছিলেন। তাকে পারকুমিরা গ্রামের হিন্দু পাড়ায় বাড়ী ঘরে আগুন দিতে নির্দেশ দেয়া হয়েছিল কিন্তু হায়দার আলী বিশ্বাস তাতে অসম্মতি জানালে তার শরীরে পাট জড়িয়ে কেরোসিন ঢেলে নির্মমভাবে পুড়িয়ে মারা হয়।[৯১৭]

৪.১২ বিনেরপোতার গণহত্যা

১৯৭১ সালের ৬ ডিসেম্বর সাতক্ষীরায় মুক্তিবাহিনীর সাথে পাকিস্তানী সেনাদের ব্যাপক যুদ্ধ সংঘটিত হয়।[৯১৮] এই যুদ্ধে ৩০ জন পাঞ্জাবী এবং শতাধিক রাজাকার মুক্তিবাহিনীর হাতে বন্দী হয়।[৯১৯] মুক্তিবাহিনীর আক্রমণে পাকিস্তানী সেনাবহর সাতক্ষীরা, খুলনা রাস্তা বরাবর পিছাতে থাকে। বিনেরপোতা ব্রিজের কাছে এসে পাকিস্তানী সেনারা পরাজয়ের ক্ষোভে বহু রাজাকারকে হত্যা করে এবং বিনেরপোতা ব্রিজ ডিনামাইট দিয়ে উড়িয়ে দেয়। এই সময় পথে তারা সামনে যাকে পায় তাকেই হত্যা করে এবং খুলনায় পালিয়ে যায়।

---

[৯১৪] বিশ্বজিৎ সাধু, পাটকেলঘাটা বাজার। মোঃ বাবলুর রহমান, প্রধান শিক্ষক, আমিরুন নেছা মাধ্যমিক বালিকা বিদ্যালয়, পাটকেলঘাটা। ২২/০৫/২০১৫, পাটকেল ঘাটা, সাতক্ষীরা।
[৯১৫] বিশ্বজিৎ সাধু, পাটকেলঘাটা বাজার। মোঃ বাবলুর রহমান, প্রধান শিক্ষক, আমিরুন নেছা মাধ্যমিক বালিকা বিদ্যালয়, পাটকেলঘাটা।
[৯১৬] বিশ্বজিৎ সাধু, পাটকেলঘাটা বাজার। মোঃ বাবলুর রহমান, প্রধান শিক্ষক, আমিরুন নেছা মাধ্যমিক বালিকা বিদ্যালয়, পাটকেলঘাটা।
[৯১৭] বিশ্বজিৎ সাধু, পাটকেলঘাটা বাজার। মোঃ বাবলুর রহমান, প্রধান শিক্ষক, আমিরুন নেছা মাধ্যমিক বালিকা বিদ্যালয়, পাটকেলঘাটা।
[৯১৮] সাক্ষাৎকার, দেবী রঞ্জন মন্ডল, গোবিন্দপুর, শ্যামনগর, সাতক্ষীরা। ২১/০৪/২০১৫, শ্যামনগর, সাতক্ষীরা।
[৯১৯] ঐ।

উল্লেখ্য এই যুদ্ধে, ভারতীয় মিত্রবাহিনী বিমান হামলা চালায়। এই গণহত্যায় বিনেরপোতা নদীর পানি রক্তেলাল হয়ে যায়। মুক্তিবাহিনীর সদস্যগণ ব্রিজের নিকটে এসে দেখে, পড়ে আছে শুধু লাশ আর লাশ। এখানে লাশের সংখ্যা নির্ধারণ করা সম্ভব হয়নি। বিনেরপোতায় একটি বধ্যভূমি ছিল বর্তমানে সেটি বিলীন হয়ে গেছে।[৯২০]

৪.১৩ সুলতানপুরের কুমারপাড়া

১৯৭১ সালের ২১ এপ্রিল পাকিস্তানী সেনাএবং রাজাকাররা মিলিত হয়ে সুলতানপুরের কুমারপাড়ায় একই পরিবারের সুরেন্দ্রনাথ পাল, নগেন্দ্রনাথ পাল ও কেষ্টপদ পাল নামে তিনজনকে হত্যা করে এবং সুলতানপুরে শেখ মশির আহমদ এর তিনতলা বাড়ি ধ্বংস করে দেয়।[৯২১] এরপর ইটাগাছার কালীপদ রায়ের দ্বিতল বাড়িও ধ্বংস করে এবং উক্ত রাড়ির সম্মুখে সাতক্ষীরা সিলভার জুবেলী স্কুলের শিক্ষক আব্দুল কাদের, কাটিয়া নিবাসী পূর্ণসাহা, চন্ডীদাস, গোষ্ট বাবু, নামের কয়েকজনকে নির্মমভাবে গুলি করে হত্যা করে। এ সময় পাকিস্তানী সেনারা শিক্ষক হারাধন বাবু, দেবেন মূখার্জী ও অ্যাডভোকেট কার্তিক চন্দ্রের বাড়ি পুড়িয়ে দেয়।[৯২২]

৪.১৪ তালা উপজেলার গোয়ালপোতা এবং হরিণখোলার গণহত্যা

তালা উপজেলার প্রায় ২৫-৩০ কিলোমিটার দক্ষিণ-পশ্চিমে হরিণখোলা এবং গোয়ালপোতা গ্রাম দুটি ছিল শতভাগ হিন্দু সম্প্রদায় অধ্যুষিত। ১৩৭৮ সনের ২৪ বৈশাখ শনিবার কুখ্যাত অধ্যুষিত রাজাকার এবং মুসলিম লীগ নেতা ছদ্দিন সরদার (নগরঘাটা), মওলানা আব্দুল আজিজ (নগরঘাটা) এবং গুলবাহারের নেতৃত্বে একদল পাকিস্তানী সেনাউক্ত দুই গ্রামে প্রবেশ করে এবং নারী, শিশু ও বৃদ্ধ সব মিলিয়ে ৫৯ জনকে গুলি করে এবং বেয়নেট দিয়ে খুচিয়ে হত্যা করে এবং সমস্ত গ্রামে আগুন ধরিয়ে দেয়।[৯২৩] দুই গ্রামের শত শত বাড়িতে তারা আগুন ধরিয়ে দেয় এবং গরু-ছাগল, ধানের গোলা, সবকিছু পুড়ে ছাই হয়ে যায়, হত্যাকান্ড শুরু হয় বেলা ৩টার দিকে, নিহতদের মধ্যে হরিণখোলা গ্রামের পাচু মন্ডল, বাল্লক চাঁদ, বন্দিরাম, সোনা ঢালী, বাউনী সহ আরও অনেকে।[৯২৪] গোয়ালপোতা গ্রামের সুরেন ঢালী, হরচাঁদ, জয়হরি সহ আরও অনেকে।[৯২৪ক] শাকদহা গ্রামের নিতাই মন্ডল এবং দুধলী গ্রামের ছত্তর এখানে হত্যা কান্ডের শিকার হয় এবং প্রত্যেক বাড়িতে গান

---

[৯২০] ঐ।

[৯২১] সাক্ষাৎকার, প্রফেসর ড. মোঃ আব্দুল বারী। ২২/০৪/২০১৫, সুলতানপুর, সাতক্ষীরা।

[৯২২] সাক্ষাৎকার, প্রফেসর ড. মোঃ আব্দুল বারী।

[৯২৩] সাক্ষাৎকার, প্রফেসর সুভাষ চন্দ্র সরকার, গোয়ালপোতা, তালা, সাতক্ষীরা। ০৫/০৬/২০১৫, গোয়ালপোতা, সাতক্ষীরা।

[৯২৪] সাক্ষাৎকার, প্রফেসর সুভাষ চন্দ্র সরকার, গোয়ালপোতা, তালা, সাতক্ষীরা।

৯২৪ক সাক্ষাৎকার, প্রফেসর সুভাষ চন্দ্র সরকার, গোয়ালপোতা, তালা, সাতক্ষীরা।

পাউডার দিয়ে আগুন ধরিয়ে দেওয়া হয়। পরের দিন ২৫ বৈশাখ রবিবার রাজাকার বাহিনীরা এসে গ্রামটি আবার লুটপাট করে। এরপর উক্ত গ্রামের সাধারণ মানুষ তাদের বাস্তভিটা ছেড়ে শরণার্থী হিসেবে ভারতে চলে যায়।

৪.১৫ রাঢ়ীপাড়ার গণহত্যা

তালা উপজেলার কুমিরা ইউনিয়নের রাঢ়ীপাড়া একটি হিন্দু সংখ্যালঘু অব্যুষিত গ্রাম। ১৯৭১ সালের মে মাসের মাঝামাঝি সময়ে পাকিস্তানী সেনাবাহিনীরা রাঢ়ীপাড়া গ্রামে প্রবেশ করে এবং গ্রামটি জ্বালিয়ে দেয়।[৯২৫] সেখানে তারা ছয়জন লোককে গুলি করে হত্যা করে।[৯২৬] নিহতের মধ্যে আলাউদ্দীন মোল্লা, ইনছার আলী মোল্লা (উভয়ই অভয়তলা), দুলাল মালেক, নাজর আলী সরদার, আনন্দ পাল, গোবিন্দ চন্দ্র পাল (সবাই রাঢ়ীপাড়া গ্রামের বাসিন্দা)।[৯২৭]

৪.১৬ শ্রীমন্তকাঠি গ্রামের গণহত্যা

তালা উপজেলার জালালপুর ইউনিয়নের শ্রীমন্তকাঠি গ্রামটি ছিল হিন্দু অধ্যুষিত। এই গ্রামের একজন মুক্তিযুদ্ধের সংগঠক ছিলেন জনাব বি.এ করিম।[৯২৮] তার বাড়িতে মুক্তিযুদ্ধের একটি ক্যাম্প ছিল। এই ক্যাম্পের মুক্তিযোদ্ধারা ৬ জন ১৯৭১ সালে পাকিস্তানী বাহিনীর খাদ্য বহনকারী একটি লঞ্চকে কপোতাক্ষ নদ দিয়ে যাবার সময় অতর্কিত আক্রমণ করে এবং দুজন রাজাকারকে গুলি করে হত্যা করে।[৯২৯] ৭ জুন ১৯৭১ কপিলমুনি থেকে পাকিস্তানী সেনা এবং রাজাকারের এক বিশাল বাহিনী জালালপুর ও শ্রীমন্তকাঠি গ্রামে ঢুকে সম্পূর্ণ গ্রামটি আগুন দিয়ে জ্বালিয়ে দেয়।[৯৩০] এ সময় তারা ১৫ জনকে নৃশংসভাবে গুলি করে হত্যা করে।[৯৩১] তারপর গ্রাম থেকে সুন্দরী মেয়েদের ধরে নিয়ে কপিলমুনি পাকিস্তানী সেনাদের ক্যাম্পে নিয়ে যায়। নিহতদের মধ্যে আব্দুল বারী মোড়ল (গ্রাম শ্রীমন্তকাঠি), অন্নদাশসেন শাখারী, দুলাল বর্ধন শাখারী, সাহেব আলী, অশোক পরামানিক, দুখে পরামানিক, বাদল পরামানিক, হরিপদ ঘোষ, মংলা ঘোষ, উমাপদ দত্ত, পিয়ালী দালাল, অনাথ দাসের স্ত্রী, এনায়েত আলী কারিগরের মা, নকীব আলী মোড়লের ভাই শামসুর রহমান মোড়ল, সকলের গ্রাম জালালপুর।[৯৩২]

---

[৯২৫] মোঃ আবুল হোসেন, 'প্রাগুক্ত' পৃষ্ঠা- ১৫৪।
[৯২৬] ঐ।
[৯২৭] ঐ।
[৯২৮] মোঃ আবুল হোসেন, 'সাতক্ষীরা জেলার ইতিহাস' 'সাহিত্য প্রকাশ, খুলনা- পৃষ্ঠা- ১৫৬।
[৯২৯] ঐ।
[৯৩০] ঐ।
[৯৩১] ঐ।
[৯৩২] ঐ।

৪.১৭ মাগুরার গণহত্যা

১৯৭১ সালের ১৯ নভেম্বর তালা উপজেলার মাগুরা গ্রামবাসীর কাছে এক দুঃসহ স্মৃতির দিন। ঐদিন কে.এম.এস.সি স্কুলের খ্যাতনামা শিক্ষক ভূপতি কান্ত রায় চৌধুরী, অজয় রায় চৌধুরী (ঝুনু বাবু) এবং আরও কয়েক জন মিলে ভারতে চলে যাচ্ছিলেন।[৯৩৩] পথিমধ্যে পাটকেলঘাটা রাজাকার এবং পাকিস্তানী সেনারা তাদের ধরে ফেলে। ১০ অগ্রহায়ণ ১৩৭৮ শনিবার, অজয় রায় চৌধুরীকে পাক সেনারা নির্মম ভাবে হত্যা করে, তার লাশের কোন সন্ধান পাওয়া যায়নি।[৯৩৪] এ সময় তারা সমস্ত বাজারে আগুন ধরিয়ে দেয়। এ সময় গুলি করে এবং বেয়নেট দিয়ে খুচিয়ে প্রায় ৩৫ জনকে হত্যা করে নিহতদের মধ্যে আফতাব সরদার (মুসলিম লীগের) বিমল, রোকন, আহতদের মধ্যে ২০ জনের পরিচয় জানা গেছে। ভূপতি কান্ত রায় চৌধুরীকে তার এক রাজাকার ছাত্র বাঁচিয়ে দেন।[৯৩৫]

৪.১৮ খলিষখালী

১৯৭১ সালের ৪ নভেম্বর তালা উপজেলার খলিষখালী গ্রামে পাকিস্তানী হানাদার বাহিনী এবং রাজাকাররা এক নারকীয় হত্যা কান্ড চালায়।[৯৩৬] এ সময় তারা খলিষখালী বাজারের অনেক দোকান লুটপাট করে এবং অগ্নিসংযোগ করে। এই কাজে পাকিস্তানী বাহিনীকে সহায়তা করে ইসলামকাঠি গ্রামের রাজাকার ওমর আলী ফকির, মোবারক দাই ও আরও অনেকে। এই হত্যা কান্ডে ৯ জনের পরিচয় জানা গেছে। হরিবিলাস দত্ত, সন্তু দালাল, ঘন্টে চ্যাটার্জী, দুলাল সাধু, ইজার সরদার, হোসেন সরদার, বলাই ধোপা, সকলেই খলিষখালী গ্রামের লোক।[৯৩৭] ফাকের গাজী, গ্রাম বাগমারা। এই হত্যা কান্ডের পর খলিষখালী গ্রামের হিন্দু সম্প্রদায়ের লোক তাদের ভিটা বাড়ি ফেলে ভারতে চলে যায়।[৯৩৮]

৪.১৯ কলারোয়া, ইলিশপুরের গণহত্যা

১৯৭১ সালের মে মাসের শেষের দিকে ডুমুরিয়া, কেশবপুর, মণিরামপুর অঞ্চল থেকে কয়েক হাজার শরণার্থী কলারোয়া উপজেলার কিশমতপুর, ইলিশপুর গ্রামের উপর দিয়ে ভারতে চলে যাচ্ছিল। পার্শ্ববর্তী বাগআঁচড়া বাজার ছিল রাজাকার এবং খানসেনাদের শক্ত ঘাঁটি।[৯৩৯] কুখ্যাত রাজাকার আব্দুর রশিদের নেতৃত্বে

---

[৯৩৩] সাক্ষাৎকার, ভৈরব চন্দ্র মজুমদার, মাগুরাডাঙ্গা, তালা, সাতক্ষীরা। ১২/০৪/২০১৫, মাগুরাডাঙ্গা, সাতক্ষীরা।
[৯৩৪] সাক্ষাৎকার, ভৈরব চন্দ্র মজুমদার, মাগুরাডাঙ্গা, তালা, সাতক্ষীরা, সাক্ষাৎকার, অরুন রায় চৌধুরী, মাগুরা, তালা, সাতক্ষীরা।
[৯৩৫] সাক্ষাৎকার, ভৈরব চন্দ্র মজুমদার, মাগুরাডাঙ্গা, তালা, সাতক্ষীরা।
সাক্ষাৎকার, শেখ রেজাউল করিম, মঙ্গলানন্দকাঠী, তালা, সাতক্ষীরা। ১২/০৫/২০১৫, মঙ্গলানন্দকাঠী, সাতক্ষীরা।
[৯৩৬] সাক্ষাৎকার, শিবপদ দত্ত, খলিষখালী, তালা, সাতক্ষীরা। ১৪/০৫/২০১৫, খালিষখালী, সাতক্ষীরা।
[৯৩৭] সাক্ষাৎকার, শিবপদ দত্ত, খলিষখালী, তালা, সাতক্ষীরা।
[৯৩৮] সাক্ষাৎকার, শিবপদ দত্ত, খলিষখালী, তালা, সাতক্ষীরা।
[৯৩৯] সাক্ষাৎকার, মোঃ গোলাম মোস্তফা, ইলিশপুর, কলারোয়া, সাতক্ষীরা। ২৩/০৫/২০১৫, ইলিশপুর, সাতক্ষীরা।

পাকিস্তানী সেনাও রাজাকারদের একটি দল ঐ বিশাল শরণার্থীদের উপর নির্বিচারে গুলিবর্ষণ করতে থাকে এবং তাদের সমস্ত মালামাল লুটপাট করে নেয়। এ সময় নর-নারী এবং শিশুসহ ২২ জন নিহত হয় এবং আহত হয় কয়েকশত।[৯৪০] ভীত সন্ত্রস্ত শরণার্থীরা ইলিশপুর, পূর্বকোটা, পশ্চিমকোটা, ভীখালীসহ বিভিন্ন এলাকায় ছড়িয়ে পড়ে এবং প্রাণ বাঁচাতে ছোটাছুটি করতে থাকে।[৯৪১]

৪.২০ হামিদপুর

১৯৭১ সালের জুলাই মাসে মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণের জন্য ৬ জন ছাত্র খুলনা এলাকা থেকে ভারতে যাবার সময় কলারোয়া উপজেলার হামিদপুর গ্রামে কুখ্যাত নর ঘাতক রাজাকার ডাঃ মোকশেদ আলীর কাছে ধরা পড়ে।[৯৪২] পরবর্তীতে তাদেরকে মুক্তিযোদ্ধা হিসেবে চিহ্নিত করে কলারোয়ার পাকিস্তানী সেনাক্যাম্পে হস্তান্তর করা হয়। এদের মধ্যে তিনজন ছাত্র অলৌকিভাবে পালিয়ে ভারতে যেতে সক্ষম হয়। অপর তিনজনকে পাশবিক নির্যাতনের পর কলারোয়া উপজেলার উত্তর পাশে একটি গর্ত খুড়ে অর্ধমৃত অবস্থায় মাটি চাপা দেওয়া হয়।[৯৪৩]

৪.২১ মুরারীকাঠি গ্রামের পালপাড়া

১৯৭১ সালের ২৮ এপ্রিল কলারোয়া উপজেলার মাহমুদপুর গ্রামের আফছার উদ্দীনকে পাকিস্তানী সেনারা গুলি করে হত্যা করে গোবিন্দকাঠি গ্রামের মাঠের ভিতরে ফেলে রাখে।[৯৪৪] এরপর ঐ একই দিনে উপজেলার মুরারীকাঠি গ্রামের পালপাড়ায় পাকিস্তানি সেনা ও রাজাকাররা এক নির্মম গণহত্যা চালায়। নিহতের মধ্যে বৈদ্যনাথ পাল, রঞ্জন পাল, বিমল চন্দ্র পাল, নিতাই চন্দ্র পাল, গোপাল চন্দ্র পাল, সতীশ চন্দ্র পাল, রাম চন্দ্র পাল, অনিল চন্দ্র পাল, রামপদ পাল নিহত হন।[৯৪৫] ত্রৈলক্ষ পালসহ তিনজন মারাত্মকভাবে আহত হয়েছিলেন। এছাড়া অনেকগুলো বাড়িতে অগ্নিসংযোগ করা হয়।

---

[৯৪০] ঐ।
[৯৪১] ঐ।
[৯৪২] সাক্ষাৎকার, মোঃ আবুল হোসেন, পারিকুপি, কলারোয়া, সাতক্ষীরা। ১২/০৫/২০১৫, পারিকুপি, সাতক্ষীরা।
[৯৪৩] ঐ।
[৯৪৪] মোঃ আবুল হাসেন, সাতক্ষীরা জেলার ইতিহাস, 'প্রাগুক্ত' পৃষ্ঠা- ১৫৪।
[৯৪৫] ঐ।

৪.২২ আশাশুনি, বড়দল বাজারের গণহত্যা

১৯৭১ সালের ১৭ অক্টোবর আশাশুনি উপজেলার চাপড়া রাজাকার ক্যাম্প থেকে দুই শতাধিক রাজাকারের একটি দল ও অর্ধশতাধিক পাকিস্তানী সেনাএকত্রিত হয়ে বড়দল বাজারে পৌছায়।[৯৪৬] এরপর পাকিস্তানী সেনারা বড়দল বাজার লুট করে এবং সানাবাড়িসহ কয়েকটি বাড়িতে অগ্নিসংযোগ করে।[৯৪৭] বড়দল বাজার থেকে ফেরার পথে ঘাতকরা পাঁচজনকে নৃশংসভাবে হত্যা করে। নিহতরা হলেন, কার্ত্তিক চন্দ্র মদক, আব্দুস সাত্তার গাজী, সোহরাব আলী, আক্কাস আলী সরদার এবং সতিসিং এর মাতা রানী সিং। সকলের বাড়ি বড়দল।[৯৪৮]

৪.২৩ তুয়ারডাঙ্গা

আশাশুনি উপজেলার খাজরা ইউনিয়নের তুয়ারডাঙ্গা ছিল মরিচ্চাপ নদীর তীরে অবস্থিত একটি হিন্দু অধ্যুষিত গ্রাম। এই গ্রামের প্রাথমিক বিধ্যালয়ের শিক্ষক বিমল চন্দ্র মন্ডলকে গুলি করে হত্যা করে।[৯৪৯] এ হত্যাকান্ডের নেতৃত্ব দেয় কুখ্যাত রাজাকার আতিয়ার রহমান ও মতিয়ার রহমান।[৯৫০]

৪.২৪ চাপড়ার টর্চারসেল

চাপড়া গ্রামের আমিন উদ্দীন সরদার বাড়ির টর্চারসেল সাতক্ষীরা অঞ্চলের সবচেয়ে ভয়াবহ রাজাকার ঘাঁটি।[৯৫১] এটি আশাশুনি উপজেলার মরিচ্চাপ নদীর পাশে অবস্থিত। এই টর্চার সেলে কসাই এর দায়িত্ব পালন করতো কুখ্যাত নরপিশাচ আব্দুর রাজ্জাক।[৯৫২] এছাড়া রাজাকার কমান্ডার হাফেজ (আনুলিয়া, মনিপুর) ছিল স্থানীয় মানুষের কাছে আতঙ্কের অপর নাম।[৯৫৩] মরিচ্চাপ নদী দিয়ে যখন বরিশাল, পিরোজপুর, ঝালকাঠি, প্রতৃতি অঞ্চল থেকে হিন্দু সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের মানুষ তাদের মাতৃভূমি ছেড়ে শরণার্থী হিসেবে ভারতে পাড়ি জমাত, তখন এই সকল কুখ্যাত রাজাকাররা সেখান থেকে অল্প বয়সী সুন্দরী মেয়েদের নামিয়ে নিয়ে আশাশুনির ডাক বাংলোর টর্চারসেল রাখত। লুটকৃত মাল আমিন উদ্দীন টর্চারসেলে নিয়ে যেত এবং বাকীদের নারকীয় ভাবে হত্যা করা হতো, কতমানুষের লাশের সাক্ষী এই মরিচ্চাপ নদী তার হিসাব কেউ বলতে পারেনি। আশাশুনি উপজেলার মুক্তিযোদ্ধা মুহাম্মাদ আব্দুল হান্নান বলেন, হাজার হাজার মানুষকে সেখানে হত্যা করা হয়।[৯৫৪]

---

[৯৪৬] মোঃ আবুল হাসেন, সাতক্ষীরা জেলার ইতিহাস, 'প্রাগুক্ত' পৃষ্ঠা- ১৫৭।
[৯৪৭] ঐ, সাক্ষাৎকার, চিত্তরঞ্জন সরকার, মহিষাডাঙ্গা, সাতক্ষীরা। ১২/০৭/২০১৪, মহিষাডাঙ্গা, সাতক্ষীরা।
[৯৪৮] ঐ।
[৯৪৯] সাক্ষাৎকার, মোঃ আব্দুল হান্নান, আশাশুনি, সাতক্ষীরা। ১৫/০৫/২০১৫, তুয়ারডাঙ্গা, সাতক্ষীরা।
[৯৫০] ঐ।
[৯৫১] সাক্ষাৎকার, মোঃ আব্দুল হান্নান, আশাশুনি, সাতক্ষীরা। ১২/০৫/২০১৫, চাপড়া, সাতক্ষীরা।
[৯৫২] সাক্ষাৎকার, চিত্তরঞ্জন সরকার, মহিষাডাঙ্গা, আশাশুনি, সাতক্ষীরা। ১২/০৫/২০১৫, চাপড়া, সাতক্ষীরা।
[৯৫৩] সাক্ষাৎকার, অহেদ আলী, আরার, আশাশুনি, সাতক্ষীরা। ১২/০৫/২০১৫, চাপড়া, সাতক্ষীরা।
[৯৫৪] ঐ।

৪.২৫ আশাশুনি

কুখ্যাত রাজাকার আশরাফ উদ্দীন মকবুল। তিনি স্থানীয় হিন্দু সম্প্রদায়ের মানুষদের ২৪ ঘন্টার মধ্যে দেশ ত্যাগের নির্দেশ দেন এবং এলাকায় ত্রাস সৃষ্টি করার জন্য এলেম গাজী নামক একজন স্বাধীনতা পক্ষের লোককে বাড়ি থেকে ডেকে এনে প্রকাশ্যে গুলি করে হত্যা করে।[৯৫৫] এতে এলাকায় ভীষণ ভীতির সঞ্চার হয় এবং ৬ নম্বর আশাশুনি ইউনিয়নের হাড়িভাঙ্গা গ্রামের আপন চার ভাইকে প্রকাশ্যে গুলি করে হত্যা করে কুখ্যাত রাজাকার লিয়াকত আলী (চাপড়া)। আশাশুনির প্রখ্যাত কালী মন্দিরের পুরহিত যার ডাক নাম ছিল গোড়া ঠাকুরকে কুখ্যাত রাজাকার আব্দুর রশিদ সানা (আশাশুনি) কালীতলায় প্রকাশ্যে গুলি করে হত্যা করে।[৯৫৬] একই সময়ে আব্দুর গফফার নামের এক আওয়ামীলীগ কর্মীকে হত্যা করে।[৯৫৭] ১৯৭১ সালের এপ্রিল মাসের প্রাক্তন সংসদ সদস্য এস.এম নওয়াব আলীর বাড়ির অগ্নিসংযোগ করা হয় এবং তাদের ৩ তলা বিল্ডিংটি ডিনামাইট দিয়ে উড়িয়ে দেয়া হয়।[৯৫৮]

৪.২৬ কালীগঞ্জ, মৌতলা, গনেশপুর, চাঁদখালী

১৯৭১ সালের আগষ্ট মাসের মাঝামাঝি সময়ে কালীগঞ্জ উপজেলার মৌতলায় স্থানীয় রাজাকার এবং পাকিস্তানী সেনাদের আক্রমণের শিকার হয় মৌতলা গ্রামটি। তারা সেখানে ৮ থেকে ১০টি বাড়িতে আগুন ধরিয়ে দেয় এবং কাজী তরিকুল ইসলাম, মীর আব্দুস সাত্তার, তনু গাজীকে হত্যা করা হয়।[৯৫৯] একই দিনে গনেশপুর এবং চাঁদখালী গ্রামে আক্রমণ করে।[৯৬০] প্রভাত চন্দ্র বাছাড়, অজিত চন্দ্র বাছাড়, গোপাল সরদার, গুরুপদ বাছাড়, ধনবর মন্ডল, অনাথ সরদার, এছাড়া কালীগঞ্জ সদর হাসপাতালের কর্মচারী মোশারফ হোসেন এবং ডাক্তার ধ্রুবপদ সরকারকে হত্যা করা হয়।[৯৬১]

৪.২৭ কাকশিয়ালী ব্রিজের গণহত্যা

কাকশিয়ালী ব্রিজের ৫-৬ কিলোমিটার পশ্চিমে ভারতীয় সীমান্ত এবং কালীগঞ্জ উপজেলা অবস্থিত। ১৯৭১ সালের ১০ জুলাই মেজর জলিলের নেতৃত্বে মুক্তিবাহিনী কালীগঞ্জ উপজেলা দখল করতে গেলে সেখানে ভয়াবহ যুদ্ধ হয়। এতে অনেক পাকিস্তানীসেনা নিহত হয়।[৯৬২] এই কালীগঞ্জ উপজেলার পার্শ্ববর্তী কাকশিয়ালী নদী দিয়ে যখন বাগেরহাট, পিরোজপুর, ঝালকাঠি, বরিশাল, পাইকগাছা, কয়রা, এলাকা থেকে শরণার্থীরা

---

[৯৫৫] সাক্ষাৎকার, মোঃ আব্দুল হান্নান, আশাশুনি, সাতক্ষীরা। ১২/০৫/২০১৫ আশাশুনি, সাতক্ষীরা।
[৯৫৬] ঐ।
[৯৫৭] ঐ।
[৯৫৮] ঐ।
[৯৫৯] মোঃ আবুল হোসেন, সাতক্ষীরা জেলার ইতিহাস 'প্রাগুক্ত' পৃষ্ঠা- ১৫৭।
[৯৬০] ঐ।
[৯৬১] ঐ।
[৯৬২] মোঃ আবুল হোসেন, 'প্রাগুক্ত' পৃষ্ঠা- ১৫৫।

যখন এই পথে ভারতে যাবার চেষ্টা করতো, তখন তাদেরকে কসাইয়ের মতো হত্যা করা হতো।[৯৬৩] তাদের সর্বস্ত লুট করে নদীর পানিতে ভাসিয়ে দেয়া হতো। কাকশিয়ালী ব্রিজের নীচে যাদের হত্যা করা হয়েছিল তাদের সংখ্যা নির্ধারণ করা সম্ভব হয়নি। কয়েক জনের পরিচয় জানা গেছে তারা হলেন শাহামত আলী (তারালী), আরজান আলী কেরালী, সৈয়দ আলী মিস্ত্রী (গড়ইমহল) প্রমুখ।[৯৬৪]

৪.২৮ রতনপুর বাজার

১৯৭১ সালের ১৬ মে পাকিস্তানীসেনা এবং রাজাকারদের একটি দল রতনপুর বাজারে যায়।[৯৬৫] তারা রতনপুর বাজারটি জ্বালিয়ে দেয় এবং সেখানে প্রায় ৯ জনকে ধরে নিয়ে নৃশংসভাবে গুলি করে হত্যা করে।[৯৬৬] নিহতদের মধ্যে মিনাজকাঠি গ্রামের খলিলুর রহমান, এছাড়া আরও ৯ জনের পরিচয় জানা গেছে বীর মুক্তিযোদ্ধা এস.এ মমতাজ হোসেন মন্টু, তার "স্মৃতিতে একাত্তর' গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন, ২৫ অক্টোবর ১৯৭১ স্থানীয় রাজাকার এবং খানসেনারা পুনরায় রতনপুর বাজার আক্রমণ করে এবং পুড়িয়ে দেয়।[৯৬৭] এই অভিযানে নেতৃত্বে দিয়েছিল জল্লাদ কাশেম।[৯৬৮] জল্লাদ কাশেম মুক্তিযোদ্ধাদের হাতে ধরা পড়ার পর জানায়, সে তরতাজা মানুষকে জবাই করেছে। পরবর্তীতে বীর মুক্তিযোদ্ধা হাবিলদার মোবারক এই জল্লাদ কাশেমকে বেয়নেট দিয়ে খুচিয়ে হত্যা করে।[৯৬৯]

উপসংহারঃ

সাতক্ষীরাতে প্রায় নয় মাস ব্যাপী পাকিস্তানী হানাদার বাহিনী এবং এদেশীয় তাদের সহযোগিরা যে হত্যাযজ্ঞ চালায় তার বর্ণনা হৃদয়গ্রাহী। সমস্ত সাতক্ষীরা অঞ্চল একটি বৃহৎ বধ্যভূমিতে পরিনত করে পাকিস্তানী সেনারা খুলনায় গিয়ে ভারতীয় মিত্র বাহিনীর কাছে আত্মসমর্পন করে। অনেক বধ্যভূমি সংরক্ষণের অভাবে বিলীন হয়ে গেছে। যে সকল স্থানে গণহত্যা হয়েছে তন্মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল ঝাউডাঙ্গার গণহত্যা, টাউন শ্রীপুরের গণহত্যা, কাক শিয়ালী ব্রিজের গণহত্যা।

---

[৯৬৩] ঐ।
[৯৬৪] ঐ।
[৯৬৫] মোঃ আবুল হোসেন, 'প্রাগুক্ত' পৃষ্ঠা- ১৫৭।
[৯৬৬] ঐ।
[৯৬৭] ঐ।
[৯৬৮] ঐ।
[৯৬৯] ঐ।

পঞ্চম অধ্যায়

উপসংহার

১৯৭১ সালের মুক্তিযুদ্ধে সাতক্ষীরা জেলার মানুষের ভূমিকা পর্যালোচনা করলে দেখা যায় যে, এক শ্রেণীর মানুষের অবদান গৌরবময় অন্য শ্রেণীর মানুষের কলঙ্ক জনক ভূমিকা রয়েছে। এ অঞ্চলের মানুষের বীরত্বের ইতিহাস সুপ্রাচীন কালের। স্বাধীনতা সংগ্রামের ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপটে ব্রিটিশ এবং উপনিবেশিক শাসনের এবং শোষনের বিরুদ্ধে গড়ে ওঠা দুর্বার গণআন্দোলনে অংশগ্রহণ করে, মুক্তিযুদ্ধেও তারা ব্যাপক অংশগ্রহণের মাধ্যমে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। তাদের এই সর্বাত্বক অংশগ্রহণ সামগ্রিক পরিস্থিতিকে বিশেষভাবে প্রভাবিত করে।

সাতক্ষীরা ভারতের সীমান্তবর্তী একটি জেলা হওয়ায় এই অঞ্চল অবস্থানগত কারণে মুক্তিযুদ্ধের ক্ষেত্রে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। বাংলাদেশের দক্ষিণ পূর্বাঞ্চলের মানুষ যখন স্থানীয় রাজাকার আলবদর এবং পাকিস্তানী সেনাদের সীমাহীন অত্যাচারে তাদের ভিটেমাটি ছেড়ে শরণার্থী হিসেবে ভারতে আশ্রয় নেয়, তখন তাদের এই অঞ্চলের মানুষ সর্বাত্মক সহযোগিতা করে।

ভাষা আন্দোলনে এ অঞ্চলের মানুষ স্বতঃস্ফুর্ত ভাবে অংশগ্রহণ করে। ১৯৪৭ সালের দেশ বিভাগের পর পশ্চিম বাংলা থেকে যে সকল উগ্রপন্থী উর্দু ভাষী মোহাজেররা এ অঞ্চলে বসতি স্থাপন করে তাদের অত্যাচার উপেক্ষা করে ১৯৫৪ সালের প্রাদেশিক নির্বাচনে এই এলাকার সব আসনে যুক্তফ্রন্ট বিজয়ী হয়।

সাতক্ষীরা অঞ্চলের বেশীর ভাগ মানুষ ছিল অসাম্প্রদায়িক চেতনার। ১৯৪৭ সালে দেশ বিভক্তির সময় এই অঞ্চল ছিল ৫১ শতাংশ হিন্দু সম্প্রদায়ের মানুষের বসত ভূমি। হিন্দু মুসলিম সম্প্রদায়ের মানুষ পাশাপাশি অসাম্প্রদায়িক চেতনা নিয়ে এই অঞ্চলে দীর্ঘদিন থেকে বসবাস করতে থাকে। এ সকল মানুষ একদিকে যেমন শান্তি প্রিয় অন্যদিকে শোষন এবং নির্যাতনের বিরুদ্ধে প্রতিবাদী। সকল নিপিড়নের বিরুদ্দে প্রতিবাদী মনোভাব, জমিদার শ্রেণীর বিরুদ্ধে কৃষক আন্দোলন, অবাঙালি শিল্প কারখানার মালিকদের বিরুদ্ধে শ্রমিক আন্দোলন, সামরিক শাসনের বিরুদ্ধে আন্দোলন এবং সর্বপরি মুক্ত চিন্তাশীল মনোভাবাপন্ন সাতক্ষীরা বাসীর বিরুদ্ধে পাকিস্তানী বাহিনী কঠোর নির্যাতন মূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করে। পাকিস্তান সরকার তাদের প্রধান শত্রু হিসেবে বেছে নেয় হিন্দু সম্প্রদায়ের মানুষকে। রাজাকার, আলবদর, আল শামস বাহিনী গঠন করে তাদের কে লেলিয়ে দেয় শান্তি প্রিয় হিন্দু সম্প্রদায়ের মানুষের উপর এবং মুক্তমনা মুসলমানদের উপর।

Dhaka University Institutional Repository

রাজাকার এবং শান্তি কমিটির নীতি ছিল হিন্দু সম্প্রদায়ের নারী এবং সম্পত্তি হল গনিমতের মাল, এ সম্পদ লুট ও ভোগ করা যায়েজ ।

পাকিস্তান সরকার এই অঞ্চলের অস্থিতিশীল পরিস্থিতির জন্য হিন্দু এবং ভারতকে দোষারোপ করতে থাকে । তাদের ধারণা সংখ্যালঘু হিন্দু সম্প্রদায়কে বিতাড়ন করতে পারলে এ অঞ্চলে ভারত সরকারের তৎপরতা হ্রাস পাবে, এমন কি সরকার বিরোধী আন্দোলন ভিন্ন খাতে প্রবাহিত করা যাবে তাছাড়া সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের সম্পত্তি মুসলিম লীগ সমর্থিত রাজাকার, আলবদর, আল শামস বাহিনীর হাতে আসবে । সাতক্ষীরা মহকুমা রাজাকার বাহিনীর প্রধান কমান্ডার জয়নুদ্দীন আহমেদ, ডেপুটি কমান্ডার ইছাহাক আলী, সাতক্ষীরার বুধহাটা, আশাশুনি, কালীগঞ্জ এলাকায় হিন্দু সম্প্রদায়ের লোকদের হত্যা করতে থাকে । আশাশুনির বড় দল ইউনিয়নের চেয়ারম্যান রাজাকার আশরাফ উদ্দীন মকবুল অত্র অঞ্চলের হিন্দুদের ২৪ ঘন্টার মধ্যে দেশ ত্যাগের নির্দেশ দেন । পিচ কমিটির নেতা আতিয়ার রমান ও তার ভাই মতিয়ার রহমান ২৩ মার্চ ১৯৭১ রিক্সা চালক আব্দুর রাজ্জাককে গুলি করে হত্যা করে । এভাবে শাসক গোষ্ঠী সাতক্ষীরা অঞ্চলে সন্ত্রাসের রাজত্ব কায়েম করে । এত কিছুর পরও সাতক্ষীরার মানুষ পাকিস্তানি শাসক গোষ্ঠীকে এ অঞ্চলে তাদের কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করতে দেয়নি । সাতক্ষীরার সাধারণ মানুষ এই সকল প্রতিক্রিয়াশীল কার্যক্রম ও পাক সামরিক শাসনের বিরুদ্ধে কঠোর হয় এবং হিংসাত্মক পথ বেছে নেয় । এভাবে ১৯৫২ সালের ভাষা আন্দোলন, ১৯৬৬ সালের ৬ দফা দাবী, ১৯৬৯ সালের গণঅভ্যুত্থান, ১৯৭০ সালের সাধারণ নির্বাচন, ১৯৭১ সালের মুক্তিসংগ্রাম সাতক্ষীরার সমস্ত এলাকায় বিস্তার লাভ করে । বাংলাদেশের অন্যান্য অঞ্চলের ন্যায় সাতক্ষীরার মানুষও বাঙালি জাতির গৌরবময় যুদ্ধে অনবদ্য অবদান রাখে ।

মার্চ মাসের শেষ দিকে যখন নিরস্ত্র বাঙালিদের উপর পাকিস্তানী হানাদার বাহিনী নারকীয় হত্যাযজ্ঞ চালাতে থাকে তখন সাতক্ষীরার সাধারণ মানুষের ভূমিকা ছিল অত্যন্ত ইতিবাচক ।

মুক্তিযুদ্ধের প্রথমদিকে যখন প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত মুক্তিযোদ্ধারা পূর্ব রণাঙ্গনে এসে পৌছায়নি তখন মূলত পাকিস্তানী বাহিনী ও রাজাকার বাহিনীকে মোকাবেলা করেছে কিছু বামপন্থী সংগঠনের নেতৃবৃন্দ । যাদের নাম পাওয়া যায় তাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য খুলনার আব্দুল হকের নেতৃত্বাধীন সশস্ত্র গ্রুপ, আব্দুল মজিদ, রফিক, আব্দুর রউফ, শহীদ খালেদ রশীদ গুরু, কামরুজ্জামান লিচু, হাফিজুর রহমান, আজিজুর রহমান প্রমুখ্য । তালা উপজেলার খলিশখালী অঞ্চলের ঘাঁটির নেতা আজমল হক, (পাক বাহিনীর হাতে গ্রেফতারে পর নিখোঁজ) । সাতক্ষীরার তালার তেঁতুলিয়া এলাকায় আর একটি শক্ত ঘাঁটি স্থাপন করেন কামেল বখত্ এর নেতৃত্বাধীন সশস্ত্র বাহিনী । তাদের পাশাপাশি সাতক্ষীরার সর্বস্তরের সাধারণ মানুষ বাঁশের লাঠি, দেশীয় অস্ত্র নিয়ে পাকিস্তানী হানাদার বাহিনীকে প্রতিরোধে ঝাঁপিয়ে পড়ে । পাকিস্তানী সেনাদের তারা প্রতিরোধ করতে না পারলেও নৈতিকভাবে তারা বিজয় লাভ করে একথা বলা যায় । কারণ সাতক্ষীরার মুক্তিকামী সাধারণ মানুষ পরাজিত

Dhaka University Institutional Repository

হলেও তারা দীর্ঘমেয়াদী যুদ্ধের প্রস্তুতি নিতে থাকে। এ সকল বাহিনীর সদস্যগণ পাকিস্তানী বাহিনীর সদস্যদের উপর মাঝে মাঝে গেরিলা হামলা চালিয়ে মুক্তিযুদ্ধের পক্ষে নিজেদের অঙ্গীকারের কথা জানান দেয়।

এ অঞ্চলের মুক্তিযোদ্ধাদের আর একটি বড় প্রতিবন্ধকতা হল অধিকাংশ এলাকা জনশূন্যতায় পরিণত হওয়া। মুক্তিযোদ্ধাদের খাদ্য, আশ্রয়, পথ নির্দেশনার কাজে সাহায্য করে পাকিস্তানী বাহিনীর পরাজয় ত্বরান্বিত করত এ সকল সাধারণ মানুষ। অনেক গ্রাম হিন্দু সম্প্রদায়ের বসতি হওয়ায় তারা ভারতে পালিয়ে যেতে বাধ্য হওয়ায় মুক্তিযোদ্ধারা অতিরিক্ত প্রতিবন্ধকতার সম্মুখীন হয়। জনশূন্য এ সকল এলাকা পাকিস্তানী সেনাএবং রাজাকার বাহিনীর দখলে চলে যাওয়ায় মুক্তিযোদ্ধাদের শত্রুর অবস্থান নির্ধারণ করা কঠিন হয়ে পড়ে। তাদের রাতের আঁধারে চলাচল করতে হত।

সাতক্ষীরা অঞ্চলে মুক্তিযোদ্ধাদের আর একটি বড় অসুবিধা হল বিশাল রাজাকার বাহিনী। ১৯৪৭ পরবর্তী পশ্চিম বঙ্গ থেকে পূর্ব বাংলায় বসতি স্থাপনাকারীদের একটা বড় অংশের পাকিস্তানের প্রতি অধিক দুর্বলতা ছিল। যা পাকিস্তানীদের শক্তি বৃদ্ধি করে। এই সকল রাজাকাররা পাকিস্তানী সেনাদের এদেশের পথ ঘাট চিনতে সহযোগিতা করত এবং সুন্দরী মেয়েদের সন্ধান দিত। এ সকল কারণে যুদ্ধরত মুক্তিযোদ্ধাদের বহুমাত্রিক সমস্যা মোকাবেলা করতে হয়।

মুক্তিযোদ্ধাদের একটি বড় সুবিধা ছিল ভারতের সীমান্ত কাছাকাছি। এখানে সেক্টর কমান্ডের অধীন মুক্তিযোদ্ধা, মুজিব বাহিনী, নৌকামান্ডো সমবেত ভাবে যুদ্ধ করে। সাতক্ষীরা অঞ্চলে মুজিব বাহিনীর নেতৃত্বে ছিলেন ইঞ্জিনিয়ার মুজিবুর রহমান, ছাত্র নেতা মোস্তাফিজুর রহমান, আব্দুস সালাম মোড়ল প্রমুখ্য।

সাতক্ষীরার নদী পথে পূর্বাঞ্চল থেকে নৌকা যোগে শরণার্থীরা যখন ভারতে যাওয়ার চেষ্টা করত তখন রাজাকার এবং পাক সেনারা বিভিন্ন স্থানে ওৎ পেতে বসে থাকত এবং সেখানে নারকীয় হত্যা যজ্ঞে মেতে উঠত। মূলত ১৯৭১ সালে রাজাকার এবং পাকিস্তানী বাহিনীর সদস্যরা সাতক্ষীরার নদ নদী এবং ভূখন্ডকে বদ্ধভূমিতে পরিণত করে। যে সকল এলাকায় সবচেয়ে বেশি গণহত্যা চালান হয়েছিল তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল- হরিনগর বাজার, কাতখালি, ইছামতি নদী, পারুলিয়ার গণহত্যা, হাদিপুরের গণহত্যা, টাউন শ্রীপুরের গণহত্যা, কুলিয়া ব্রিজের গণহত্যা, টাউন হাইস্কুল মাঠের গণহত্যা, পার কুমিরার গণহত্যা, গোয়াল পোতার গণহত্যা, রাটীপাড়ার গণহত্যা উল্লেখযোগ্য। যে সকল এলাকায় রক্তক্ষয়ী যুদ্ধ সংঘটিত হয়েছিল সেগুলোর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল- টাউন শ্রীপুরের যুদ্ধ, রামজীবনপুরের যুদ্ধ, মাগুরার যুদ্ধ, শ্যামনগরের যুদ্ধ।

এই যুদ্ধে সেনাবাহিনী, ই,পি,আর এবং পুলিশ বাহিনীর সদস্যদের অংশগ্রহণ থাকলেও সাধারণ মুক্তিযোদ্ধাদের সংখ্যা ছিল সর্বাধিক। মুক্তিযোদ্ধাদের খাদ্য ও রসদ সরবরাহ সর্বপরি শত্রুর অবস্থানের তথ্য

Dhaka University Institutional Repository

দিয়ে এ অঞ্চলের শিশু, বৃদ্ধ, নারী, পুরুষ নির্বিশেষে সকল মানুষ মুক্তিবাহিনীর পাশে এসে দাঁড়াত। প্রতিটি যুদ্ধ ক্ষেত্রের চার পাশে সাধারণ মানুষ জড়ো হত যা মুক্তিযোদ্ধাদের মনোবল বৃদ্ধি করত।

মুক্তিযুদ্ধে ভারতের অনবদ্য অবদান ছিল। লক্ষ লক্ষ নির্যাতিত মানুষের অবদান ও অনস্বীকার্য। এই যুদ্ধে যে সকল মা-বোন তাদের সম্ভ্রম হারিয়েছে তাদের অবদানও অনস্বীকার্য। ৭ ডিসেম্বর সাতক্ষীরা মুক্ত হওয়ার পর পাক সেনা বাহিনী পিছু হটতে হটতে খুলনায় অবস্থান নেয়। ১০ ডিসেম্বর থেকে ১৬ ডিসেম্বর পর্যন্ত পাকিস্তানী সেনা এবং রাজাকার বাহিনী খুলনায় নারকীয় হত্যা কান্ড, লুটতরাজ এবং ধ্বংসলীলায় মেতে ওঠে।

১৭ ডিসেম্বর ১৯৭১ সালে খুলনায় পাকিস্তানী সেনা বাহিনীর কমান্ডার জেনারেল দলবীর সিং এবং দেশপান্ডের নিকট আতমসমর্পন করে। আত্মসসর্পনের পর তারা জেনেভা কনভেনশনের বিধি মোতাবেক যুদ্ধ বন্ধীদের সুবিধা পায়। ফলে তাদের মুক্তিযোদ্ধা এবং নির্যাতিত মানুষের ত থেকে রক্ষা হয়।

পাকিস্তানী বাহিনী পরাজয়ের মধ্য দিয়ে স্বাধীনতা অর্জিত হলেও সাতক্ষীরার নির্যাতিত মানুষ সে আঘাত আজও বয়ে বেড়ায়। এর একটা সুদুর প্রসারী ফলাফল হল হিন্দু সম্প্রদায়ের মানুষের গণহারে দেশত্যাগ। আন্তর্জাতিক আইনের আশ্রয়ে রাজাকাররা রক্ষা পেয়ে যায়। অনেকে পালিয়ে যায়। হাজার হাজার শহীদ পরিবারের সদস্য, যুদ্ধাহত বীর মুক্তিযোদ্ধা, নির্যাতিত নারী কেবল দুঃসহ স্মৃতি নিয়ে বেঁচে থাকে।

Dhaka University Institutional Repository

গ্রন্থ তালিকা

১. আসাদ, আসাদুজ্জামান, *একাত্তরের গণহত্যা ও নারী নির্যাতন*
সময় প্রকাশন, ঢাকা, ১৯৯২ ।

২. আসাদ, আসাদুজ্জামান, *মুক্তিযুদ্ধ ও মিত্র বাহিনী*
কৃষ্টি প্রকাশনী, ঢাকা, ১৯৯৬ ।

৩. আরেফিন, এ.এস.এম সামছুল, *মুক্তিযুদ্ধে পুলিশের ভূমিকা,*
পুলিশ হেড কোয়ার্টার, ঢাকা, ২০০০ ।

৪. আরেফিন, এ.এস.এম সামছুর, *মুক্তিযুদ্ধের প্রেক্ষাপটে ব্যক্তির অবস্থান,*
ইউ.পি.এল, ঢাকা, ১৯৯৫

৫. আরেফিন, এস.এস.এম সামছুল, *রাজাকার ও দালাল অভিযানে গ্রেফতারকৃতদের তালিকা*
(ডিসেম্বর ১৯৭১ থেকে মার্চ ১৯৭২ পর্যন্ত) বাংলাদেশ রিমার্চ এ্যান্ড পাবলিকেশন্স, ঢাকা, ২০০১ ।

৬. আহমদ, আবুল মনসুর, *আমার দেখা রাজনীতির পঞ্চাশ বছর, ১ম খন্ড*
সৃজন প্রকাশনী, ঢাকা, ১৯৮৮ ।

৭. আজাদ, মৌলানা আবুল কামাল, *ভারত স্বাধীন হল* (ওরিয়েন্টাল লংম্যান লিঃ, কলিকাতা), ১৯৯৩ ।

৮. আলীম, মোঃ মাসুম, *হযরত খান জাহান আলীঃ জীবন ও কর্ম*
(আল-মাকতাবাতুশ- শাফিয়া, রাজশাহী), ২০০২ ।

৯. আতিউর, রহমান, *অসহযোগের দিনগুলিঃ মুক্তিযুদ্ধে প্রস্তুতি পর্ব*
সাহিত্য প্রকাশ, ঢাকা, ১৯৯৮ ।

১০. আলী, মীর আমীর, *খুলনা শহরের ইতিকথা* (ইস্টার্ণ প্রেস, খুলনা), ১৯৮০ ।

১১. আলী, মীর আমীর, *ডুমুরিয়ার কৃষক আন্দোলন ও বিষ্ণু চ্যাটার্জী* (মীর আমীর আলী, খুলনা), ১৯৮৬ ।

১২. ইসলাম, রফিকুল, *গণহত্যা ও নারী নির্যাতনের কড়চা, ১৯৭১* (অনন্যা প্রকাশনী, ঢাকা), ১৯৯৪ ।

১৩. ইসলাম, রফিকুল, *পি.এস.সি একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধঃ প্রতিরোধের প্রথম প্রহর*
ইউ.পি.এল, ঢাকা, ১৯৭১ ।

১৪. ইসলাম, নূরুল, *যে আগুন ছড়িয়ে গেল সবখানে*, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ১৯৯০ ।

১৫. ইমাম, এইচ.টি. *বাংলাদেশ সরকার ১৯৭১*
আগামী প্রকাশনী, ঢাকা, ২০০৪ ।

Dhaka University Institutional Repository

১৬. ইলিয়াস, খোন্দকার মোহাম্মদ, ***মুজিববাদ***
(ঢাকাঃ সাম্য প্রকাশলী), ১৯৯৭ ।

১৭. ইসলাম, নজরুল, ***বাংলার হিন্দু-মুসলিম সম্পর্ক***
মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স, কলিকাতা, ১৪০৬ বাংলা ।

১৮. ইসলাম, এস.এম সফিকুল, ***ইস্পাতের পথে***
বইপত্র পাবলিকেশন, রাজশাহী, ১৯৯৫ ।

১৯. ইসলাম, মোঃ নূরুল, ***খুলনা জেলা*** (সাপ্তাহিক খুলনা, খুলনা), ১৯৮২ ।

২০. ইসলাম, রফিকুল বীর উত্তম, ***লক্ষ প্রাণের বিনিময়*** (অনন্যা প্রকাশন, ঢাকা), ১৯৮৯ ।

২১. ইসলাম, রফিকুল বীর উত্তম, ***মুক্তির সোপানতলে*** (আগামী প্রকাশনী, খুলনা), ২০০১ ।

২২. ইসলাম, রফিকুল বীর উত্তম, ***মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস*** (কাকলী প্রকাশনী, ঢাকা), ১৯৯৫ ।

২৩. ইসলাম, রফিকুল বীর উত্তম, ***বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রাম*** (আগামী প্রকাশনী, ঢাকা), ১৯৯৬ ।

২৪. উদ্দীন, প্রফেসর সালাহ আহমদ ও অন্যান্য (সম্পাদিত), ***বাংলাদেশের মুক্তিসংগ্রামের ইতিহাস ১৯৪৭-১৯৭১***, আগামী প্রকাশনী, ঢাকা, ১৯৯৭ ।

২৫. উদ্দীন, জিয়া, ***মুক্তিযুদ্ধে সুন্দরবনের সেই উত্তাল দিনগুলি***
(মুক্তিযোদ্ধা প্রকাশনী, ঢাকা), ১৯৯৩ ।

২৬. হাসান আহমেদ ফারুক, ***উত্তাল মার্চ***
আগামী প্রকাশনী, ঢাকা, ১৯৯৭ ।
উদ্দিন, নাসির, ***যুদ্ধে যুদ্ধে স্বাধীনতা*** (আগামী প্রকাশনী, ঢাকা), ১৯৯৭ ।

২৭. উমর, বদরুদ্দীন, ***একাত্তরের স্বাধীনতা যুদ্ধে বাংলাদেশের কমিউনিস্টদের রাজনৈতিক ভূমিকা***
জাতীয় গ্রন্থ প্রকাশ, ঢাকা, ১৯৯৬ ।

২৮. উমর, বদরুদ্দীন, ***পূর্ব-বাংলার ভাষা আন্দোলন ও তৎকালীন রাজনীতি, ১ম খন্ড***
মাওলা ব্রাদার্স, ঢাকা, ১৯৭৫ ।

২৯. এ্যান্থনী, ম্যাসকারেরহাস (রণাত্রি অনুদিত), ***দ্যা রেইপ অব বাংলাদেশ, তৃতীয় সংস্করণ***
পপুলার পাবলিশার্স, ঢাকা, ১৯৯৬ ।

৩০. কাদির, মোহাম্মদ নূরুল, ***একাত্তর আমার*** (সাহিত্য প্রকাশ, ঢাকা), ১৯৯৯ ।

৩১. কামাল, মেসবাহ, আসাদ ও ***উনসত্তরের গণঅভ্যুত্থান*** (বিবর্তন, ঢাকা), ১৯৮৬ ।

৩২. কাদের, মুহম্মদ নূরুল, ***দুশো ছেষট্টি দিনে স্বাধীনতা*** (মুক্ত প্রকাশনী, ঢাকা), ২০০০ ।

Dhaka University Institutional Repository

৩৩. কর্নেল শাফায়াত জামিল (অবঃ), *একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধ রক্তাক্ত মধ্য আগষ্ট ও ষড়যন্ত্র ময় নভেম্বর,* তৃতীয় প্রকাশ, সাহিত্য প্রকাশ, ঢাকা, মার্চ-২০০৯ ।

৩৪. খান, কবি মোহাম্মাদ হরমুজ আলী *মুক্তিযুদ্ধের পল্লীচিত্র* সাহিত্য প্রকাশ, ঢাকা, ২০০২ ।

৩৫. কমান্ডো মোঃ খলিলুর রহমান, *মুক্তিযুদ্ধঃ নাবিক ও নৌ-কমান্ডোদের জীবন গাঁথা* শিরীন রহমান, ঢাকা, ২০০১ ।

৩৬. কাদের, এম. আব্দুল, *সুন্দরবনে ইসলাম, বাংলা একাডেমী পত্রিকা* বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ১৩৬৬ (বাংলা) ।

৩৭. খান, আতাউর রহমান ওজারতির দুই বছর (ঢাকাঃ নওরোজ কিতাবিস্তান), ১৯৭২ ।

৩৮. করিম আব্দুল, *ভারতীয় উপমহাদেশের মুসলিম শাসন* বড়াল প্রকাশনী, ঢাকা, ২০০১ ।

৩৯. ঘোষ, জয়ন্ত কুমার, *জীবন স্মৃতিঃ বিজ্ঞানী আচার্য প্রফুল্ল চন্দ্র রায়* কপোতাক্ষ প্রকাশনী, ঢাকা, ২০০২ ।

৪০. চৌধুরী , আবু ওসমান, *এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম* সেবা পাবলিশার্স, ঢাকা, ১৯৯১ ।

৪১. চৌধুরী, আসাদ ও এনামুল কবীর, *যাদের রক্তে মুক্ত এ দেশ* একাডেমিক পাবলিশার্স, ঢাকা, ১৯৯১ ।

৪২. চক্রবর্তী, রতন লাল (সম্পাদিতু), *ভাষা আন্দোলনের দলিলপত্র* (বাংলা একাডেমী, ঢাকা), ২০০০ ।

৪৩. চৌধুরী, জহুর হোসেন, দরবার-ই-জহুর (ঢাকাঃ লালন প্রকাশনী), ১৯৮৫ ।

৪৪. জলিল, এম.এ. *সীমাহীন সমর* (জনতা প্রকাশন, ঢাকা), ১৯৪৭ ।

৪৫. জলিল, এ.এফ.এম আব্দুল, *আমার দেখা আইন আদালত* খোররোজ কিতাব মহল, ঢাকা, ১৯৭৫ ।

৪৬. জলিল, এ.এফ.এম আব্দুল, *সুন্দরবনের ইতিহাস, ২য় সংস্করণ* আহমদ পাবলিশিং হাউস, ঢাকা, ১৯৮৬ ।

৪৭. টুটু, আশরাফ-উল-আলম, *ভাষা আন্দোলনে খুলনা*

Dhaka University Institutional Repository

উপকুলীয় উন্নয়ন সহযোগী, খুলনা ২০০১ ।

৪৮. বিশ্বাস, সুকুমার, *অসহযোগ আন্দোলন, ৭১ ও বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব*
আগামী প্রকাশনী, ঢাকা, ১৯৯৬ ।

৪৯. দে, অমলেন্দু, *স্বাধীন বঙ্গভূমি গঠনের পরিকল্পনাঃ প্রয়াস ও পরিণতি*
রত্না প্রকাশন, কলিকাতা, ১৯৭৪ ।

৫০. দে, অমলেন্দু, *পাকিস্তান প্রস্তাব ও ফজলুল হক*
পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষদ, কলিকাতা, ১৯৮৯ ।

৫১. তালিব, মুহাম্মদ আবু, *খুলনা জেলায় ইসলাম* (ইসলামী ফাউন্ডেশন, ঢাকা), ১৯৮৮ ।

৫২. নাগ অজিত কুমার, *স্বাধীনতা সংগ্রামে খুলনা*
দে'জ পাবলিকেশন্স, বিদ্যুৎ বসু, কলিকাতা, ১৯৮৪ ।

৫৩. ফরিদী, আ.ফ.ম. আব্দুল ও অন্যান্য (সম্পাদিত), *ইসলামী বিশ্বকোষ, ১০ খন্ড*
ইসলামী ফাউন্ডেশন, ঢাকা, ১৯৯১ ।

৫৪. মন্ডল, আকতারুজ্জামান, *উত্তর রণাঙ্গণে বিজয়*
জাতীয় সাহিত্য প্রকাশনী, ঢাকা, ১৯৯০ ।

৫৫. মামুন, মুনতাসীর, *রাজাকারের মন* (মাওলা ব্রাদার্স, ঢাকা), ২০০০ ।

৫৬. মামুন, মুনতাসীর, *রাজাকারের মন* (মাওলা ব্রাদার্স, ঢাকা), ২০০০ ।

৫৭. মিয়া, শেখ গাউস, *বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ সুন্দরবন সাব-সেক্টর,*
আগামী প্রকাশন, প্রথম প্রকাশ, ফেব্রুয়ারী ২০১১ ।

৫৮. মামুন, মুনতাসীর, *পরাজিত পাকিস্তানী জেনারেলদের দৃষ্টিতে মুক্তিযুদ্ধ*
(সময় প্রকাশন, ঢাকা), ১৯৯৯ ।

৫৯. মামুন, মুনতাসীর, *সেই সবদিন* (সময় প্রকাশন, ঢাকা), ১৯৯৮ ।

৬০. মামুন, মুনতাসীর, *একাত্তরের বিজয় গাথা* (আগামী প্রকাশনী, ঢাকা), ১৯৯২ ।

৬১. মামুন, মুনতাসীর, *সেই সব পাকিস্তানী* (ইউ.পি.এল, ঢাকা), ১৯৯৯ ।

৬২. মামুন, মুনতাসীর, *ইয়াহিয়া খান ও মুক্তিযুদ্ধ* (সময় প্রকাশন, ঢাকা), ২০০১ ।

৬৩. মামুন, মুনতাসীর (সম্পাদিত), মুক্তিযুদ্ধ কোষ দ্বিতীয় খন্ড (সময় প্রকাশন, ঢাকা), ২০০৫ ।

৬৪. মামুন, মুনতাসীর (সম্পাদিত), *১৯৭১ ঃ চুকনগরে গণহত্যা* (বাংলাদেশ চর্চা, ঢাকা), ২০০২ ।

৬৫. মিয়া, শেখ গাউস, *খুলনা মহানগরঃ ইতিহাসের আলোকে*
আলী হাফেজ ফাউন্ডেশন, খুলনা, ২০০১ ।

Dhaka University Institutional Repository

৬৬. মিয়া, এম.এ ওয়াজেদ, ***বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবকে ঘিরে কিছু ঘটনা ও বাংলাদেশ***
ইউ.পি.এল, ঢাকা, ১৯৯৩ ।

৬৭. রেহমান, তারেক শামসুর (সম্পাদিত), ***বাংলাদেশঃ রাজনীতির ২৫ বছর, ১ম খন্ড***
মাওলা ব্রাদার্স, ঢাকা, ১৯৮৮ ।

৬৮. মিত্র, অশোক, ***অমর কৃষক নেতা বিষ্ণু চট্টোপাধ্যায়- ১৯১০-১৯৭১***
বাংলাদেশ মুক্তিসংগ্রাম সহায়ক সমিতি, কলিকাতা, ১৯৭১ ।

৬৯. সফিউল্লাহ, মেজর জেনারেল কে.এম. বীর উত্তম, ***ভাষান্তর,*** সিদ্দিকুর রহমান, ***মুক্তিযুদ্ধে বাংলাদেশ***
(আগামী প্রকাশনী, ঢাকা), ১৯৯৫ ।

৭০. মুহিত, আবুল মাল আব্দুল, ***স্মৃতি ১৯৭১***
আগামী প্রকাশন, ঢাকা, ১৯৯৭ ।

৭১. রহমান, আতিউর ও লেলিন আজাদ, ***ভাষা আন্দোলনঃ পরিপ্রেক্ষিত ও বিচার***
ইউ.পি.এল, ঢাকা, ১৯৯০ ।

৭২. রহমান, আতিউর, ***মুক্তিযুদ্ধের মানুষ মুক্তিযুদ্ধের স্বপ্ন***
(ঢাকা, সাহিত্য প্রকাশ), ১৯৯৭ ।

৭৩. হাশিম, আবুল, ***আমার জীবন ও বিভাগ পূর্ব বাংলাদেশের রাজনীতি,***
অনুবাদ- শাহাবুদ্দিন মোহাম্মদ আলী, নওরোজ কিতাবিস্তান, ঢাকা, ১৯৮৭ ।

৭৪. রহমান, আতিউর ও সৈয়দ হাশেমী, ***ভাষা আন্দোলনঃ অংশগ্রহণকারীদের শ্রেণী অবস্থান***
ইউ.পি.এল, ঢাকা, ১৯৯০ ।

৭৫. রহমান, এ.কে.এম মুস্তাফিজুর (সম্পাদিত),
মিথুন প্রকাশনী, খুলনা, ১৯৮০ ।

৭৬. রহমান, মোঃ মাহবুবর, ***বাংলাদেশের ইতিহাস, ১৯৪৭-৭১***
সময় প্রকাশন, ঢাকা, ১৯৯৯ ।

৭৭. রহমান, মোঃ মাহবুবর, ***একাত্তরে গাইবান্ধা***
বাংলাদেশ চর্চা, ঢাকা, ২০০৫ ।

৭৮. রবার্ট পেইন (অনুঃ) গোলাম হিলালী, ম্যাসাকারঃ ***বাংলাদেশের গণহত্যার ইতিহাসে ভয়ংকর অধ্যায়***
(ইউ.পি.এল, ঢাকা) (তারিখ বিহীন)

৭৯. সিদ্দিকী, কাদের বীরউত্তম, ***স্বাধীনতা'৭১***
দে'জ পাবলিশিং, কলিকাতা, ১৯৮৫ ।

Dhaka University Institutional Repository

৮০. শামসুদ্দিন, আবুল কালাম, ***শহর খুলনার আদিপর্ব***
সাহিত্য মজলিশ, খুলনা, ১৯৮৬ ।

৮১. সাইয়িদ, অধ্যাপক আবু, ***বাংলাদেশের স্বাধীনতাঃ যুদ্ধের আড়ালে যুদ্ধ***
মোঃ শরীফ আহমেদ, ১৯৮৯ ।

৮২. সাইয়িদ,অধ্যাপক আবু, ***বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধের আড়ালে যুদ্ধ***
অন্যন্যা প্রকাশ, ঢাকা, ১৯৯৯ ।

৮৩. শরীফ, আহমদ ও অন্যান্য (সম্পাদিত), ***একাত্তরের ঘাতক ও দালালরা কে কোথায়***
মুক্তিযুদ্ধের চেতনা বিকাশ কেন্দ্র, ঢাকা, ১৯৮০ ।

৮৪. সেলিম, মোহাম্মদ, ***বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ ও ভারতের রাজনৈতিক দল, বাংলাদেশ চর্চা,***
প্রথম প্রকাশ- ফেব্রুয়ারী বইমেলা-২০০৪ ।

৮৫. সামাদ, বেদুঈন, ***একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধ*** (স্টুডেন্ট ওয়েজ, ঢাকা), ২০০০ ।

৮৬. হালিম, মুহাম্মদ আব্দুল, ***পুরাঘটিত বর্তমান*** (চিত্র প্রকাশনী, ঢাকা), ১৩৯৩ বাংলা ।

৮৭. হালিম, মুহাম্মদ আব্দুল, ***খুলনার ঐতিহ্য*** (আশরাফ-উল-আলম টুটু, খুলনা)-২০০১ ।

৮৮. হেলাল, বশির আল, ***ভাষা আন্দোলনের ইতিহাস*** (বাংলা একাডেমী, ঢাকা), ১৯৯৯ ।

৮৯. হাসান, মঈদুল ও অন্যান্য (সম্পাদিত), ***মুক্তিযুদ্ধে বরিশালঃ প্রত্যক্ষদর্শী ও অংশগ্রহণকারীর বিবরণ***
(মাওলা ব্রাদার্স, ঢাকা), ২০০৩ ।

৯০. হাসান, মঈদুল, ***মূলধারা ৭১*** (ইউ.পি.এল, ঢাকা), ১৯৮৬ ।

৯১. হান্নান, ড. মোহাম্মদ, ***বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস***
হাকিম এন্ড সন্স, কলিকাতা ১৯৯৪ ।

৯২. হুদা, নূরুল (সম্পাদিত), ***লেখকের রোজনামচায় চার দশকের রাজনীতি পরিক্রমা প্রেক্ষাপটঃ***
বাংলাদেশ- ১৯৫৩-৯৩, ইউ.পি.এল, ঢাকা, ১৯৯৬ ।

৯৩. রায়, নীহারঞ্জন, ***বাঙালীর ইতিহাসঃ আদি পর্ব***, দে'জ পাবলিশিং, কলিকাতা, ১৯৯৩ ।

৯৪. হোসেন, মোয়াজ্জেম ও অন্যান্য (সম্পাদিত), ***রংপুর জেলার ইতিহাস***
(রংপুর জেলাঃ জেলা প্রশাসন, রংপুর), ২০০০ ।

৯৫. হোসেন, কামাল, ***মুক্তিযুদ্ধ কেন অনিবার্য ছিলঃ***
মাওলা ব্রাদার্স, ঢাকা, তৃতীয় মুদ্রণ মে-১৯৯৯ ।

৯৬. হোসেন, আবু মোহাম্মদ দেলোয়ার ও সাহিদা বেগম, ***মুক্তিযুদ্ধে শহীদ আইনজীবী***
আইন ও সালিশ কেন্দ্র, ঢাকা, ১৯৯৮ ।

Dhaka University Institutional Repository

৯৭. হক, আবুল কাশেম ফজলুল, *বাংলাদেশের রাজনীতিতে বুদ্ধিজীবীদের ভূমিকা*
কাশবন প্রকাশন, ঢাকা, ১৯৯৭ ।

৯৮. হোসেন, আবু মোহাম্মদ দেলোয়ার (সম্পাদিত), *ভাষা আন্দোলনের আঞ্চলিক ইতিহাস*
বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ২০০০ ।

৯৯. হোসেন, আবু মোহাম্মদ দেলোয়ার (সম্পাদিত), *মুক্তিযুদ্ধের আঞ্চলিক ইতিহাস, ২য় খন্ড,*
সাহিত্য প্রকাশ, ঢাকা, ১৯৯৪ ।

১০০. হোসেন, মোঃ আবুল, *সাতক্ষীরা জেলার ইতিহাস*
কাকলি প্রেস, খুলনা, এপ্রিল, ২০১১ ।

Dhaka University Institutional Repository

পরিশিষ্ট্য ঃ ১

শহীদ মুক্তিযোদ্ধাঃ

১. শহীদ মেজর মজিদ উজ্জামান (ঈদল)

২. শহীদ নাজমুল আবেদিন খোকন

৩. শহীদ সামসুদ্দোহা খান (কাজল) লাশ পাওয়া যায়নি

৪. শহীদ সিরাজুল ইসলাম

৫. শহীদ জাকারিয়া

৬. শহীদ হাফিজ উদ্দীন মোল্যা

৭. শহীদ আবু বকর গাজী

৮. শহীদ আনছার আলী গাজী

৯. শহীদ আব্দুল আজিজ

১০. শহীদ গোলজার সরদার

১১. শহীদ আবুল কালাম আজাদ

১২. শহীদ ইমাদুল হক

১৩. শহীদ মুনসুর আলী

১৪. শহীদ শেখ আব্দুল ওহাব

১৫. শহীদ শেখ রুহুল কুদ্দুস

১৬. শহীদ ছফেদ আলী

১৭. শহীদ নূর মোহাম্মদ

১৮. শহীদ সোহরাব হোসেন

১৯. শহীদ মোজাম্মেল হক

২০. শহীদ লোকমান হোসেন

২১. শহীদ মোজাম্মেল হক

২২. শহীদ আবু দাউদ

২৩. শহীদ আবুল কাশেম মন্ডল

২৪. শহীদ সুশীল কুমার সরকার

২৫. শহীদ আব্দুল ওহাব মন্ডল

২৬. শহীদ হারুন অর রশিদ

২৭. শহীদ মনোরঞ্জন সরকার

২৮. শহীদ সাহাদাৎ হোসেন

২৯. শহীদ আমিন উদ্দীন গাজী

৩০. শহীদ মোঃ আব্দুর রহমান

৩১. শহীদ আব্দুল হাদী

৩২. এস.এম. এন্তাজ আলী

Dhaka University Institutional Repository

পরিশিষ্ট্য ঃ ২

সাতক্ষীরা জেলার কতিপয় রাজাকারের নামের তালিকা

উপজেলাঃ শ্যামনগর

ক্রমিক নম্বর	নাম	পিতার নাম	ঠিকানা
১.	জয়নাল	ইসমাইল গাজী	পরানপুর, শ্যামনগর, সাতক্ষীরা
২.	জব্বার আলী গাজী	মান্দার গাজী	ধুমঘাট, শ্যামনগর, সাতক্ষীরা
৩.	জোনাব আলী গাজী	আব্বাস গাজী	রমজান নগর, শ্যামনগর, সাতক্ষীরা
৪.	নূর আলী	নাসেম গাজী	সোহরা, শ্যামনগর, সাতক্ষীরা
৫.	আব্দুল মান্নান	মৃত গড়াই গাজী	ছোটকুপট, শ্যামনগর, সাতক্ষীরা
৬.	আব্দুল মান্নান	নূর মোহাম্মদ	জয়নগর, শ্যামনগর, সাতক্ষীরা
৭.	গোলাম রাব্বানী	মৃত বোদান দি	গোমারতলি, শ্যামনগর, সাতক্ষীরা
৮.	মোঃ শের আলী	মোঃ এ বাকী	জয়নগর, শ্যামনগর, সাতক্ষীরা
৯.	শামসুর রহমান	মেহের আলী	সোহরা, শ্যামনগর, সাতক্ষীরা
১০.	খালেক মোল্লা		নকিপুর, শ্যামনগর, সাতক্ষীরা
১১.	আহম্মদ গাজী		নকিপুর, শ্যামনগর, সাতক্ষীরা
১২.	আজিজ গাজী (কালু গাজী)		নকিপুর, শ্যামনগর, সাতক্ষীরা
১৩.	মোঃ সামসুদ্দীন		নকিপুর, শ্যামনগর, সাতক্ষীরা
১৪.	আদম কয়ার		খাগড়াডাঙ্গা, শ্যামনগর, সাতক্ষীরা
১৫.	কুরবান গাজী		চন্ডিপুর, শ্যামনগর, সাতক্ষীরা
১৬.	শেখ সাখাওয়াদ মওলানা		মাহামুদপুর, শ্যামনগর, সাতক্ষীরা
১৭.	নুর আলী মাস্টার		বাধোঘাটা, শ্যামনগর, সাতক্ষীরা
১৮.	গিয়াস উদ্দীন মাস্টার		মাহামুদপুর, শ্যামনগর, সাতক্ষীরা
১৯.	কলিম উদ্দীন গাজী		মাহামুদপুর, শ্যামনগর, সাতক্ষীরা
২০.	জহুরুল হক		যাদবপুর, শ্যামনগর, সাতক্ষীরা
২১.	শেখ রশিদ		মাহামুদপুর, শ্যামনগর, সাতক্ষীরা
২২.	মোছেফ ঢালী		মাহামুদপুর, শ্যামনগর, সাতক্ষীরা
২৩.	বাবলু গাজী		মাহামুদপুর, শ্যামনগর, সাতক্ষীরা

এ.এস.এম সামছুল আরেফিন, *রাজাকার এবং দালাল অভিযোগে গ্রেফতারকৃতদের তালিকা* (ডিসেম্বর ১৯৭১ থেকে মার্চ ১৯৭২ পর্যন্ত), বাংলাদেশ রিসার্চ এন্ড পাবলিকেশন্স, ঢাকা, ২০০১।

Dhaka University Institutional Repository

সাতক্ষীরা জেলার কতিপয় রাজাকারের নামের তালিকা

উপজেলাঃ দেবহাটা

ক্রমিক নম্বর	নাম	পিতার নাম	ঠিকানা
২৪.	আব্দুল হান্নান	তোরাফ আলী সরদার	পারুলিয়া, দেবহাটা, সাতক্ষীরা
২৫.	নিয়ামত উদ্দিন (মুক্তার)	ঈমান উদ্দিন সরদার	পারুলিয়া, দেবহাটা, সাতক্ষীরা

এ.এস.এম সামছুল আরেফিন, *রাজাকার এবং দালাল অভিযোগে গ্রেফতারকৃতদের তালিকা* (ডিসেম্বর ১৯৭১ থেকে মার্চ ১৯৭২ পর্যন্ত), বাংলাদেশ রিসার্চ এন্ড পাবলিকেশন্স, ঢাকা, ২০০১।

Dhaka University Institutional Repository

সাতক্ষীরা জেলার কতিপয় রাজাকারের নামের তালিকা

উপজেলাঃ আশাশুনি

ক্রমিক নম্বর	নাম	পিতার নাম	ঠিকানা
২৬.	মজিবর রহমান	আজাহার	আশাশুনি, আশাশুনি, সাতক্ষীরা
২৭.	শাহাবুদ্দিন আহমদ	মৃত আব্দুল মোড়ল	দূর্গাপুর, আশাশুনি, সাতক্ষীরা
২৮.	আব্দুর রশিদ সানা	আফিল উদ্দীন	আশাশুনি, আশাশুনি, সাতক্ষীরা
২৯.	মোঃ ইসহাক আলী	মৃত ইব্রাহিম সরদার	বুধহাটা, আশাশুনি, সাতক্ষীরা
৩০.	মোঃ লিয়াকত আলী	মৃত সদর উদ্দীন সরদার	চাপড়া, আশাশুনি, সাতক্ষীরা
৩১.	আতিয়ার রহমান সরদার		
৩২.	আশরাফ উদ্দীন মকবুল		বড়দল, আশাশুনি, সাতক্ষীরা
৩৩.	মোঃ আমিন উদ্দীন সরদার		চাপড়া, আশাশুনি, সাতক্ষীরা
৩৪.	মোঃ আব্দুর রাজ্জাক		চাপড়া, আশাশুনি, সাতক্ষীরা
৩৫.	মোঃ আব্দুল হাফেজ		আনুলিয়া, আশাশুনি, সাতক্ষীরা

এ.এস.এম সামছুল আরেফিন, *রাজাকার এবং দালাল অভিযোগে গ্রেফতারকৃতদের তালিকা* (ডিসেম্বর ১৯৭১ থেকে মার্চ ১৯৭২ পর্যন্ত), বাংলাদেশ রিসার্চ এন্ড পাবলিকেশন্স, ঢাকা, ২০০১।

Dhaka University Institutional Repository

সাতক্ষীরা জেলার কতিপয় রাজাকারের নামের তালিকা

উপজেলাঃ কালীগঞ্জ

ক্র/নং	নাম	পিতার নাম	ঠিকানা
৩৬.	আবু বক্কর সিদ্দিকী	আঃ রহমান শেখ	শামকি, কালীগঞ্জ, সাতক্ষীরা
৩৭.	বাবর আলী তরফদার	দবির উদ্দিন তরফদার	গোবিন্দপুর, কালীগঞ্জ, সাতক্ষীরা
৩৮.	সবুর শেখ	মৃত এলাহী শেখ	কালীগঞ্জ, কালীগঞ্জ, সাতক্ষীরা
৩৯.	আজমত আলী মোল্লা	হাজি খোরশেদ আলী	আশিকুরা, কালীগঞ্জ, সাতক্ষীরা
৪০.	সুকচাঁদ মোড়ল	মৃত মানিক মোড়ল	শ্রীউলা, কালীগঞ্জ, সাতক্ষীরা
৪১.	ডাঃ মাহতাব উদ্দিন	তোফেল উদ্দিন আহঃ	ইকবালনগর, কালীগঞ্জ, সাতক্ষীরা
৪২.	নাজিবুর রহমান	মৃত সাবিলুর রহমান	মাহাতপুর, কালীগঞ্জ, সাতক্ষীরা
৪৩.	নেসার আহমদ	হারেস আলী	চুন্নুখালি, কালীগঞ্জ, সাতক্ষীরা
৪৪.	মোঃ শহীদুল্লাহ	আলহাজ ফজলু করিম	রোননগর, কালীগঞ্জ, সাতক্ষীরা

এ.এস.এম সামছুল আরেফিন, *রাজাকার এবং দালাল অভিযোগে গ্রেফতারকৃতদের তালিকা* (ডিসেম্বর ১৯৭১ থেকে মার্চ ১৯৭২ পর্যন্ত), বাংলাদেশ রিসার্চ এন্ড পাবলিকেশন্স, ঢাকা, ২০০১।

Dhaka University Institutional Repository

সাতক্ষীরা জেলার কতিপয় রাজাকারের নামের তালিকা

উপজেলাঃ সাতক্ষীরা সদর

ক্র/নং	নাম	পিতার নাম	ঠিকানা
৪৫.	এ করিম দর্জী	জান আলী মুন্সী	আমিরাবাজার, সদর, সাতক্ষীরা
৪৬.	নুরুল ইসলাম সরদার	হাবিবুর রহমান	তুজলপুর, সদর, সাতক্ষীরা
৪৭.	যাকাত আলী		আগরদাড়ি, সদর, সাতক্ষীরা
৪৮.	মোঃ রজব আলী		আগরদাড়ি, সদর, সাতক্ষীরা
৪৯.	আব্দুল মাজেদ		তলুইগাছা, সদর, সাতক্ষীরা
৫০.	আব্দুল খালেক মওলানা		খলিলনগর, সদর, সাতক্ষীরা
৫১.	রোকনুজ্জামান খান		পলাশপোল, সদর, সাতক্ষীরা

এ.এস.এম সামছুল আরেফিন, *রাজাকার এবং দালাল অভিযোগে গ্রেফতারকৃতদের তালিকা* (ডিসেম্বর ১৯৭১ থেকে মার্চ ১৯৭২ পর্যন্ত), বাংলাদেশ রিসার্চ এন্ড পাবলিকেশন্স, ঢাকা, ২০০১।

Dhaka University Institutional Repository

সাতক্ষীরা জেলার কতিপয় রাজাকারের নামের তালিকা

উপজেলাঃ তালা

ক্র/নং	নাম	পিতার নাম	ঠিকানা
৫২.	আঃ করিম	মনিরউদ্দিন	চরগ্রাম, তালা, সাতক্ষীরা
৫৩.	লোকমান হোসেন		চরগ্রাম, তালা, সাতক্ষীরা
৫৪.	গহর পাড়		চরগ্রাম, তালা, সাতক্ষীরা
৫৫.	তফিজ উদ্দিন শেখ		চরগ্রাম, তালা, সাতক্ষীরা
৫৬.	ইমান আলী শেখ		চরগ্রাম, তালা, সাতক্ষীরা
৫৭.	আব্দুল খালেক সরদার	মৃত ইবরাত আলী সরঃ	পাঁচপাড়া, তালা, সাতক্ষীরা
৫৮.	করিম মিয়া	কালা চাঁদ শেখ	মুরাসুলিয়া, তালা, সাতক্ষীরা
৫৯.	জাহান বক্স গাজী	জয়নাল গাজী	পঞ্চপোড়া, তালা, সাতক্ষীরা
৬০.	কেরামত মোড়ল	মিয়াজান মোড়ল	ইসলামকাটি, তালা, সাতক্ষীরা
৬১.	ওমর আলী ফকির		ইসলামকাটি, তালা, সাতক্ষীরা
৬২.	মোবারক দাই		ইসলামকাটি, তালা, সাতক্ষীরা
৬৩.	শাহজাহান	সাজ্জাত আলী	শাহাদাতপুর, তালা, সাতক্ষীরা
৬৪.	এলাহী বক্স	কাসিম উদ্দিন সরদার	শ্রীমন্তকাটি, তালা, সাতক্ষীরা
৬৫.	আব্দুল মজিদ		কানাইদিয়া, তালা, সাতক্ষীরা
৬৬.	সামছু শেখ		কানাইদিয়া, তালা, সাতক্ষীরা
৬৭.	সিরাজ উদ্দিন		কৃষ্ণকাটি, তালা, সাতক্ষীরা

এ.এস.এম সামছুল আরেফিন, *রাজাকার এবং দালাল অভিযোগে গ্রেফতারকৃতদের তালিকা* (ডিসেম্বর ১৯৭১ থেকে মার্চ ১৯৭২ পর্যন্ত), বাংলাদেশ রিসার্চ এন্ড পাবলিকেশন্স, ঢাকা, ২০০১।

Dhaka University Institutional Repository

সাতক্ষীরা জেলার কতিপয় রাজাকারের নামের তালিকা

উপজেলাঃ কলারোয়া

ক্রমিক নম্বর	নাম	পিতার নাম	ঠিকানা
৬৮.	আব্দুল মজিদ খান	মৃত জাবেদ আলী খান	আলাইপুর, কলারোয়া, সাতক্ষীরা
৬৯.	লিয়াকত হোসেন	ওয়াকিল উদ্দিন সরদার	দিগঞ্জ, কলারোয়া, সাতক্ষীরা
৭০.	আব্দুর রহিম	মৃত হামজা আলী	খালিশ, কলারোয়া, সাতক্ষীরা
৭১.	শামসুজ্জামান হামিদী	মৃত মাওঃ মনিরুজ্জামান	হামিয়ালপুর, কলারোয়া, সাতক্ষীরা
৭২.	মোঃ বাবর আলী	সোনাই মন্ডল	পাঁচপোত, কলারোয়া, সাতক্ষীরা
৭৩.	শেখ আব্দুল কাশেম	শেখ নেসার আলী	ঝিকরা, কলারোয়া, সাতক্ষীরা
৭৪.	মুসাবদী মুফতি	রফিজউদ্দিন মুফতি	কালাটুপি, কলারোয়া, সাতক্ষীরা
৭৫.	রজব আলী	চাঁদ আলী	মোহাম্মাদপুর, কলারোয়া, সাতক্ষীরা
৭৬.	মোঃ জামাল সরদার	মকবুল সরদার	রঘুনাথপুর, কলারোয়া, সাতক্ষীরা
৭৭.	মোঃ মিয়ার আলী	শিহান মোড়ল	পাঁচপোত, কলারোয়া, সাতক্ষীরা
৭৮.	শাহাদাত হোসেন	মৃত আজিজ উদ্দিন	লোহাকুরা, কলারোয়া, সাতক্ষীরা
৭৯.	মতিয়ার রহমান	মৃত আমীন মোড়ল	গোছমারা, কলারোয়া, সাতক্ষীরা
৮০.	আব্দুর কাদের	ওয়াজেদ আলী দফাদার	আহসাননগর, কলারোয়া, সাতক্ষীরা
৮১.	আফছার আলী খাঁ	বাজেদ আলী খাঁ	আহসাননগর, কলারোয়া, সাতক্ষীরা

এ.এস.এম সামছুল আরেফিন, *রাজাকার এবং দালাল অভিযোগে গ্রেফতারকৃতদের তালিকা* (ডিসেম্বর ১৯৭১ থেকে মার্চ ১৯৭২ পর্যন্ত), বাংলাদেশ রিসার্চ এন্ড পাবলিকেশন্স, ঢাকা, ২০০১।